ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

আধুনিক
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

Adhunik

BANGALA SAHITYER

Samkshipta

ITIVRITTA

[A Brief History of Modern Bengali Literature]

BY

Dr. Asit Kumar Banerjee
Head of the Deptt. of Bengali
University of Calcutta

Price Rs. 16·00 Only

আধুনিক
বাংলা সাহিত্যের
সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

এই লেখক প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-২য়-৩য়-৪র্থ)
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
সমালোচনার কথা

আধুনিক

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক
এবং
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দশম সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি.এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৭
দ্বিতীয় প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৯
তৃতীয় প্রকাশ—মাঘ, ১৩৭০
চতুর্থ প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭১
পঞ্চম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৭৩
ষষ্ঠ প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫
সপ্তম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
অষ্টম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৮২
নবম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৮৩
দশম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৮৮

মূল্য : ষোল টাকা মাত্র ।

[বাজার হইতে সংগৃহীত কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর :

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীসুকুমার ঘোষ
পাইওনীয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৭/এফ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের কথা

(দশম মুদ্রণ)

এবার গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী কয়েকটি নূতন তথ্যও সংযোজিত হইয়াছে। অযথা ভারী ভারী তত্ত্বকথা ও অনাবশ্যক তথ্য বর্জন করিয়া মূল ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য, আশা করি, ইহা ছাত্র সমাজের উপকারে লাগিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
১৯৮১ ॥ ১৩৮৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রথম সংস্করণ)

এই গ্রন্থটি মূলতঃ ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে চাহয়া রচিত হইয়াছে। অবশ্য সাধারণ পাঠক-সমাজও যাহাতে ইহা হইতে কিছুটা লাভবান হইতে পারেন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। স্বল্প পরিসরের জন্য উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই সংক্ষেপে বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায়, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীমান মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ('শঙ্কর') এবং অধ্যাপক শ্রীমান শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নিরন্তর কৌতূহল প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহিত

করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাইতেছি। শিল্পী শ্রীযুক্ত রোহিণী মুখোপাধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদ আঁকিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার প্রীতিভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান পাঁচুগোপাল দত্ত নির্ঘণ্ট সংকলন করিয়া আমার পরিশ্রম বহুলাংশে লাঘব করিয়াছেন। তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাই।

অ. কু. ব.

সূচীপত্র

তৃতীয় পর্ব : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

ভূমিকা

বাঙালীর মন, প্রাণ ও রসানুভূতির অযুত ঐশ্বর্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যে অভিনব বিকাশধারার অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছে, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে ঠিক তাহার অনুরূপ মানস-প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপটি বহুদিন প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—মোট দেড়শত বৎসরের বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পংক্তিভোজেও আহূত হইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে চসার (১৪শ শতক) হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী—মোট পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দেড়শত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে। নর্মান বিজয়ের (১০৬৬ খ্রীঃ অঃ) পর যেমন অ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্য সম্পূর্ণ নবজন্ম লাভ করিতে আরম্ভ করে, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যেরও রূপ, রীতি ও বিষয়বস্তুগত অভিনব পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া যায়।

য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই যথার্থ রেনেসাঁস শুরু হইয়াছে। ১৪৫৩ খ্রীঃ অব্দে তুর্কীদের হস্তে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতন হইলে ঐ অঞ্চলের গ্রীক-রোমান পণ্ডিতগণ প্রথমে ইতালি, পরে সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়েন। ইঁহারা গ্রীক-রোমান সাহিত্য, দর্শন, আদর্শ ও শিল্পরূপের পূজারী এবং মানববাদী জীবনতত্ত্বের (Humanism) ধারক ও বাহক ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মের চাপে পড়িয়া য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপবর্তিকা প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল, এবং ধর্মের যূপকাষ্ঠে স্বাধীন মানববুদ্ধি লাঞ্ছিত হইতেছিল। এই মানববাদী গ্রীক-রোমান পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের প্রচেষ্টায় য়ুরোপ আবার বিগত অতীতের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিল, হিব্রু ও খ্রীস্টান ধর্মচেতনার স্থলে মানববাদী হেলেনীয় (গ্রীক) জীবনাদর্শকে আবার ফিরিয়া পাইল। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান রক্ষণশীলতার স্থলে জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল ও মর্ত্যকেন্দ্রিক শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-দর্শনের প্রতি আকর্ষণ সূচিত হইল। য়ুরোপের মধ্যযুগীয় চিত্তসঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল বা রূপান্তরিত হইল, এবং মানবরসের নূতন বাণী সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, ব্যক্তিচিত্তের প্রতি প্রাধান্য স্থাপন ও মর্ত্যজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা য়ুরোপকে নবজীবন দান করিল। ইহাই 'রেনেসাঁস' বা পুনর্জন্ম লাভ।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিমিত ক্ষেত্রে ও সঙ্কুচিত পরিবেশে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে প্রথম নবজন্মলাভের ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্য, জীবনধারা, ধর্ম, শিক্ষা ও দার্শনিকতায় বাঙালী নূতন পথের সন্ধান করিতেছিল।

ইহা নূতন পথ বটে, আবার চির-পুরাতন পথ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে। বাঙালী যে ভারতবর্ষের অংশ—উত্তরাপথের জ্ঞান-কর্ম, আচার-আচরণ, শাস্ত্র-সংহিতা এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্বৈতবাদী দর্শন এবং প্রেমভক্তিতে যে তাহার কৌলিক উত্তরাধিকার, তাহা সে সুলতানি আমলে ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনকথা তাহাকে সর্বপ্রথম আত্মস্থ করিল, পুরাতন সম্পদগুলিকে নূতন দৃষ্টির দ্বারা পরীক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। প্রেম ও ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মানবধর্ম ও দেবধর্মের পার্থক্য ঘুচিল, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল—ধর্মের প্রতীকে মানবমহিমাই স্বীকৃত হইল। সর্বোপরি চৈতন্যদেব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বাঙালীর ভৌগোলিক সংকীর্ণতা ঘুচাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার আবির্ভাবে একদিকে বাঙালীর স্থূল স্থাবর চেতনা ভৌগোলিক সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের হৃদ্‌স্পন্দন উপলব্ধি করিতে পারিল; অপরদিকে তাহার মনোজগতেরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। বৈষ্ণব গোস্বামীদের সংস্কৃত শাস্ত্র, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পুনরনুশীলনের ফলে বাঙালী বিস্মৃত প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় পাইল, ইহাকে নূতন আলোকে প্রত্যক্ষ করিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন, সাধনা ও সাহিত্যের এই অভিনব পরিবর্তন তাই 'চৈতন্য-রেনেসাঁস' নামে পরিচিত। য়ুরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে চৈতন্য-রেনেসাঁসের রেখায় রেখায় মিল না থাকিলেও দুই আদর্শ ও মনোভাবের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যাইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব পরিবর্তন আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের নিকট 'ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ নামে পরিচিত ঐতিহাসিকের মতে, "In June 1757, we crossed the frontier and entered into great new world to which a strange destiny has led Bengal." ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুন পলাশীর লক্ষবাগ আম্রকুঞ্জে যুদ্ধের নামে যে প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, তাহার সুদূর-প্রসারী ফলাফল সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙালীর জীবন, সাহিত্য, সাধনা ও দার্শনিক প্রত্যয়ে গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য, "On 23rd June, 1757, the middle age of India ended and her modern age began." [Sir Jadunath Sarkar]. ঐতিহাসিকের এই উক্তি গূঢ় তাৎপর্য-পূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজ বণিকের শাসনদণ্ড অধিকার করার পূর্ববর্তী কালের বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ধীর মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। পাঠান সুলতানদের যুগে বাংলার কেন্দ্রে রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও দেশে প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকৃত শাসনশক্তি এবং সমাজচেতনারও অক্ষুণ্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হইল। দিল্লীর মুঘলসম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অমোঘ প্রতাপ বাংলার পাঠান-আমলের সামন্তশক্তিকে সুদৃঢ় শাসন ও শোষণের মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং ধীরে ধীরে

গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি নাগরিক জীবনাদর্শের কবলে পড়িল। পাঠানযুগে রাজমহল, টাঁড়া (টাণ্ডা) ও গৌড় নগর পাঠান সুলতানগণের রাজধানী হইলেও মুঘলযুগে ঢাকা (জাহাঙ্গীর নগর) ও মুর্শিদাবাদ শাসনযন্ত্রের কেন্দ্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলার দেওয়ান, পরে সুবাদার হইয়াছিলেন। তিনি একদিকে এদেশের রাজস্বব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন, অপরদিকে অর্থনৈতিক দিক হইতে তিনি বাংলাদেশকে প্রায় নিঃস্ব করিয়া ফেলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'সওদা-ই-খাস' বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তদুপরি অতিরিক্ত হারে 'আওয়াব' (কর) ধরিয়া এবং আরও নানাভাবে বাঙালী ভূস্বামীদিগকে শোষণ করিয়া তাহাদের দুরবস্থার একশেষ করিয়া তোলেন। তাঁহার পীড়নে অনেক প্রাচীন জমিদারবংশ নিঃস্ব হইয়া যায়, জমিদারী বিকাইয়া যায় এবং তাহার স্থলে শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন ইজারাদারেরা সেই জমিদারী কিনিয়া 'হঠাৎ নবাব' বনিয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে প্রাচীন অভিজাত সামন্তশ্রেণীর প্রায় সকলেরই সর্বনাশ হয়। ফলে, সামন্তগণ যে-মধ্যযুগীয় বাংলার সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাহা হতবল হইয়া পড়িল। পুরাতন জমিদারের স্থলে যাঁহারা ক্ষমতার অধিকার পাইলেন, তাঁহারা শিক্ষা-সংস্কৃতির ধার ধারিতেন না। পরবর্তীকালে কবি-গান, খেউড় প্রভৃতি নিম্নরুচির আমোদের ইঁহারাই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। এই সময়ে একদিকে যেমন প্রাচীন অভিজাত-বংশের প্রভাব হ্রাস পাইল, তেমনি অপরদিকে একদল চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুসমাজের উৎপত্তি এই মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই আরম্ভ হয়।

মুর্শিদ রাজস্ববিভাগে বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। ফলে, মুর্শিদাবাদের চতুষ্পার্শ্বে ফারসীশিক্ষিত, দরবারঘেঁষা ও মার্জিত রুচির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রাধান্য পাইতে থাকে। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রধানতঃ এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই লালন করিয়াছে। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন শেষ হইল, ধীরে ধীরে কালের চক্র আবর্তিত হইল। আলিবর্দি বহু চেষ্টা করিয়াও ইতিহাসের অবনতি রোধ করিতে পারিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ৪র্থ-৫ম দশকে বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিম বাংলা নিঃস্ব হইয়া পড়িল; সাধারণের ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম বিপর্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে ইংরাজ বণিক বড়িষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের নামমাত্র বার্ষিক টাকা দিয়া কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—তিনখানি গ্রামের উপর আধিপত্য অর্জন করিয়াছে। মুর্শিদাবাদে তখন নানা শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত চলিতেছে, নবাবী রঙমহালের দীপমালা নিভিয়া আসিতেছে—সিরাজদ্দৌলা রাষ্ট্রিক অধঃপতনের নিমিত্তমাত্র—তাঁহার পূর্ব হইতেই সামাজিক অবক্ষয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। মুঘল-যুগের অন্তিমে বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ, জীবনাদর্শ পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে তলাইয়া গেল, মুর্শিদাবাদ ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া পড়িল। মতিঝিল, হীরাঝিল, মনসুরগঞ্জের সমস্ত ঐশ্বর্যবিলাস হীনপ্রভ হইয়া আসিল। অপরদিকে, ভাগীরথীর পূর্বপারে

কালিকাক্ষেত্রের (কালীঘাট) অদূরে কলিকাতা-সূতানুটি-গোবিন্দপুরে ইংরাজ বণিক বাণিজ্যের পসরা বিছাইয়া বিকিকিনি শুরু করিয়া দিয়াছে। ব্যবসার সুবিধা ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য বহু বাঙালী, আরমানী, পর্তুগীজ বণিক ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর কলিকাতায় আধুনিক নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হইল ; রেশমের কুঠি, মামলা-আমলা-ফৌজদারী-দেওয়ানী-আদালত-কোতোয়ালী স্থাপিত হইল।

১৭৫৭ খৃীঃ অব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বেলা আট ঘটিকায় সিরাজ ও ইংরাজের সামান্য যুদ্ধোদ্যম, তারপর অপরাহ্ণ শেষ হইতে না হইতেই, সুবেবাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সিরাজের পলায়ন। সিরাজপক্ষীয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেনানী প্রভুভক্তির বশে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িয়া প্রাণ দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সেনানায়ক ও প্রধান কর্মচারিগণ নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া যুদ্ধের ফলাফল দেখিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ খৃীঃ অব্দের দীর্ঘকাল পরেও ইংরাজ বণিক শাসক হইয়া বসে নাই। তারপর ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও ওয়েলেস্‌লির শাসন-শোষণে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন শুরু হইল। বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি হইতে মধ্যযুগ বিদায় লইল, ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ঘুচিল, য়ুরোপের ঝড়ের হাওয়া আমাদের রুদ্ধ দ্বারে প্রবল আঘাত হানিতে লাগিল। অর্ধশতাব্দীর শঙ্কা-সন্দেহের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনের নবযুগের সূত্রপাত হইল। সে রেনেসাঁসের অর্থ—মানবমহিমা—বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তব জীবন-চেতনার প্রাধান্য। মধ্যযুগীয় ধর্মৈষণা, আবেগ-ব্যাকুলতা, মাথুর-ভাবসম্মেলন, চণ্ডী-মনসা-ধর্মঠাকুরের নিরাপদ-নির্ভর ছায়াতল ছাড়িয়া মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী আধুনিক যুগজিজ্ঞাসা-কল্লোলিত লবণাক্ত সিন্ধুতীরে নিক্ষিপ্ত হইল, জগৎ ও জীবনকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বুদ্ধির ভূকেন্দ্র হইতে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল। ইহাই বাঙালীর নব্য রেনেসাঁস—"Such a Renaissance has not been seen anywhere else in the world history....On our hopelessly decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force" (J. N. Sarkar). পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সেই যুগান্তরের বিচিত্র কাহিনী আলোচিত হইবে।

প্রথম পর্ব ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জটিল রহস্যারণ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের রূপরেখাটি স্বল্পকথায় জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। খ্রীঃ ১০ম হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ—প্রায় সাড়ে আটশত বৎসরকাল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সীমা। এই দীর্ঘ-বিস্তারী যুগের বাংলা সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—দেবদেবীর কাহিনী ও ভাবের প্রাধান্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাবমণ্ডল বিভিন্ন দেবদেবীর দ্বারা অধ্যুষিত। চর্যাগীতিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, বৈষ্ণব মহাজনজীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, মনসা-চণ্ডী, ধর্মমঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, শাক্ত পদাবলী, বাউলগান এবং লৌকিক প্রেমের স্বল্প পরিমাণ 'ব্যালাড' ধরনের আখ্যায়িকা—সাড়ে আটশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী এই কয়টি সাহিত্যশাখার অনুশীলন করিয়াছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যও দেবমাতৃক—অর্থাৎ দেবদেবীর লীলাকথাই ইহার প্রধান অঙ্গ। অবশ্য চৈতন্যদেবের জীবন ও চরিত্র মানুষের দেশকালের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও তিনি অবতারকল্প মহাপুরুষ, কখনও-বা স্বয়ং অবতার বলিয়া সম্মানিত। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে দেবতা বা দেবতার অবতার তদনুকল্প ব্যক্তিত্বের অতিশয় প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। সুতরাং সাহিত্য বলিতে সে যুগে সারস্বত রসাস্বাদন বুঝাইত না ; সে যুগে দেবদেবীর বন্দনার জন্যই সাহিত্যের ডাক পড়িয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক ছত্রও নিছক সাহিত্যসৃষ্টির ইচ্ছায় রচিত হয় নাই।* কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর—মানুষের কথা। সাধারণ, ম্লান, বিবর্ণ বাস্তবজীবন, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং বস্তুচেতনার অন্তরালবর্তী মানসলোকে অবাধ বিচরণ—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমস্ত কিছুর মূলে মানুষের ইহজীবনের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। এইস্থানে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও পৌরাণিক তত্ত্ব বা দেবদেবীর কাহিনী যে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে ; তবে আধুনিক সাহিত্যিকগণ ত্রিদিবের দেবতাকে বাংলার ধূলিধূসর পথের প্রান্তে স্থাপন করিয়াছেন। উপাদান হিসাবে প্রাচীন কাহিনী যৎকিঞ্চিৎ গৃহীত হইলেও তাহাতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, নানাবিধ বাস্তব সমস্যা ও চেতনার প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।

---

* অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে চট্টগ্রাম ও আরাকানের কয়েকজন মুসলমান কবি কিছু কিছু মানবরসের কাব্যকবিতা লিখিয়াছিলেন।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য—তদানীন্তন দেশকালের সঙ্গে ইহার যেন বিশেষ সম্পর্ক নাই। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের ঈষৎ ছায়া পড়িলেও কাল-চেতনা, যাহা ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাহা পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না ; সেকালের সাহিত্য একপ্রকার ভাগবত সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া তাহা দিব্যধামের যাত্রী হইয়াছিল। দেশের উপর দিয়া তাতার-তুর্কী-খোরাসানি-হাবসি-মুঘল বাহিনীর ঝড় বহিয়া গেলেও দেশের সাধারণ মানুষের মনের গভীরে তাহা খুব যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। অপরদিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক দেশ ও কালের ঐতিহাসিক পটে স্থাপিত হইয়াছে। বাঙালীর মন পাশ্চাত্ত্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যুগসচেতন হইয়াছে। ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক বাঙালীর জীবন, একে অপরকে প্রভাবিত করিয়াছে। সাহিত্য এখন আর গ্রাম্য মঠমন্দিরের সামগ্রী নহে ; ইহার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক জীবনের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না বলিলেই চলে। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য—তাহা আবেগের সাহিত্যই হোক, আর জ্ঞানের সাহিত্যই হোক, সমস্তই ছন্দে রচিত হইত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো বিশুদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থ এবং 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি সমাজ-ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থও সে যুগে কবিতায় রচিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বাংলা গদ্যের যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজকর্মের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যের রাজকীয় মহিমা সর্বাপেক্ষা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। গদ্যের ভাষা প্রধানতঃ চিন্তার ভাষা, মননের ভাষা,—যৌক্তিক পারম্পর্যের সঙ্গে গদ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালী যেমন একদিকে বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, জীবনের বৃহৎ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, তেমনি অপর দিকে তাহার স্তিমিত চিন্তাশক্তিও জাগ্রত হইয়াছে ; আবেগের তরল কল্লোলের পাশেই বুদ্ধি ও চিন্তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া হইয়াছে। গদ্যের মারফতে আধুনিক বাঙালী জগৎ ও জীবনকে চিনিতে পারিয়াছে। জার্মানীর গুটেনবার্গ যেমন ছাপাখানার প্রচলন করিয়া য়ুরোপে রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যসাহিত্যের দ্বারা বাঙালীর জীবন-চেতনা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে অতি সহজে প্রাণ ও মনের সঙ্গে মিলাইতে পারিয়াছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মরাত্মক ত্রুটি—বিষয়বস্তু, চিন্তাধারা, রচনারীতি ও জীবনপ্রত্যয়ের মৌলিকতার একান্ত অভাব। সাড়ে আটশত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী প্রচুর পুঁথি লিখিয়াছে, অসংখ্য পুঁথি নকল করিয়াছে। কীট-পতঙ্গ ও আর্দ্রভূমির জলবায়ুর হাত এড়াইয়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যে-পরিমাণে বাংলা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার আকার-আয়তনে যে-কোন ব্যক্তি শঙ্কিত হইবেন। কিন্তু এই বিপুলায়তন পুঁথি-সাহিত্যে মৌলিক শক্তির হানিকর অভাব আমাদিগকে বিষণ্ণ করিয়া তোলে। রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের শত শত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম যুগের কবিরা যে ছক বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের কবিরা বিশেষ কোন স্থানেই তাহার অন্যথা করিতে চাহেন নাই। ফলে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—চারিশত বৎসর ধরিয়া একই ধরনের পুঁথির অজস্র নকল হইয়াছে। কোন কোন দুঃসাহসিক কবি যৎসামান্য মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনীয়। পয়ার-লাচাড়ীর (ত্রিপদী) ক্লান্তিকর একটানা ছন্দে একই ধরনের মঙ্গলকাব্য, অনুবাদগ্রন্থ, বৈষ্ণবপদাবলী রচিত হইয়াছে, গান করা হইয়াছে, পুনঃপুনঃ অনুকৃত হইয়াছে। অবশ্য আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণ, ভারতচন্দ্র এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ও মৈমনসিংহ-গীতিকার পালা-গায়কগণের রচনায় অল্পস্বল্প আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছে। তবে তাহার পরিমাণ বেশি নহে। মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা বিস্ময়কর। আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন নিত্য নূতন আদর্শ স্বীকার করিয়াছে, সেইরূপ রচনারীতি ও প্রকাশ-ভঙ্গিমাতেও সাহিত্যিকগণ যে অদ্ভুত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডল ছাড়িয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্য আজ যুগসচেতন হইয়াছে, বাস্তব জীবনের অযুত তরঙ্গ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়াছে এবং আধুনিক জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। এক কথায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক বাঙালী-মানসের ভাববাহী মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে।

প্রাগাধুনিক বাংলা গদ্য ॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যসাহিত্যেই বাঙালীর অভিনব মৌলিকতা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার পূর্বে বাংলা গদ্যের যে আদৌ ব্যবহার ছিল না তাহা নহে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিতান্ত প্রয়োজনে, হিসাব-নিকাশ, আদালতের ব্যাপার, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য বাঙালী প্রাচীন যুগে গদ্যের ততটা অভাব বোধ করে নাই। কারণ পয়ার ছন্দের দ্বারাই গদ্যের প্রয়োজন অনেকটা সিদ্ধ হইত। পয়ার ছন্দের শোষকশক্তির জন্য ইহাকে বেশ সহজেই চিন্তামূলক গদ্যাত্মক ব্যাপারেও নিয়োগ করা যায়—যেমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। কবিরাজ গোস্বামী আধুনিক কালে জন্মাইলে এই জীবনীকাব্য পয়ারে-ত্রিপদীতে না লিখিয়া গদ্যেই লিখিতেন। সে যুগে বাঙালী কবিগণ মননশীল সাহিত্যকেও পয়ারের সাহায্যে বিবৃত করিতেন, তাই সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব হইতে এত বিলম্ব হইয়াছে।

ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে গদ্যে রচিত সামান্য উপাদান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের পত্রখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।* ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে জড়তামুক্ত না হইলেও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। সপ্তদশ শতাব্দীতে গদ্যে রচিত কিছুকিছু চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে আরবি-ফারসি বাগ্‌ভঙ্গিমা এবং দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগ অনুপ্রবেশ করিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও (আসাম, ভুটান) রাজকার্যে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব সহজিয়াদের ধর্ম-তত্ত্ববিষয়ক 'কড়চা' জাতীয় ছোট ছোট পুস্তিকাতেও গদ্য-রীতির ব্যবহার দেখা যায়।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। বলাই বাহুল্য, বাংলা গদ্য তখনও সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই; শুধু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালাইবার জন্য গদ্যের ডাক পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের পত্র, ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে সম্পাদিত বৈষ্ণব পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠার দলিল এবং আরও দুই-চারিখানি চিঠিপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাংলার পর্তুগীজ মিশনারীদের গদ্যচর্চা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজ বোম্বেটে এবং পাদ্রীরা বাংলাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে অত্যন্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীগণ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করিতে গিয়া বাংলা গদ্য গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ করিলেন; কারণ দেশীয় ভাষা শিখিতে হইলে গদ্যের সাহায্য লইতে হইবে এবং ভাষা শিখিতে হইলে গদ্য গ্রন্থের প্রয়োজন। মানোএল দা আস্‌সুম্প্‌সাঁও নামক একজন বিশুদ্ধ পর্তুগীজ পাদ্রী বাংলা ভাষা শিখিয়া দুইখানি পুস্তিকা রচনা করেন—(১) *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez* নামক একখানি পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, (২) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। ইহাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইঁহার গ্রন্থ দুইখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া পর্তুগালের লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও বাংলা অক্ষর ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয় নাই। তাই এই

---

* এই পত্রের কয়েকটি পংক্তি—"তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', পৃঃ ১৬৭২)—এই ভাষা প্রায় আধুনিক কালের অনুরূপ।

১. 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি', 'রাগময়ী কণা', 'দেহকড়চা' প্রভৃতি সহজিয়া পুস্তিকা এবং 'বৃন্দাবন লীলা', 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ বর্ণনাবিষয়ক পুঁথিতে প্রায় আধুনিক ধরনের গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলির রচনাকাল—অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সহজিয়া পুঁথির ('জ্ঞানাদি সাধন'). ভাষার দৃষ্টান্ত :—"সাধু কহেন, তুমি অন্ধকারে অন্ধ হৈয়াছ, অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে দেখ না। পরে অজ্ঞানী জীব কহেন, আমার এই শরীর মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিয়াছে।" (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৩৩)। এই ভাষা একেবারে হাল আমলের মতো মনে হইতেছে।

পুস্তিকা দুইটি রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়াছিল। দোম আন্তোনিও-দো-রোজারিও নামক আর একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' নামক আর একখানি প্রশ্নোত্তরমূলক বাংলা পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইনি ধর্মান্তরিত বাঙালী খৃীস্টান, ভূষণার রাজপুত্র ; পরে রোমান ক্যাথলিক খৃীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, এভোরা নগরীতে পাণ্ডুলিপির আকারে এখনও রক্ষিত আছে। পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের এই তিনটি পুস্তিকায় দেখা যাইতেছে যে, প্রচারকার্যে ইঁহারা দক্ষতার সঙ্গেই বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতেন। তখনও কোন বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। মানোএল সাহেব পর্তুগীজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিয়া তাহার সূচনা করেন। অবশ্য ইহা বাঙালীর জন্য রচিত হয় নাই, বাংলা ভাষা-শিক্ষার্থী পর্তুগীজ পাদ্রীগণ যাহাতে ভালো করিয়া বাংলা ভাষা শিখিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম-প্রচারে সহায়তা হয়, এইজন্যই তিনি এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হইলে কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশ শাসনের জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। ক্লাইভ ও ওয়াট্স্ বাঙালীদের সহিত মিশিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা শিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী হালহেড সাহেব বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য ইংরাজী ভাষায় *A Grammar of the Bengal Language* (1778) রচনা করেন। ইহাতে প্রাচীন বাংলা কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছিল। হালহেড সাহেব তাঁহার বন্ধু চার্লস্ উইলকিন্স্ এবং হুগলীর প্রসিদ্ধ কর্মকার পঞ্চাননের সহায়তায় এক সেট বাংলা হরফ প্রস্তুত করেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনে সেই প্রথম ছাপার বাংলা অক্ষর সৃষ্টি হইল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধিগুলিকে বাংলায় অনুবাদ না করিলে জনসাধারণ ব্রিটিশ আইন-আদালতের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে না দেখিয়া ১৭৮৫-৯২ খৃীঃ অব্দের মধ্যে জোনাথান ডানকান, নীল বেঞ্জামিন, এডমন্স্টোন এবং ফরস্টার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাংলা গদ্যে আইনবিধির অনুবাদ করেন। বলাই বাহুল্য, এ অনুবাদ অত্যন্ত জড়তাপূর্ণ, কোন কোন স্থান দুর্বোধ্য ও হাস্যকর। এই সময়ে কোম্পানীর বাঙালী মুৎসুদ্দি ও কেরানিরাও কিছু কিছু ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। আপ্জোনের 'ইংরাজী ও বাঙালি বোকেবিলরি' (১৭৯৩), মিলারের *The Tutor* বা 'শিক্ষাগুরু' (১৭৯৭) এবং ফরস্টারের *Vacabulary* (১৭৯৯-১৮০২) বা ইংরাজী-বাংলা অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা দুই খণ্ডে (১৭৯৯ খৃীঃ অব্দে প্রথম খণ্ড এবং ১৮০২ খৃীঃ অব্দে দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের ভূমিকায় ফরস্টার সর্বকার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অন্যান্য কর্মচারীদের তুলনায় ফরস্টারের বাংলা ভাষাজ্ঞান কিছু বেশী ছিল। এই উল্লেখগুলিতে সাহিত্যের বাষ্পবিন্দুও নাই। নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় এবং সরকারী

প্রবর্তনায় বাংলা গদ্যের ব্যবহার শুরু হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য ইহারও উল্লেখ প্রয়োজন।

শ্রীরামপুর মিশন ॥

শ্রীরামপুর মিশন খ্রীস্টান প্রতিষ্ঠান হইলেও এই সংস্থার দ্বারা বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের নরদামটনসায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টানধর্ম প্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের নির্দেশে টমাস ও উইলিয়ম কেরী নামক দুইজন ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান পাদ্রী বাংলাদেশে উপস্থিত হন (১৭৯৩)। টমাস বৃত্তিতে জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। কেরী সাহেবকে বাংলাদেশে নানাবিধ বিপর্যয় ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে ওয়ার্ড, বার্নস্‌ডন, গ্রাণ্ট, মার্শম্যান প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা কেরীর সাহায্যার্থে বাংলাদেশে উপস্থিত হন। এইবার কেরী সাহেবের মিশন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হইল। এই যুগে ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা পাদ্রী সম্প্রদায়কে সুনজরে দেখিতেন না বলিয়া কেরী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ কলিকাতার অদূরে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রটেস্টাণ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছু পূর্বে কেরী সাহেব সুলভমূল্যে একটি ছাপাখানা কিনিয়াছিলেন। পরে এই ছাপাখানা হইতে ভারতের নানা ভাষায় বাইবেল অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রিত হয়। যদিও ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি হুগলী ও শ্রীরামপুর দীর্ঘকাল মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে মিশনের প্রাণস্বরূপ মার্শম্যানের মৃত্যু হইলে এই প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল। এই মিশন দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার সেবা করিয়া ১৮৩৭ সালে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল।

এই প্রতিষ্ঠান হইতে কেরী ও মার্শম্যানের উদ্যোগে ভারতীয় নানা ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছিল। কেরী এবং তাঁহার সহকারী 'ভ্রাতৃগণ' (অর্থাৎ সহকারী পাদ্রীরা) উত্তমরূপে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে *New Testament*-এর সম্পূর্ণ এবং *Old Testament*-এর কিয়দংশ অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হয়; তারপর ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে সমগ্র বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেও ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে কেরী সাহেব 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' (*St. Matthew's Gospel*) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেরীর এই বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম ও জড়তাগ্রস্ত। বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণের (১৮৩৯) ভাষা সম্বন্ধে কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখকরাও উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গদ্য লিখিতে পারেন নাই।"* এ মন্তব্য আদৌ যুক্তিসঙ্গত

* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এবং সাময়িক পত্রের লেখকেরা বাইবেলের বাংলা অপেক্ষা অনেক সহজ বাংলা লিখিয়াছিলেন।

নহে। এই সংস্করণের ভাষারও যে খুব উন্নতি হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। বাইবেলের ইংরাজী ধরনের পদবিন্যাস বাঙালী পাঠকের উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। কেরী ও তাঁহার সহকারী মিশনারীগণ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করিলেই লোকে দলে দলে যিশু ভজিবে। কিন্তু তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। বাইবেলের অনুবাদ বাঙালীর মনে বিশেষ কোন অনুরাগ সঞ্চার করিতে পারে নাই। অবশ্য এই মিশন হইতে বাংলা ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, যাহার জন্য ইঁহাদের প্রতি প্রত্যেক বাঙালীই কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। প্রাচীন বাংলা কাব্য (কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত) এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান (বোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরীর *Sanskrit Grammar*, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ), কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত বাল্মীকি রামায়ণ এবং কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরী অনূদিত 'বিদ্যাহারাবলী' বা চিকিৎসা-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ এবং 'দিগ্দর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা ও 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মিশনারীগণ খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভারতের নানা ভাষায় বাইবেল ছাপিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা সংস্কৃতেও বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা ধর্মপ্রচারে কতটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে না। কিন্তু মিশনের ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা বাঙালীর অশেষ উপকার হইয়াছিল। তাঁহারাই সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত মুদ্রিত করিয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার জন্য কেরী ও তাঁহার সহকারিগণ বাঙালীর ধন্যবাদার্হ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাত হইতে যে সমস্ত তরুণ সিভিলিয়ান চাকুরী লইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেস্লি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতার লালবাজার অঞ্চলে ১৮০০ সালের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল এবং এই বৎসরের নভেম্বর মাস হইতে কলেজের যথার্থ কাজ আরম্ভ হইল। কেরী সাহেবের ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতার কাহিনী কলিকাতায় ওয়েলেস্লির কানেও পৌঁছাইয়াছিল। তিনি কেরী সাহেবকে আহ্বান করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা বিভাগের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকরূপে সানন্দে যোগ দিলেন; ১৮০১ সালে কেরী বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। পরে তাঁহার উপরে মারাঠী ভাষারও ভার অর্পিত হয়। গদ্য গ্রন্থের অভাব দেখিয়া কেরী সংস্কৃত পণ্ডিত এবং আরবী-ফারসীনবীশ মুন্শীদের দ্বারা কয়েকখানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করাইয়া

লইয়াছিলেন এবং মুদ্রিত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কলেজ ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলেও ১৮১৫ সালের পর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ইহার প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে; কারণ তখন কলিকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮১৫ সাল হইতেই রামমোহনের পুস্তক প্রকাশিত হইতেছিল। ঈষৎ পরে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ, স্কুলবুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার লইয়া তখন কলিকাতা উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখীন হইতেছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই কলেজের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। প্রথমতঃ, ইহা ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কলেজ; ইহাতে কোন বাঙালী ছাত্র পড়িতে পাইত না, সেরূপ কোন ব্যবস্থাও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কেরীর উদ্যোগে যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও রচনায় বিশেষ কোন 'সাহিত্যিক' উৎকর্ষ ছিল না। তৃতীয়তঃ, আয়োজনটি খ্রীস্টানী ব্যাপার বলিয়া সাধারণ বাঙালী ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রেভাঃ উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামরাম বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট্' (অর্থাৎ ঈশপ্‌স ফেব্‌ল্‌সের অনুবাদ—১৮০৩), চন্ডীচরণ মুন্‌শির 'তোতা ইতিহাস' ('তুতিনামা' নামক ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ—১৮০৫), রাজীবলোচন মখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র-রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' (পাওয়া যায় নাই—১৮০৮), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ—১৮১৫) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের—'পদার্থতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২১), 'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী' (১৮২২) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহাদের কেহ কেহ কলেজের পন্ডিত না হইয়াও কেরী সাহেবের অনুপ্রেরণায় গদ্যগ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রধানতঃ ফারসী, ইংরাজী ও সংস্কৃত আখ্যান-উপাখ্যানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কারণ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে গল্প-আখ্যান ধরনের গ্রন্থ রচনাই উচিত। বিষয় নির্বাচন করিয়া দিয়া কেরী বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র 'তোতাকাহিনী' ও 'পুরুষপরীক্ষা' পুস্তিকা দুইটি গল্পরসের জন্য পরবর্তী যুগেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাহিরে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষা এরূপ বিশৃঙ্খল, অসঙ্গত ও উৎকট যে, এগুলি প্রায় অপাঠ্যের পর্যায়ে পড়িয়া যায়। ইংরাজী, ফারসি ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণে লেখকবৃন্দ এমন এক 'খিচুড়ি' ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সাহিত্যরচনা দূরের কথা, মনের ভাব প্রকাশ করাই দুরূহ। ইঁহাদের সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া আমরা উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিস্তৃততর পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

উইলিয়ম কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে রীতিমত আলাপ করিতে পারিতেন। এমন কি, সমাজের অন্ত্যজ ব্যক্তিদের ভাষাও তাঁহার নখদর্পণে ছিল। কেরী অনেক ভাষা আয়ত্ত করিলেও বাংলা ভাষাকে বোধ হয় অধিক শ্রদ্ধা করিতেন। শুধু পণ্ডিতদিগকে বাংলা গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজেও গদ্যগ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অবশ্য বাইবেল অনুবাদে তিনি বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বোধ হয় হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়াই তিনি বাইবেলের ভাষা ও পদবিন্যাস আড়ষ্ট ও হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বাংলার সাধু ও চলিত ভাষায় বিশেষ অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) হইতেই বুঝা যাইবে। সিভিলিয়ানদিগকে চলিত বাংলা শিক্ষা দিবার জন্য কেরীর 'কথোপকথন' বা *Dialogue* ১৮০১ সালে রচিত হয়। ইহাতে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন, স্ত্রীসমাজের আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা এবং সাহেব ও বাঙালীদের পারস্পরিক ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপার সংলাপের ঢঙে রচিত। ইহাতে হাস্যপরিহাস, গ্রাম্যতা, অশ্লীল গালাগালি, মেয়েলি কোন্দল, বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের এমন উপাদেয় বর্ণনা আছে যে, ইহা যে একজন বিদেশীর রচনা, তাহা মনে হয় না। বস্তুতঃ, 'কথোপকথন' কেরীর নিজস্ব রচনা কিনা সন্দেহ। তিনি ইহার সংগ্রাহক বা সঙ্কলক। সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবিষয়ে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।[২] আমাদের মতে ইহার অনেকটাই মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা; কারণ, এইরূপ বলিষ্ঠ ভাষার সংলাপভঙ্গী এই যুগে মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন আর কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) ইতিহাস নহে, গালগল্পের সমষ্টি; তবে ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন এবং ইংরেজী ধরনের পদবিন্যাস নাই বলিলেই চলে। কেরী বাংলা সাহিত্যের রচনাকার অপেক্ষা প্রবর্তকের গৌরব লাভ করিয়া চিরদিন বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কেরী সাহেব প্রথম জীবনে রামরাম বসুর নিকট বাংলা শিখিয়াছিলেন। তাই রামরামকে কেরীর মুন্‌শী বলা হয়। এই বসু মহাশয় এক বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তি। কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অবশ্য কোন সাহিত্যগুণের জন্য নহে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ—ইহাই ইহার একমাত্র গৌরব। রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি, তিনি নিজেও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতির সংবাদ রাখিতেন। সুতরাং জাতীয় বীরের চরিত্ররচনায় তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া কেরী তাঁহাকে এই ভার দিয়াছিলেন। রামরাম অযথা অজস্র ফরাসী শব্দ প্রয়োগ করিয়া পুস্তিকাখানিকে অপাঠ্য করিয়া ফেলিয়াছেন; উপরন্তু পদান্বয় ও পদবিন্যাস সম্বন্ধে

২ এ বিষয়ে লেখকের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

তাঁহার বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। ফলে, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা সে-যুগের পাঠকের কাছে কিরূপ লাগিত জানি না, কিন্তু এ যুগের পাঠকের কাছে মনে হইবে, "মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে চিবাইল যেন দাঁতে!" তবে ভাষার উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তিনি বাংলা ভাষা গঠনে কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অবশ্য উৎকট বাগভঙ্গিমার অনভ্যস্ত পদচারণায় তাঁহার সামান্য কৃতিত্বটুকুও ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইহার একবর্ষ পরে রচিত তাঁহার 'লিপিমালা'র (১৮০২) ভাষা অত্যন্ত সরল এবং উৎকট ফারসি-আতিশয্য বর্জিত। বোধ হয় কেরী সাহেবের নির্দেশে তিনি দ্বিতীয় গ্রন্থের ভাষা আমূল পাল্টাইয়া ফেলেন। কারণ বাংলাভাষায় অত্যধিক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কেরী পছন্দ করিতেন না। 'লিপিমালা'য় পত্রলিখনের পদ্ধতিতে তিনি যে-সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ মন্দ নহে। প্রথম গদ্য-সাহিত্যিকের গৌরব অর্জন করিতে না পারিলেও রামরাম প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থের রচনাকাররূপে গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং সে-যুগের সমাজে অতিশয় মান্য পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থপরিচয় দিয়া আমরা এই কলেজের পাঠ্যগ্রন্থের আলোচনা সমাপ্ত করিব। রামমোহনের পূর্বে যদি কাহাকেও পাণ্ডিত্য, মনীষা এবং সার্থক গদ্যশিল্পীরূপে সম্মান দিতে হয়, তবে সে গৌরব মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাপ্য। বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কেরী ও মার্শম্যান তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতায় টোল খুলিয়া বিনামূল্যে বিদ্যা বিতরণ করিতেন। যদিও তিনি ইংরাজী জানিতেন না, তথাপি সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আধুনিক উদার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেরূপ উদারতা একমাত্র রামমোহন ব্যতীত ঐ যুগের অন্য কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্শম্যান তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক ও মনীষী ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চরিত্রের দিক দিয়া তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য জনসন সাহিত্যব্যাপারে মাঝে মাঝে অযৌক্তিক একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মন সংকীর্ণতার ভারে পীড়িত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া মৃত্যুঞ্জয় প্রায় নির্দোষ। অবশ্য তিনি রামমোহনের বেদান্তধর্ম ও একেশ্বরবাদ প্রচার এবং আরও অনেকগুলি সামাজিক আন্দোলন সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে নীচতার স্পর্শমাত্র ছিল না। বাংলা গদ্যসাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনা—১৮১৩, প্রকাশ—১৮৩৩) এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭)—মৃত্যুঞ্জয় মোট এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থের' (১৮১৫) বিরুদ্ধে রচিত—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য নহে; ইহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ছিল না। কাহারও কাহারও ধারণা—মৃত্যুঞ্জয় জটিল সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাষায়

লিখিতেন। উদাহরণস্বরূপ অনেকেই 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র "কোকিলকুল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যাচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"—এই উৎকট ছত্রটির উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই বাক্যটি হাস্যকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নহে; তিনি দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে'র একটি বাক্য অনুবাদ করিতে গিয়া এই ছত্রটি লিখিয়াছিলেন। অনুবাদ সুষ্ঠু হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক সরল স্নিগ্ধ বাক্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক শ্রেণীর ভাষার মধ্যে সংস্কৃতগন্ধী জড়তার চিহ্ন আছে; যেমন 'বত্রিশ সিংহাসনে'র কোন কোন অংশ। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহ হইতে ক্রমেই ভাষার জড়তা লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার 'রাজাবলি'র ভাষা এবং 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র কোন কোন অংশ বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ সাধুভাষাকে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন, তেমনি সরল চলিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারেও কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার দুইটি অংশ উল্লেখ করা যাইতেছে:

১. মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো; রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলেগুলি পুষিব। শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।

২. ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, "তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব?" তৎপত্নী কহিল, "মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি হাঁড়িকুঁড়ি খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে।"*

এখানে ভাষার মধ্যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য এবং জনসাধারণের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর পরিচয় সূচিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে বাংলা গদ্যের যে সাধু ছাঁদ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় সেইরূপ গদ্যরীতি অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর অধিকাংশ গ্রন্থ পরবর্তী যুগে লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া গেলেও মৃত্যুঞ্জয়কে বাঙালী ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তকের গৌরব বজায় রাখিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বারা বাংলা ভাষার কিঞ্চিৎ জড়ত্বমুক্তি হইলেও মৃত্যুঞ্জয়কে বাদ দিলে, সে-যুগের আর কেহ বাংলা গদ্যরীতির আদর্শ সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না। মৃত্যুঞ্জয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পার হইয়া সাধুভাষার প্রথম রূপ ধরিতে পারিয়াছিলেন। বাঙালী-জীবনের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রচারিত গ্রন্থের বিশেষ কোন গভীর যোগাযোগ না থাকিলেও কেরী ও তাঁহার সহকর্মীদের গদ্য রচনার প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষার জন্য আলোচনার যোগ্য।

* যতিচিহ্ন এই লেখক প্রদত্ত। সে যুগের গ্রন্থে আধুনিক যতিচিহ্ন ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে রামমোহন (১৭৭৪*—১৮৩৩) ॥

কেহ কেহ জন্ উইক্লিফকে য়ুরোপের সংস্কার-আন্দোলনের 'Morning Star' বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশের রামমোহনকে সেই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র প্রাচ্যদেশের প্রথম জাগ্রত মানুষ। প্রথম জীবনে প্রাচীন ধরনের সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করিয়াও অসামান্য প্রতিভার বলে তিনি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার কর্মমুখর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেদান্তধর্ম, একেশ্বরবাদ প্রচার, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া এবং নির্মোহ জ্ঞানের দ্বারা জগৎ ও জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া রামমোহন ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। তিনি জগতের চিন্তা ও কর্মপ্রণালীকে যুক্তির সূত্রে মিলাইয়া আপ্তবাক্যের স্থলে বাস্তব জ্ঞানবিশ্বাস ও প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের স্থলে সংস্কারমুক্ত ধীশক্তির উৎকর্ষ ঘোষণা করেন। তাই বলিয়া তাঁহাকে ডিরোজিও-পন্থী 'ইয়ং-বেঙ্গল'দের সঙ্গে একপংক্তিভুক্ত করা যায় না। হিন্দু-কলেজের তরুণ ইউরেশিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও যুক্তিবাদ ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব মানিতে চাহেন নাই। তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যগণ (রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইত্যাদি) কেবলমাত্র সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভারত-সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন সে পথের পথিক ছিলেন না। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক যুক্তিবাদ, বাস্তবচেতনা ও একেশ্বরবাদী মনোভাবের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কার, পুঁথি ও আচার-বিচারের স্থলে মানবতন্ত্রবাদের (Humanism) প্রাধান্য সূচিত করেন এবং আধুনিক য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও জ্ঞানবাদের (Epistemology) প্রতি নিজেও আকৃষ্ট হন, অন্য সকলকেও তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তাই তাঁহাকে আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রদূত বলিয়া সম্মান করা হয়।

রামমোহনের গ্রন্থপরিচয় ॥

১৮১৫ সাল হইতে ১৮৩০ সাল—মোট পনের বৎসরের মধ্যে রামমোহন অন্ততঃ তিরিশখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা ব্যতীত ইংরাজী ভাষায়

---

* কেহ কেহ মনে করেন, ১৭৭২ সালে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নানাবিধ তথ্য বিচার করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহার জন্মসন ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দ হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

রচিত গ্রন্থ ও প্রচারপুস্তিকার সংখ্যাও সুপ্রচুর। তিনি প্রধানতঃ সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই পুস্তিকা লিখিয়াছেন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হইতে গিয়া ক্ষুরধার মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫) বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ[১] (১৮১৫-১৯) এবং বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮), ঐ দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)[২] ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৮২৮) রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মবাদ প্রচার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একাকী লিপিযুদ্ধ করেন এবং প্রতিপক্ষের হানিকর অসার যুক্তিকে খন্ডবিখন্ড করিয়া নিজ মত ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। রামমোহন যেন বাংলার নব্য-নৈয়ায়িকের শেষ বংশধর। তাঁহার বিতর্কমূলক ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা এবং অনুবাদের আক্ষরিক প্রাঞ্জলতা সে যুগে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিত-মুন্শীর দল যখন বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইতেছিলেন, তখন রামমোহন যুক্তিতর্ক ও প্রবন্ধের স্বচ্ছ ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থে'র গোড়ার দিকে তিনি বাঙালীকে বাংলা গদ্য লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছেন।[৩] তাঁহার 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' হালহেড ও কেরীর ব্যাকরণ অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও প্রামাণিক। তাই শুধু ভারত-সংস্কৃতিতে নহে, বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও গঠনে তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার গদ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব-সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" এ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। রামমোহনের গদ্যে সাবলীল প্রাণশক্তির অভাবই তাঁহাকে

১. তলবকার উপনিষদ, কেনোপনিষদ (১৮১৫), ঈশোপনিষদ (১৮১৬), কঠোপনিষদ (১৮১৭), মান্ডুক্যোপনিষদ (১৮১৭), মুন্ডকোপনিষদ (১৮১৯)।

২. তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

৩. 'বেদান্ত গ্রন্থের' প্রথমে "অনুষ্ঠান" নামক ভূমিকায় তিনি, কেমন করিয়া গদ্য লিখিতে ও পড়িতে হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিতর্ক-পুস্তিকার লেখকে পরিণত করিয়াছে, সাহিত্যিকের গৌরব দিতে পারে নাই,—বোধ হয় তিনি তাহা কোনদিন কামনাও করেন নাই। তিনি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বিতর্করীতি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ভাষা যে-পরিমাণে বিতর্কধর্মী হইয়াছে, সেই পরিমাণে আদর্শ গদ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। দুই একটি রচনা ভিন্ন ('পথ্যপ্রদান'—১৮২৩, 'পাদরি শিষ্য-সম্বাদ'—১৮২৩) অন্যত্র তাঁহার গদ্য কদাচিৎ অর্থগৌরব ছাড়াইয়া শিল্পগৌরব লাভ করিতে পারিয়াছে। সরসতা ও শ্রীছাঁদ তাঁহার ভাষায় প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁহার সমকালীন অনেকেই তাঁহার চেয়ে উৎকৃষ্ট গদ্য লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' (১৮০৮), রামমোহন-বিরোধী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষন্ডপীড়ন' (১৮২৩) এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে'র (১৮২২) ভাষায় যে শিল্পরস ও সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়, রামমোহনের গদ্যে তাহা নাই। সে যাহা হোউক, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতিতে তিনি যে নবযুগের সূচনা করেন, তাহার জন্য এই জাতি তাঁহার অম্লান স্মৃতি চিরদিন সগৌরবে বহন করিবে। নিম্নে রামমোহনের গদ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

> "ন্যায়শাস্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা দুই অবিনাশী ইহা ন্যায়শাস্ত্রে কহেন আর দিক্ কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরের আছে জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য-সংযোগ কর্ত্তা হইলেন।" —ব্রাহ্মণ সেবধি

রামমোহনের এই রচনাটুকু বেশ সুখপাঠ্য :

> প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা করূপে নিশ্চয় করেন?

রামমোহন-জীবনীকার শ্রীমতী কোলেট তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া আমরা রামমোহন-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি :—

> "He was the arch which spanned the gulf that yawned between ancient caste and modern humanity, between ancient superstition and science, between despotism and democracy, between immobile custom and a conservative progress, between polytheism and theism."

তৎকালীন সাময়িকপত্র ও বাংলা গদ্য ॥

প্রথম যুগে বাংলা সাময়িক পত্রে যেমন বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তদানীন্তন বাঙালী সমাজের অনেক অভূতপূর্ব আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া

যায়। মুঘলযুগে দিল্লী-আগ্রার সঙ্গে দূরদূরান্তরের সুবার যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য বাদশাহগণ সংবাদ সরবরাহকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। ইঁহাদের নাম ছিল 'ওয়াকেয়া নবিশ'। ইঁহারা দেশের নানাস্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সম্রাট-সকাশে লিখিয়া পাঠাইতেন। ইহাকে সংবাদপত্র বলা যায় না; কারণ ইহা ছাপা হইত না, শুধু সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু ইংরাজ আমলে বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরাজী সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয়। হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' ১৭৮০ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সাময়িকপত্র। তাঁহার পরেও এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; সেগুলি ইংরাজীতে মুদ্রিত ও ইংরাজ কর্তৃক সম্পাদিত হইত। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশে বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা হয় ১৮১৮ সালে। বলা বাহুল্য শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার নাম 'দিগ্‌দর্শন'—১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। কাহারও কাহারও মতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক সাপ্তাহিক পত্র নাকি ১৮১৮ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখন অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হইবার পরের মাসেই (১৮১৮, মে) মিশনারীদের প্রবর্তনায় ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ইহাতে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুৎসা প্রকাশিত হইত বলিয়া ইহার প্রতিরোধকল্পে রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবর্তনায় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। রামমোহনের প্রগতিশীল মনোভাবের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ভবানীচরণের মত ও পথের পার্থক্য অনিবার্য হইয়া উঠিলে ভবানীচরণ 'কৌমুদী' ত্যাগ করিয়া ১৮২২ সালে মার্চ মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা রক্ষণশীল মহলে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই যুগে আরও নানা ধরনের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত জীবজন্তুবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'সংবাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩), 'বঙ্গদূত' (১৮২৯—নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন দেশকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে নানা আন্দোলন চলিয়াছিল। ইহার অল্প-কাল পরে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক, সাপ্তাহিক ও দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণও অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর গুপ্ত ইহার দৈনিক সংস্করণ (১৮৩৯, ১৪ই জুন) প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিকপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত যদিও কোন কোন দিক দিয়া ঈষৎ প্রাচীন-পন্থী ছিলেন, তথাপি তাঁহার পত্রিকায় নানা প্রগতিশীল আলোচনা স্থান পাইত। সেকালের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক কালে আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বাঙালী সমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। 'ইয়

বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) ও 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২) এই যুগে আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনা করিয়াছিল। শুধু সামাজিক বা ধর্মীয় আন্দোলন নহে, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাও সাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য হইতে পারে, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইল। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইলে সর্বপ্রথম উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার আদর্শ স্থাপিত হইল। অবশ্য এই যুগে কোন কোন সাময়িকপত্রের নৈতিক রুচি অতিশয় দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। 'সংবাদ ভাস্কর' (১৮৩৯) এবং 'সংবাদ রসরাজ' (১৮৩৯) নামক পত্রিকায় অতিশয় কুৎসিত গালিগালাজ প্রকাশিত হইত। পরস্পরকে অশুচি ভাষায় গালি দেওয়া সম্পাদকদ্বয়ের স্বভাবধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

এ যুগের সাময়িকপত্রের কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। তর্কবিতর্ক, মতকলহ, বাদ-বিসংবাদের ফলে ভাষার জড়তা অনেকটা দূর হইল। যুদ্ধের পরিচ্ছদ লঘু হওয়া প্রয়োজন, কলহের ভাষাও হাল্কা অথচ তীব্র তীক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। তাই এই যুগে ধর্ম ও সমাজ লইয়া সাময়িকপত্রে মতকলহের ফলে বাংলা গদ্যের অনেক উন্নতি হইল। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী-মানসের নূতনত্বের ইঙ্গিত এই পত্রিকাগুলিতেই পাওয়া যাইবে। যুক্তিবাদী রামমোহন, প্রাচীনপন্থী ভবানীচরণ, মধ্যপন্থী ঈশ্বর গুপ্ত, অতিশয় প্রগতিপরায়ণ 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ—ইঁহাদের মতামতের দ্বন্দ্ব, নবীন আদর্শপ্রচার, নূতন সমাজ সংস্কারের প্রবর্তনা—প্রভৃতির স্বরূপ জানিতে হইলে এই যুগের সাময়িক পত্রিকার মধ্যেই সেই সামাজিক ইতিহাসের স্বরূপ বুঝা যাইবে।

রামমোহনের সমকালীন বাংলা সাহিত্য ॥

রামমোহনের যুগে প্রধানতঃ বিচার-বিতর্ক, মতখণ্ডন ও মতপ্রতিষ্ঠার যুগ ; সৃষ্টিশীল সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, এ-যুগে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ১৮৩১ সালের পর ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কালের কবিতার সূচনা করেন। তাঁহার পূর্বে বিশুদ্ধ সাহিত্য-সংক্রান্ত বিশেষ কোন রচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গল্প-আখ্যান-কেন্দ্রিক অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কোনখানিতেই সাহিত্যগুণের স্পর্শ ছিল না। রামমোহনের যুগে আবির্ভূত অন্ততঃ তিনজন লেখকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ রচনাশক্তি ছিল—(১) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, (২) গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছদ্মনাম —প্রমথনাথ শর্মা।)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক এবং প্রচণ্ডভাবে রামমোহনের বিরোধী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্র, স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি ততটা পরিচিত নহেন। তাঁহার 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) পুস্তিকায় তিনি রামমোহনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি রুচি

ও শালীনতা রক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার আক্রমণ-ভঙ্গিমা অতি কঠোর ও নির্মম হইয়াছে। রামমোহনের বেদান্তপ্রচার ও সহমরণ নিষেধক প্রচেষ্টা কাশীনাথের মতো রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সহিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার রুচি অনিন্দনীয় না হইলেও ভাষায় সাহিত্যগুণ ছিল বলিয়া তাঁহার অশোভন আক্রমণও উপাদেয় হইয়াছে। ইহার জবাব দিতে গিয়া রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) নামক যে স্থির গম্ভীর ভঙ্গিমায় পুস্তিকা রচনা করেন তাহার ভাষার সংযম ও রুচির শুচিতা বিস্ময়কর; কিন্তু রামমোহনের ভাষায় কাশীনাথের ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্নতা নাই বলিয়া সাহিত্য হিসাবে তাহা ততটা উপভোগ্য হইতে পারে নাই।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির লেখক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'স্ত্রীশিক্ষা বধায়ক' (১৮২২) একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকের কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থিত হইয়াছে। গৌরমোহন আশ্চর্য সহজ ও জীবন্ত গদ্য লিখিতে পারিতেন। রামমোহনের তুলনায় তাঁহার গদ্যভঙ্গিমা অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

রামমোহনের যুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রসিদ্ধ সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। প্রথম যুগে তিনি রামমোহনের সহযোগিতায় সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং রামমোহনের সহযোগিতায় পত্রিকাপ্রকাশনায় উৎসাহী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও প্রাচীন রক্ষণশীলতার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। প্রতিভা ও মনস্বিতায় রামমোহন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও সাহিত্য-প্রতিভায় রামমোহনকে তিনি বহু দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বনামে ও ছদ্মনামে এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ঃ—'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) এবং 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০)। তিনি কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস'—এই সমস্ত নক্শা শ্রেণীর ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ আখ্যায়িকার জন্যই তিনি একদা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন কলিকাতার সমাজের কুৎসিত আচার-আচরণকে তীব্র শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া তিনি এই আখ্যানগুলি রচনা করেন। এই স্যাটায়ারধর্মী (অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক) পুস্তিকাগুলিতেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সূচনা হইল। অবশ্য ইহাতে মাঝে মাঝে এমন স্থূল ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে যে, আধুনিক কালের পাঠক-পাঠিকার নিকট তাহা রুচিকর হইবে না। রুচির স্থূলতা বাদ দিলে ভবানীচরণের তীক্ষ্ন লেখনীর শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ রঙ্গব্যঙ্গমূলক গদ্য রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া এবং প্রাচীনপন্থীদের নেতৃত্ব করিয়া ভবানীচরণ সে যুগের সমাজের একটা অংশের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু, রীতি ও আদর্শগত খুব একটা বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। বাংলা কাব্যের যাহা কিছু পরিবর্তন, সমস্তই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল। তবু বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তই কাব্যকবিতার একমাত্র নায়ক ছিলেন। তাঁহার সমকালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও পুরাতন গলিত রীতিতে কাব্যরচনা করিয়া 'নব ভারতচন্দ্র' হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাকাব্যের অনুশীলন না হইবার কয়েকটি কারণ আছে। তখন বাংলা গদ্যের নবার্জিত শক্তি সেইমাত্র বাঙালীর আয়ত্তে আসিয়াছে; সকলেই এই গদ্যকে যুক্তিতর্কের পাথরে শাণ দিয়া তীক্ষ্নধার আয়ুধে পরিণত করিতেছিলেন। উপরন্তু তখন সমাজে নবীন-প্রবীণে ভাঙাগড়ার খেলা চলিতেছিল। এইরূপ উত্তপ্ত পরিবেশে গদ্যানুশীলনই অধিকতর স্বাভাবিক। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত কবি ও সাংবাদিক। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য—সাহিত্যের যে-অংশ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণায়ু, তাহার নাম সাংবাদিকতা (Journalism) এবং সাংবাদিকতার মধ্যে যে অংশটুকু রচনাপারিপাট্যের জন্য দীর্ঘজীবী হয়, তাহার নাম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ কবিতাই 'সংবাদ প্রভাকরে'র জঠরপূর্তি এবং স্থানপূরণের জন্য রচিত হইয়াছিল, তাই সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত তাঁহার অনেক কবিতা আজ আর বাঁচিয়া নাই। সে যাহা হউক, প্রকৃতি-দত্ত কবি-প্রতিভা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শিক্ষাসংস্কৃতিতে অনগ্রসর হইয়াও তিনি একদা বাংলার কবি-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু—পরবর্তী কালের ছোট-বড় সাহিত্যিকগণ, প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত-কবির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 'সংবাদ প্রভাকরে' হাত পাকাইয়াছিলেন; অথচ ঈশ্বর গুপ্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; কাঁচড়াপাড়ার এক সাধারণ বৈদ্যপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। ইহাতে বালক ঈশ্বর বিষম

চটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেই অল্প বয়সেই কলিকাতায় দরিদ্র মাতামহের গৃহে আনীত হন। বাল্যে বা যৌবনে তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত—কোনটাই রীতিসম্মত উপায়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কোনদিন স্কুল-কলেজে পাঠগ্রহণও করেন নাই। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও শুধু তীক্ষ্ন প্রতিভার গুণে এবং স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন পরিহাসের কল্যাণে তিনি কলিকাতার অভিজাত-সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নিঃস্ব কবি তরুণবয়সে (উনিশ বৎসর) 'সংবাদ প্রভাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে তাঁহার চেষ্টায়—এই 'সংবাদ প্রভাকর' অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তিনি শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চতর জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলেও উনবিংশ শতাব্দীর নব নব আন্দোলনকে ঘৃণা করেন নাই। অনেকের ধারণা ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী, প্রতি-ক্রিয়াশীল, প্রগতিবিরোধী কবিওয়ালা শ্রেণীর কবি। একথা কখনও সত্য নহে। ঈশ্বর গুপ্তের মতো আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা-বর্জিত ব্যক্তি যে কিরূপ প্রশংসনীয়ভাবে আধুনিক জীবনের কল্যাণের দিকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সত্য বটে, তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন, বিলাতী ধরনের নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন না, 'ইয়ং বেঙ্গল'দের উগ্রতাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন, সিপাহীবিদ্রোহকে বিদ্রূপ করিয়া এবং ইংরাজের স্তুতিবাদ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু ইহাতেই কি তাঁহার প্রগতিবিরোধী মনোভাব প্রমাণিত হইবে? সে যুগের অনেক উচ্চশিক্ষিত দেশনেতাও বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নাই। সিপাহীবিদ্রোহকে সে যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতের স্বাদেশিক আন্দোলন বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বাস্তবিক কল্যাণকর আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হইলে তিনি সেই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—এই মর্মে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি 'জেনানা মিশন' পরিচালিত এবং মিস কুক (পরে শ্রীমতী উইলসন) নিয়ন্ত্রিত ফিরিঙ্গী ধরনের স্ত্রীশিক্ষাকে নিন্দা করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি বলিতেন যে, পরিবারের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইলে বাঙালীর পারিবারিক সুখ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারক বীঠন সাহেব হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ঈশ্বর গুপ্তকে একখানি পাঠ্য-পুস্তক লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্মতও হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যান্তরে ব্যস্ত থাকার জন্য বীঠন সাহেবের অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় কারিগরী বিদ্যালয় নাই বলিয়া গুপ্তকবি দুঃখ করিতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে বিস্ময়কর উদারতা দেখাইয়াছেন। ইংরাজ সরকারের কর ধার্য করার চণ্ডনীতির তীক্ষ্ন সমালোচনা করিয়া তিনি দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। শিখযুদ্ধ বর্ণনার সময় তিনি শিখজাতির দেশপ্রেমের

বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত মহর্ষির একজন ভক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে নিত্য যাতায়াত করিতেন। মহর্ষির উদার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতি তিনিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ডিরোজিও-পন্থী* উদ্ধত যুবকদের প্রগতির নামে যথেচ্ছাচার এবং রাধাকান্ত দেববাহাদুরের দলভুক্তদের সনাতন ধর্মরক্ষার নামে গলিত জীবনের জয়গান ও হানিকর রক্ষণশীল মনোভাব আদৌ সমর্থন করিতেন না। তিনি কবিতায় সর্বপ্রথম বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়াছেন,—দেশকে, ভাষাকে মাতৃরূপে বন্দনা করিতে শিখাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মানসিক পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রগতিবিরোধী না বলিয়া বরং প্রগতিশীল বলিয়া শ্রদ্ধা করা উচিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' চোখে দেখেন নাই, তাঁহার কবিতাও পড়েন না। তাই তাঁহারা গুপ্তকবিকে প্রতিক্রিয়াশীল, মূর্খ ও কবিওয়ালার শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ড্রাইডেন, পোপ বা 'মেটাফিজিকাল' কবিদিগকে যদি শেলী, কীট্‌সের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহা হইলে যেমন ভুল করা হইবে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব-বিচার প্রসঙ্গেও তাঁহাকে গীতিকবি, আখ্যানকাব্যের কবি বা মহাকাব্যের কবির সংগে তুলনা করিলেও ঠিক তেমনি ভুল করা হইবে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে—যখন শুদ্ধ কবিতা কেন, কোনওরূপ সৃষ্টিশীল আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ† সমাজ ও আদর্শে য়ুরোপীয় ভাবধারার জয়ধ্বনি করিলেও কাব্যক্ষেত্রে তখনও ভারতচন্দ্র, রাম বসু, হরুঠাকুর, দাশরথি রায়, নিতাই বৈরাগী, অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালা ও পাঁচালী-কারগণ একচ্ছত্র মহিমায় বিরাজ করিতেছিলেন। সেই পটভূমিকায় ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব ; উপরন্তু তিনি ইংরাজী জানিতেন না। তাই তাঁহার কবিপ্রতিভার কিয়দংশ ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী-সমাজের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইত বলিয়া তাঁহাকে হাস্যপরিহাস ও রঙ্গব্যঙ্গের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হইয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের বিপুলসংখ্যক কবিতাকে আমরা, প্রকৃতি, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রেম ও সমসাময়িক ঘটনা—মোট ছয়ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। তাঁহার নারীপ্রেম ও নীতিতত্ত্ব-বিষয়ক, কবিতাগুলি কোন দিক দিয়াই কবিতা হইতে পারে নাই। বাল্যে তিনি জননীর স্নেহলাভে বঞ্চিত ছিলেন, যৌবনে স্ত্রীর সাহচর্য পান

---

* হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের একজন যুবাবয়সী ফিরিঙ্গী শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ছিলেন, ধর্মসংস্কার বড় একটা মানিতেন না। তাঁহার ছাত্রেরাও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে তৎকালীন কলিকাতার সমাজে এই শিক্ষক ও তাঁহার ছাত্রদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি কলেজের চাকুরি-ছাড়িতে বাধ্য হন।

† ডিরোজিওর সমাজবিদ্রোহী তরুণ ছাত্রদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) বলা হইত। রঙ্গের কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিতেন—"ইয়ং বাঙাল"।

নাই ; জীবনের এই দিকটা মরুধূসর বিবর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। এইজন্য নারীপ্রেম বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত কৃত্রিম, অগভীর ও গতানুগতিক convention (বাঁধাধরা রীতি) মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই ধরনের কবিতায় ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের নিন্দনীয় প্রভাব সূচিত হইয়াছে—যদিও ইহাতে ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ন বাগ্‌ভঙ্গিমার উজ্জ্বলতা নাই। তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাগুলি ভক্তি ও নীতির বাঁধা পথ ধরিয়া রচিত। অবশ্য ইহার পশ্চাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্বের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। তবে যে-কবিতাগুলিতে হতাশ কবির আর্ত বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে, যেখানে তিনি পুরাতন সংস্কার ছাড়িয়া আপনার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়াছেন, সেখানে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে ('মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারত সন্তানের প্রতি', 'ভারতের অবস্থা', ইত্যাদি) সর্বপ্রথম পরাধীনতার গ্লানি এবং ভবিষ্যৎ ভারতের গৌরবময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য এই কবিতাগুলির জন্যই ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের পটভূমিকায় যে-সমস্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

তৎকালীন সমাজের নানা অনাচার ও বিশৃঙ্খলাকে তিনি পরিহাসের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। এই রঙ্গব্যঙ্গে-উতরোল কবিতাগুলিতেই তাঁহার প্রতিভা যথার্থ বিকাশের পথ পাইয়াছে। বিলাতী মহিলা সম্বন্ধে উক্তি—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে,
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' ফুটে।

ফিরিঙ্গী শিক্ষায় উদ্ধত বাঙালী মেয়ের প্রতি বিদ্রূপ—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল ক'বেই ক'বে।

'ইয়ং বেঙ্গলদের' প্রতি ক্রুদ্ধ ধিক্কার—

যত কালের যুবো যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে ;
ধোরে গুরুপুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে ?

এই সমস্ত হাস্যপরিহাস-মিশ্রিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরম উপভোগ্য। জীবনের লঘু দিকটি তাঁহার কোন কোন কবিতায় ('পাঁঠা', 'আনারস', 'তপস্যামাছ', 'বড়দিন' ইত্যাদি) আশ্চর্য তীক্ষ্নতা লাভ করিয়াছে। জীবনের প্রতি তাত্ত্বিক বা আবেগনিষ্ঠ আকর্ষণ নহে—সহজ রসের প্রসন্নতা তাঁহার এই কবিতাগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে। তাঁহার কোন কোন উক্তি (যেমন—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা' ; 'শয্যায় ভার্যার প্রায় ছারপোকা উঠে গায়' ; 'বিবিজান চলে জান লবেজান ক'রে') এখনও জনসাধারণের মধ্যে

প্রচলিত আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য, কল্পনাকুশলতা, আবেগ বা অন্য কোন মহৎ কবিত্বশক্তি না থাকিলেও দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গরসমুখর এরূপ চিত্ররূপ তাঁহার পূর্বে আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাই না। পরবর্তী কালে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরসাত্মক সামাজিক কবিতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি মূল্যবান—"যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙালী সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাংলার গ্রাম্যদেশের কবি।"

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) ॥

মদনমোহন পুরাতন কাব্যরীতির শেষ কবি। ১৮৫৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, ১৮৫৯ সালে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়—প্রায় একই সময় বাংলা সাহিত্যে নবীনের অভ্যুদয় সূচিত হয় মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবে। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তকে পুরাপুরি প্রাচীন পন্থার কবি বলা যায় না। তাঁহার কবিতা ও চিন্তায় আধুনিক কালেরও ছায়াপাত হইয়াছিল ; কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত নবীনের মাঙ্গলিক গাহিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, নূতন যুগ ও জিজ্ঞাসার মূল রহস্য ততটা ধরিতে পারেন নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা অন্য প্রকার। বস্তুতঃ মদনমোহনের জীবনে আধুনিক জীবনসঙ্কট ও আদর্শের সংঘর্ষ বিপ্লব ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবন, বিশেষতঃ কবিতায় তাহার বিন্দুমাত্রও ছায়া পড়ে নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের বান্ধব, সহকর্মী এবং সেই আদর্শে বিশ্বাসী। বীঠন সাহেবকে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মদনমোহন বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক জীবনের বিপ্লবী বাণী কর্মে ও চিন্তায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—অবশ্য তাঁহার চেতনার এই প্রগতিশীল বিকাশ বিদ্যাসাগরের প্রভাবেই এতটা সার্থক হইয়াছে। তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচৈতন্যে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি যুগধর্মকেই বরণ করিয়াছিলেন। বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য লিখিত তাঁহার 'শিশুশিক্ষা' একদা প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক তদানীন্তন প্রগতিশীল আন্দোলনে মদনমোহন বিদ্যাসাগরের পার্শ্বচর হিসাবেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, তাঁহার দুইখানি কবিতাপুস্তক 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪) এবং 'বাসবদত্তা'য় (১৮৩৬) সেই প্রগতিশীল মনোভাব কিছুমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'রসতরঙ্গিণী' আদিরসাত্মক শ্লোকসংগ্রহ, ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শে রচিত। সংস্কৃত আদিরসাত্মক প্রকীর্ণ শ্লোকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদটি মন্দ হয় নাই। নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি এই কাব্যখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিরসের উৎকট আতিশয্য ও পুরাতন রচনারীতির জন্য এই কবিতাপুস্তক একশ্রেণীর পাঠকসমাজে প্রচারিত হইলেও

পরবর্তী কালে মদনমোহন ইহাতে প্রকাশিত অনাবৃত আদিরসের জন্য বোধ হয় ব্রীড়া-বশতঃ স্বয়ং ইহার প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বাসবদত্তা' সংস্কৃত কবি সুবন্ধু রচিত গদ্য আখ্যায়িকা 'বাসবদত্তা'র কাব্যানুবাদ। ইহাও সংস্কৃত আখ্যানকাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র আদর্শে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতেও আদিরসের উদ্দামতা কতদূর উৎকট হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় স্বল্পশিক্ষিত কবিও কবিতায় আধুনিকতার স্পন্দন উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ভারতচন্দ্র ও অবক্ষয়ী যুগের (decadent age) গলিত আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী একটা বিচিত্র যুগ। মদনমোহনের ভাবজীবনে যুগসঙ্কট অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; অথচ তিনিই আবার গতানুগতিক কাহিনীর রুচিহীন বিকারকে সমর্থন করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তি ছিল। যুগবাণী ও নবজীবনাদর্শ, যাহাকে তিনি মনন ও কর্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কাব্যজীবনে উপলব্ধি করিতে পারিলে নূতন ধরনের কাব্যসৃষ্টির গৌরব লাভ করিতে পারিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা গদ্যের নবজাগরণ

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই বাংলা গদ্যের সর্বজনব্যবহার্য সাধুরীতি প্রচারলাভ করিয়াছিল। রামমোহন ও তাঁহার প্রতিবাদীদের তর্কবিতর্ক ও মতকলহ এবং সাময়িক পত্রাদির জনপ্রিয়তার ফলে বাংলা গদ্যের কুণ্ঠিত পদক্ষেপ ক্রমেই স্বচ্ছন্দ পদচারণায় পরিণত হইল। ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) মতো 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও বাঙালীর মনোজীবন গঠনে ও বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্বে 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকাতেও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের প্রতি কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীকে মননের জগতে আহ্বান করিয়াছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান, শাস্ত্রচর্চা, সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস—আধুনিক মানুষের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, এই পত্রিকায় তাহার ভূরিপরিমাণ আয়োজন করা হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার বারো বৎসর এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সে যুগের বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তিরা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই পত্রিকা শুধু ধর্মজগতের অধিবাসী না হইয়া দৈনন্দিন বাংলাদেশের বাস্তব পটভূমিকায় নামিয়া আসিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমারের প্রধান গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হইলেও তাহার পূর্বেই ইহার সূচনা হইয়াছিল। কৈশোরে তিনি 'অনঙ্গ-মোহন' (১৮৩৫) নামে একখানি আদিরসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলেন। পরে ইহা আর প্রচারিত হয় নাই, তিনি আর কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তদানীন্তন দূষিত রুচির সংস্পর্শে প্রথম যৌবনে এরূপ ব্রীড়াসঙ্কুচিত আদিরসের কাহিনী লিখিলেও অল্পকালের মধ্যে অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন যে, গদ্যই তাঁহার বিচরণক্ষেত্র। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, নীতিতত্ত্ব,নানা পার্থিব ব্যাপার—যাহার প্রতি আধুনিক মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, অক্ষয়কুমার তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি জেফ্রয় নামক এক বিদেশী শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসিয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বাণী—সংস্কারমুক্ত নির্মোহ জ্ঞানবাদ ও অকুণ্ঠ মানবপ্রেম। ইহার মধ্যে প্রথমটি অক্ষয়কুমারের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় সংস্কারবিজড়িত মূঢ় দেশে অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব

একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানবাদকে যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; ক্রমেই তাঁহার জ্ঞানবাদী সংস্কার-মুক্ত ও নিঃস্পৃহ মনে আধুনিক বিশ্বের যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয় ও বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাই তিনি পুঁথিপত্র, শাস্ত্রবাক্য, বেদবেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঔপনিষদিক ভাবরসে পুষ্ট ভক্ত মানুষ। তাঁহার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতো যুক্তিবাদী মানুষের সংঘর্ষ তো বাধিবেই। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ, বেদ ঈশ্বরাদিষ্ট, এই মত ত্যাগ করিয়া অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী অভি-মতকেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রশংসনীয় দান—জগৎ ও জীবনের প্রতি বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকারণাত্মক বাস্তব মনোভাব। রামমোহন যুগাতিচারী সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনিও শাস্ত্রগ্রন্থের আনুগত্য পুরাপুরি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার বিশ্বসৃষ্টিকেই বেদবেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া পুঁথিগত বেদ-বেদান্তকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। নিরীশ্বরবাদী না হইলেও অক্ষয়কুমার ঈশ্বর অপেক্ষা জগতের কৌশলরহস্য উদ্ঘাটনেই অধিকতর কৌতূহলী হইয়াছিলেন। স্কট-ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ জর্জ কুম্বের (১৭৮৮-১৮৫৮) সামাজিক মত তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু কুম্ব বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রচারক হইলেও পুরাতন ধরনের খৃস্টান ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর-আরাধনায় অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু অক্ষয়কুমার মানবজীবনের ক্রিয়াকর্মের উপরই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া চিন্তিত হন নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, সংস্কারমুক্ত সমাজগঠন এবং বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের মধ্যে বাঙালীকে আহ্বান করিয়া অক্ষয়কুমার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাণীকেই সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার অনেকগুলি পাঠ্যশ্রেণীর গ্রন্থ ('ভূগোল'—১৮৪১, 'চারুপাঠ' তিনখণ্ড—১৮৫৩-১৮৫৯, 'পদার্থবিদ্যা'—১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন সহজেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (প্রথম খণ্ড—১৮৫১, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৫৩), কুম্বের *The Constitution of Man* (1828) নামক গ্রন্থের ভাব-অবলম্বনে রচিত। ইহাতে তিনি মানবচরিত্রের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক বিষয়ে এবং মানবপ্রকৃতি ও সমাজের উন্নতি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থটিও কুম্বের *Moral Philosophy* অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক মত এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জগতের বাহিরে ঈশ্বর নাই; জগতের জড় নীতি ও ঐশ্বরিক নীতি পৃথক ব্যাপার নহে; প্রাকৃতিক নির্দেশ পালন করাই ঈশ্বরভক্তি। 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) পাঠ্যগ্রন্থ হইলেও তিনি ইহাতে বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক

পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১ম—১৮৭০, দ্বিতীয়—১৮৮৩) উইলসন সাহেবের *The Religious Sects of the Hindoos* নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের খানিকটা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গ্রন্থ অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-বিদ্যা-মননশীলতা-গবেষণার সার্থক নিদর্শন হিসাবে গণনীয় হইবার যোগ্য। ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীন ও আধুনিক, শাস্ত্রমার্গীয় ও লৌকিক, পবিত্র ও কুৎসিত, সদাচারী ও কদাচারী—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও উপধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে এরূপ নিপুণ পরিচয় ও সতর্ক গবেষণা আধুনিক কালেও সম্ভব হয় নাই।* তিনি উইলসন সাহেবের গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মত, মন্তব্য, আলোচনা ও ঐতিহাসিক ধারাবর্ণনে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে ১৯০১ সালে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই বিষয়ে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রজনীনাথ দত্ত সেই প্রবন্ধটিকে বর্ধিত করিয়া পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন হিন্দুজাতির বাণিজ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার বিভিন্ন তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙালীর বৈজ্ঞানিক এবং মননশীল চিত্তকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার ভাষার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষয়কুমারের ভাষা কোন কোন স্থলে একটু আড়ষ্ট ; বাচনভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে বাধা পাইতে হয়। বিশেষতঃ তিনি সংস্কৃত অভিধান হইতে গুরুভার পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিয়া ভাষাকে আরও প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে যুগে অনেকেই তাঁহার ভাষার মুদ্রাদোষ লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে চাই। তাঁহার পূর্বে এইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে।† প্রথম পথিকৃতের কাজ কিছু দুরূহ। কাজেই তাঁহার ভাষা কিঞ্চিৎ অমসৃণ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আবেগধর্মী নহে—তথ্যবহুল বৈজ্ঞানিক রচনা। অনভ্যস্ত ও অপরিচিত বিষয় পাঠকের নিকট কিছু দুরূহ বোধ হইয়া থাকে। আরও একটা কথা—অক্ষয়কুমারের প্রথম দিকের ভাষাতে যতটা জড়তা ও কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী যুগের ভাষায় সে ত্রুটি ততটা ছিল না। সে যাহা হউক, অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যের প্রথম স্তরে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের কথা আলোচনা করিয়া বাংলা মননশীল সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। দর্শন-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া তিনি আজও শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।

---

* সম্প্রতি এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

† অবশ্য তাঁহার পূর্বে শ্রীরামপুরের ইংরাজ মিশনারীরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার কিছু সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমা অতিশয় জড়তাপূর্ণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ॥

মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রচণ্ড বিস্ময়। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন গ্রহান্তরের জীব; বিধাতার কোন্ খেয়ালের বশে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু প্রতিভা, চারিত্রবীর্য ও মানবপ্রেমের দ্বারাই তিনি যেন গগনস্পর্শী হিমচূড়ার মতো বাংলাদেশের তদানীন্তন তুচ্ছতার অনেক ঊর্ধ্বে শির তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ-সংস্কার-স্পৃহা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর সমাজবিপ্লবীতে রূপান্তরিত করিয়াছে। ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রুশো-ভোলতেয়র-দিদেরো-মঁতাস্কু প্রভৃতি বিপ্লবী চিন্তানায়কগণ "এনসাইক্লোপীডিস্ট" আন্দোলনের দ্বারা রক্তাক্ত ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিপ্লব রক্তপাতহীন সমাজবিপ্লব হইলেও ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে কোন অংশেই সামান্য ব্যাপার নহে। ইতিপূর্বে রামমোহন বাঙালী-চিত্তের জড়তা ঘুচাইবার জন্য দুঃসাহসিক কার্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সেই আরব্ধ কর্মকে আরও অগ্রবর্তী করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান, প্রেম ও কর্মকে ঐক্যসূত্রে বিধৃত করেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বাস্তবজীবনের উপযোগী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা,—সর্বোপরি অকুণ্ঠ মানবপ্রেম ও অলোকসামান্য করুণা বিদ্যাসাগরকে বাংলাদেশে অবতারকল্প মহাপুরুষে পরিণত করিয়াছে। রক্ষণশীল পরিবারে পিতার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে বর্ধিত হইয়া তিনি বাঙালীর ক্ষুদ্রতর ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-বিচার তুচ্ছ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো ধর্মসংস্কারের দ্বারা সমাজসংস্কার করিতে চাহেন নাই, বা 'ইয়ং বেঙ্গল'দের* কালাপাহাড়ী মতের বশবর্তী হইয়া যাহা কিছু প্রাচীন পুরাতন, তাহাকেই চূর্ণ করিতে চাহেন নাই। আসলে তিনি কোঁৎ, মিল, বেন্হাম্ প্রভৃতি মানবতাবাদী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতো একান্তভাবে মানবপ্রেমী ছিলেন। মানুষের ইহজগতের কল্যাণকর ব্যাপার লইয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন; বিশুদ্ধ ধর্ম, পারমার্থিক তত্ত্ব, বৃথা-রাজনৈতিক আন্দোলন বা বায়বীয় সমাজসংস্কারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না। মানুষের জীবনের সহিত যাহার যোগ নাই, সম্পর্ক নাই—বিদ্যাসাগর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করেন নাই। ইহজগতে বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না বলিয়া একদা তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা হইতে হিন্দুর ষড়দর্শন চর্চা তুলিয়া দিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি ছিলেন ঘোর সংশয়বাদী। তিনি ঈশ্বর-অস্তিত্বে সন্দিহান হউন আর নাই হউন, ফরাসী দার্শনিক কোঁতের মতো, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন দেবতার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন নাই। গ্রীক Hedonism দর্শন[১] এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর Positiv-

* ২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১. এই দর্শনের মূলকথা ঐহিক সুখ।

ism-এর[২] সঙ্গেই তাঁহার মানসিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে। নিছক জ্ঞানচর্চা, দর্শন আলোচনা ও শাস্ত্রসংহিতাকে ত্যাগ করিয়া তিনি উপযোগিতার দিক দিয়াই সমস্ত কিছুকে বিচার করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্মকর্মের প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহার বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাই সে যুগের রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁহাকে মন খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে আজ আমরা তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেরূপ কৃষ্ণের নরলীলার প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হইয়াছে, সেইরূপ মানুষের ইহজীবন ও বাস্তব প্রয়োজনই ছিল বিদ্যাসাগরের ধ্যান, কর্ম ও সাধনার বস্তু। বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানববাদী সাধক—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

১৮৪৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯১ সাল—প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে বহু পুস্তক অনুবাদ করিয়া, কিছু কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর গদ্য-লেখকরূপে সম্মান পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই অনুবাদ, স্কুল-কলেজের পাঠ্যগ্রন্থরূপে রচিত। কথাটা অযথার্থ নহে; বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরাজী বা সংস্কৃতের অনুবাদ। তিনি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য ভাগবতের কিয়দংশ অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত' নামক একখানি আখ্যান-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে হিন্দুমনোভাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় কলেজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ইহা মুদ্রিত করিতে সম্মত হন নাই। পরে ইহার পান্ডুলিপিও হারাইয়া যায়। তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) উক্ত নামীয় সংস্কৃত আখ্যানের হুবহু অনুবাদ নহে; তিনি 'বৈতালপচ্চীসী' নামক হিন্দুস্থানী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর আখ্যানের গদ্য-অনুবাদ; 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র প্রথম দুই অঙ্ক এবং বাল্মিকী-রামায়ণের উত্তরকান্ডের কিয়দংশ হইতে সংকলিত; মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০) মূল মহাভারতের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। তিনি যেমন সংস্কৃত গ্রন্হাদি হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তেমনি ইংরাজী গ্রন্হকেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া কয়েকখানি পাঠ্যগ্রন্হ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), মার্শম্যানের *History of Bengal*-এর শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ, চেম্বার্সের *Rudiments of Knowledge* অবলম্বনে 'বোধোদয়' (১৮৪৯), চেম্বার্স প্রণীত *Biographies* অবলম্বনে 'জীবনচরিত' (১৮৫১), ঈসপের ফেবল্‌স্ অবলম্বনে 'কথামালা' (১৮৫৬) এবং শেক্‌স্‌পীয়রের *Comedy of Errors* অনুসরণে 'ভ্রান্তি-বিলাস' (১৮৬৯) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা ইংরাজীর ভাবানুবাদ। অনুবাদগুলি যে

২. ফরাসী দার্শনিক অগুস্তে কোঁৎ এই মতের প্রচারক। ইহার অর্থ—মানুষের জীবন ও জীবনকেন্দ্রিক বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞান একমাত্র সত্য, ঈশ্বরতত্ত্ব গৌণ ব্যাপার।

অতিশয় সুষ্ঠু হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'কথামালা', 'বোধোদয়' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রায় মৌলিক গ্রন্থের মতোই রমণীয় ও সুখ-পাঠ্য। বাংলা দেশে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সাহিত্যের ভাষা ও জ্ঞানবুদ্ধির সঞ্চয় গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহাকে অনুবাদকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুবাদের সাহায্যে কলেবর পরিপুষ্ট করে। তাই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্য রচনা তাঁহার ততটা অভিপ্রেত ছিল না; জনকল্যাণই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য—মানববাদী বিদ্যাসাগর এই মতে বিশ্বাস করিতেন। তাই মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি তাহা সংযত করিয়া শিক্ষাপ্রসারেই নিজ সাহিত্যরুচি ও শক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রচনার গুণে তাঁহার অনেক অনুবাদগ্রন্থ প্রায় মৌলিক গ্রন্থের সম্মান পাইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যাও কিছু অল্প নহে। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম—১৮৫৫, ২য়—১৮৫৬), 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১ম—১৮৭১, ২য়—১৮৭৩), 'বিদ্যাসাগর চরিত' (অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী—১৮৯১) এবং 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' (আনুমানিক—১৮৬৩) —এইগুলি তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ। যেগুলি প্রবন্ধধর্মী তাহাতে তথ্য, তত্ত্ব, যৌক্তিকতা ও প্রমাণের সমাবেশ বিস্ময়কর। 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ভারতীয়ের রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' ও 'বিদ্যাসাগর চরিতে' তাঁহার স্নিগ্ধ, প্রাণবান, সাবলীল গদ্যের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহার আত্মজীবনীটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র এবং অসমাপ্ত; শৈশবজীবনের কৌতূহলপ্রদ কাহিনী বলিতে বলিতেই ইহাতে ছেদ পড়িয়াছে; বিদ্যাসাগর এই দুর্লভ গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলে বাংলা সাহিত্যে একখানি উপাদেয় আত্মজীবনী গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। 'প্রভাবতীসম্ভাষণে' একটি শিশুবালিকার মৃত্যু তাঁহার বিরাট চরিত্রকে কিরূপ করুণ বেদনায় প্লাবিত করিয়াছে তাহা তিনি অকপটে আবেগোচ্ছল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রতিবাদী ও প্রতিপক্ষদিগকে বিব্রত ও হাস্যাস্পদ করিবার জন্য ছদ্মনামে কতকগুলি ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কৌতুকাবহ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪) —এই তিনখানি পুস্তিকা "কস্যচিৎ উপযুক্ত-ভাইপোস্য" এই রসিকতাপূর্ণ ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) পুস্তিকার রচনাকার হিসাবে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য' এই নাম ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে ছদ্মনামে রচিত

এই পুস্তিকাগুলি বিদ্যাসাগরের রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপক্ষের মূঢ়তা এবং নষ্টামিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মর্মান্তিক খোঁচা দিয়া তিনি উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সুরসিক ও সুরুচিসঙ্গত পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে সে যুগের মনীষী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, "এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।"* কথাটি অত্যন্ত সত্য।

বাংলা ভাষার শিল্পরূপ গঠনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অদ্যাপি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁহার পূর্বে নানাকার্যে গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও ভাষায় শিল্পশ্রী ও সাহিত্যরস ফুটিয়া উঠে নাই। শুষ্ক বক্তব্যকে রসে ও সৌন্দর্যে ভরিয়া তুলিবার দুর্লভ শক্তি লইয়া বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশৃঙ্খল বাংলা গদ্যকে শ্রী-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্যের বন্ধনের মধ্যে আনিয়া তিনি যে গদ্যরীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও তাহা 'সাধুভাষা' নামে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সার কথা, —"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আমরা যখন 'সীতার বনবাসে' পড়ি—

> এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরমন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

—তখন সুনিবিড় মেঘচ্ছায়ায় শ্যামস্নিগ্ধ অরণ্যপ্রকৃতির শীতল নিশ্বাস যেন গায়ে আসিয়া স্পর্শ দিয়া যায়। ভাষার মধ্যে সুরতরঙ্গ সৃষ্টি, যুক্তির ভাষাকে রসের ভাষায় রূপান্তর এবং শব্দের সাহায্যে চিত্ররূপ ও ধ্বনিরূপ ফুটাইয়া তোলা বিদ্যাসাগরের বৃহত্তম কৃতিত্ব। এককথায় বিদ্যাসাগর প্রথম গদ্যশিল্পী। তাঁহার পূর্ববর্তী আর সকলে গদ্য-লেখক মাত্র, শিল্পী নহেন। বাংলা গদ্য যতদিন জীবিত থাকিবে বিদ্যাসাগরের নির্মিতি-কৌশলও ততদিন বাঙালীর বিস্ময় আকর্ষণ করিবে।

---

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পর্ব : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের বিকাশ

সূচনা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যথার্থ সূচনা। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা নব জীবনের প্রস্তুতিপর্ব নাম দিতে পারি। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের বিশাল প্রাঙ্গণটিকে সুপ্রসর করিয়া তুলিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তখনও এই যুগের সাহিত্য যথেষ্ট স্ফুটবাক হইতে পারে নাই, যুগ ও জিজ্ঞাসার উদ্বেল তরঙ্গ তখনও সাহিত্য ও জীবনকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন এবং ঐতিহ্য বাঙালীর সমগ্র চেতনায় বিপরীতমুখী আলোড়ন সৃষ্টি করিল। এই যুগের মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-আন্দোলন এবং ধর্মসংস্কারের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট স্বরূপটি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে ক্রমেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই যথার্থতঃ বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম, এবং সেই রাজনৈতিক চিন্তা ও আলোচনার মূলকথা স্বদেশপ্রেম ; সে স্বদেশপ্রেম কখনও অতীতমুখী ছায়াধূসর জীবনের গৌরবচিন্তায় তন্দ্রাতুর, কখনও বর্তমান অধঃপতনে বিষণ্ন, কখনও-বা ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগ কল্পনায় মোহমুগ্ধ। সিপাহী-বিদ্রোহের সামান্য কিছু পূর্বে বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ায় নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কৃষাণ, সম্পন্ন গৃহস্থ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবলভাবে নীলকর-বিরোধিতা আরম্ভ হয়, এবং ইংরাজ সুশাসনের বিরুদ্ধে নৈরাশ্য সূচিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের মূলে ছিল ইংরাজ-শাসনের বৈষম্য নীতি। নেতৃত্বের অভাব, বিচক্ষণতার ত্রুটি, দলগত সংকীর্ণতা এবং সামগ্রিকভাবে সকলকে ঐক্যসূত্রে আহ্বান করিবার অক্ষমতার জন্য এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আধুনিক সমরকুশলী পাশ্চাত্ত্য শক্তির সঙ্গে মধ্যযুগীয় যুদ্ধপ্রণালী এবং সামন্ততান্ত্রিক পুরাতন শক্তির সংঘর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহের ফল হইল শোচনীয়। সুসভ্য ইংরাজজাতি স্বার্থের খাতিরে কতদূর বর্বর হইতে পারে, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি ইংরাজের আচরণ। ইংরাজ সরকার অবিশ্বাস্য চণ্ডনীতির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। সে কিরূপ চণ্ডনীতি ? মাত্র তিনমাসে ছয় হাজার সিপাহীর ফাঁসি হইয়াছিল—অন্যান্য 'সুসভ্য' অত্যাচারের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু এত অত্যাচারেও ইংরাজের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস বিশেষ হ্রাস পায় নাই। শিক্ষিত ভারতবাসীরা মনে করিতেন যে, ইংরাজ সরকার যে সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, মধ্যযুগের

মনোভাববিশিষ্ট সিপাহীরা তাহা ধ্বংস করিবার জন্যই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাই সে যুগের ইংরাজীশিক্ষিত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সিপাহী-বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। যাহা হউক, বেশীদিন ইংরাজ শাসনের অহিফেনরস শিক্ষিত সমাজকে নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত সংস্কার সভা' (১৮৭০), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠনতন্ত্র (যাহাতে সাধারণতন্ত্র বা Democracy স্বীকার করা হইয়াছিল এবং স্বায়ত্তশাসন কামনা করা হইয়াছিল), নবগোপাল মিত্র পরিচালিত 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), মনোমোহন বসুর জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' (১৮৭২) সামাজিক মুক্তি ও রাষ্ট্রিক সমানাধিকারের আদর্শ, 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা'র (১৮৭৬) জাতীয় আদর্শকে মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সমাজনেতাদের স্বাধীনতার আনুগত্য গ্রহণ, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের স্বাদেশিক কবিতা—সর্বত্রই স্বাদেশিক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে কল্পলোক ছাড়িয়া মৃত্তিকাতলে আবির্ভূত হইল।

অবশ্য এই স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ ও ধর্মচেতনার গভীর যোগাযোগ ছিল। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের উপর ভিত্তি করিয়া বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের কাল তখনও দূরবর্তী ছিল। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাস্তব জীবনাদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুসংস্কৃতির পুনর্জাগরণ কল্পনা প্রভৃতি ব্যাপার এই জাতি-চেতনার আবেগ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। কেহ কেহ কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতিশীল মনোভাবকে ধর্মীয় আবহাওয়ার বাহিরে ভাবিতে পারেন না। সত্য বটে কেশবচন্দ্র প্রথমজীবনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি আধুনিক সামাজিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং মধ্যজীবনে আবেগাপ্লুত ধর্ম ও গুরুবাদমূলক আচার-আচরণের কবলিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রগতিবাদী মনোভাব প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়কর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিলেও শেষজীবনে হিন্দুর নৈতিক ধর্ম, নিষ্কামতত্ত্ব ও কোঁতের Positivism-এর সমন্বয়-সাধনে অধিকতর তৎপর হইয়াছিলেন। তবু তাঁহারা যে ঐতিহাসিক কাল-বিবর্তনকে দ্রুতগামী করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতসভার প্রতিষ্ঠা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) কয়েক বৎসর পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে সংগ্রামী পরিষদে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। সারা বাংলাদেশ জুড়িয়াই ইহার শাখা স্থাপিত হয়। বলিতে কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের আবেদন-নিবেদনমূলক দীনমূর্তি অপেক্ষা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মধ্যে অধিকতর কর্মতৎপরতা এবং রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন আহূত হয় ; এই একই সময়ে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়। ১৮৮৫ খৃীস্টাব্দের

পরবর্তী পনের বৎসর জাতীয় কংগ্রেসের নানা আন্দোলন ও পুনর্গঠনের মধ্যে ধীরে ধীরে, শুধু বাংলাদেশ নহে—সারা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্তি গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলন সম্বন্ধেও অবহিত হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনে উগ্রতর ধর্মচেতনা প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পরমতসহিষ্ণু উদার মানবধর্ম এবং বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও মানব-প্রেম অবহেলিত গণদেবতার জয়ঘোষণা করিল এবং হিন্দুধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনকে একটা আশাবাদী ও স্বাদেশিক আত্মগৌরবপূর্ণ উন্নততর সমাজ-সংস্কৃতি ও আদর্শ পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করিল। এই যে সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় বিকাশ ও প্রগতিমূলক মনোভাব—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ইহার দ্বারা বিকশিত, লালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। এইবার আমরা এই যুগের গদ্যসাহিত্য আলোচনা করিয়া যুগ-প্রেরণাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) ॥

হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ডিরোজিয়োর ভাবরসে বর্ধিত হইয়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্থিতধী ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার উদার প্রসর ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যে কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া মেধাবী ছাত্রের গৌরব লইয়া পরবর্তী কালের সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং হিন্দু কলেজের নবীন পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—উভয় ভাবাদর্শের সংঘাতে তিনি দিগন্তে ভাসিয়া যান নাই। প্রাচীন ভারতীয় আত্মজীবন, লোকশ্রেয় জ্ঞান, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং পাশ্চাত্ত্য আদর্শের জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানানুশীলন, সংস্কারমুক্ত তত্ত্বানুরক্তি—ভূদেবের জীবনে এই দুই আদর্শের সমন্বয় হইয়াছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেহ প্রাচীন গলিত ভারতীয় আদর্শকে শিরোধার্য করিয়া চূড়ান্ত 'আর্যামি'র পরিচয় দিতেছিলেন, কেহ-বা নবীন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে সকলের উপর স্থান দিয়া এদেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের বায়বীয় সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এইরূপ ভাবদ্বন্দ্বে ভূদেব বিচলিত হন নাই। যদিও তিনি যুক্তিবাদ ও বাস্তব জ্ঞানের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, তবু কোন আদর্শকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। উভয় রীতিকে দেশের প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ-বর্জন করিয়া তিনি বাঙালীর পরিশুদ্ধ সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের পটভূমিকায় বৃহত্তর জীবনাদর্শকেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনা, সংবাদ-পত্র পরিচালনা, শিক্ষা প্রচার প্রভৃতির সাহায্যে দেশের ও দশের কল্যাণ করা, যুবশক্তিকে সমন্বয়ধর্মী জীবনপথে পরিচালিত করা—সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখার নৈতিক আদর্শ স্থাপন তাঁহার অন্যতম

জীবনাদর্শ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব জ্ঞান বিসর্জন দিয়া একটা রক্তমাংসহীন পাণ্ডুর নীতি ও আদর্শ তাঁহাকে কোন দিন প্রলুব্ধ করে নাই। বাঙালীকে বৃহৎ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তাহাকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয় জীবনা-দর্শে দীক্ষিত হইতে হইবে, কিন্তু পায়ের তলার মাটি ভুলিলে চলিবে না। সে মাটির অর্থ বাঙালী যে বৃহৎ ভারতসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। এবিষয়ে, তিনি আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বিহারের শিক্ষার বাহন ও রাজকার্যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মাতৃভাষা উর্দু উঠিয়া গিয়া সর্বসাধারণের বোধগম্য হিন্দী ভাষা গৌরবময় আসন লাভ করে। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিহারের গ্রাম্য কবি তাঁহাকে 'ভুবনদেব' বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে হিন্দীতে গান বাঁধিয়াছিলেন। ভূদেব সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, নিখিল ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীর যোগ্যতাই সমধিক। তাঁহার মত এখন আমরা গ্রহণ করি, আর নাই করি—উনবিংশ শতাব্দীর সংযত, উদার ও মহৎপ্রাণ বাঙালীর পরিচয় পাইতে হইলে ভূদেবকেই স্মরণ করিতে হইবে।

ভূদেবের গদ্যগ্রন্থ তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার স্মারক-চিহ্ন বহন করিতেছে। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেকগুলি গ্রন্থ ('শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' —১৮৫৬, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', ১ম ও ২য়—১৮৫৮-৫৯ ; 'পুরাবৃত্তসার'—১৮৫৮ ; 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'—১৮৬২ ; 'ক্ষেত্রতত্ত্ব'—১৮৬২ ; 'রোমের ইতিহাস'—১৮৬৩ ; 'বাঙ্গালার ইতিহাস'—১৯০৪ সালে প্রকাশিত) একদা স্কুল-কলেজের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাস, পদার্থতত্ত্ব ও গণিতই প্রধান। ইতিহাসে তাঁহার আজীবন নিষ্ঠা ছিল—তাহার প্রমাণ এই ঐতিহাসিক পুস্তিকাগুলি। যদিও এগুলি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ এবং ইহাতে মৌলিকতা দেখাইবার অবকাশ নাই, তবু তিনি লিখিবার সময় সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া লিখিতেন না। কাজেই স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলিতেও সাধারণ পাঠকের উপযুক্ত বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সাহিত্য সমালোচনা, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিচারে তাঁহার মতামত উল্লেখযোগ্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুইখণ্ডে উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি গবেষকসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা এবং সমালোচকসুলভ রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যেমন বলিষ্ঠ সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ভূদেবের সমালোচনা সেই জাতীয় বিশ্লেষণধর্মী নহে। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছে তিনখানি গ্রন্থের জন্য—'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫)। সামাজিক আদর্শ, ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্তব্য পালন, দৈনন্দিন জীবন ও নীতিবোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার তীক্ষ্ণ, মননশীল, উদার আলোচনা তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সমাজ-নেতায় পরিণত করিয়াছে। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে সমাজ এবং সমাজ হইতে বৃহৎ দেশ—মানুষ ধীরে ধীরে কর্তব্যকর্মের সোপান অতিক্রম করিয়া বৃহৎ মানবধর্ম লাভ করে। বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবন এবং তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি ও চর্যার যোগাযোগ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাশীল আলোচনা সে যুগের ভগ্নবিধ্বস্ত সমাজ ও বিশৃঙ্খল পারিবারিক

জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অনেকের ধারণা ভূদেব রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য বিশ্বাস করিলেও পুরাতন কূপমণ্ডূকতার মধ্যে কখনও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থে তাঁহার উদার, অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ভারতীয় মন জয়লাভ করিয়াছে। জাতীয় আদর্শে স্বস্থ থাকিয়া পাশ্চাত্ত্যের কল্যাণকর দিকটিকে গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার মত ও মন্তব্য এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচ্য।

আচারনিষ্ঠ, মননশীল, সমাজনেতা ভূদেবের আর একপ্রকার রচনা আছে, যেখানে তিনি রসশিল্পী, স্রষ্টা। ভূদেব প্রথম যৌবনে উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন—অবশ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্স্। তখনও যথার্থতঃ উপন্যাস রচিত হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব হয় নাই। ভূদেবের দুইখানি ঐতিহাসিক রোমান্স্ উল্লেখযোগ্য—(১) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), (২) 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫ সালে ধারাবাহিকভাবে এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত ও ১৮৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। প্রথম গ্রন্থটি ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত ইংরাজী *Romance of History* নামক কাল্পনিক কাহিনীর আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ইহাতে দুইটি বড় গল্প আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। মুসলমান যুগের সত্য ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পনাশ্রিত কাহিনী চয়ন করিয়া ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র প্রভাবে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হইয়াছে। উভয় উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমপ্রতিভার সঙ্গে ভূদেবের ঔপন্যাসিক প্রতিভার তুলনাই হয় না। ভূদেব ইতিহাস ও কল্পনাকে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে-জাতীয় কল্পনাকুশলতা ও সৃষ্টিক্ষমতা থাকিলে নিছক কাল্পনিকতাও শিল্পরূপ লাভ করে ভূদেবের সেরূপ প্রতিভা ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক রোমান্স্ 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর পরিকল্পনা-কৌশল প্রশংসনীয়। লেখক যেন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বালাজী বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি মুসলমানশক্তির নেতা আহ্মাদ শাহ্ আবদালিকে পরাভূত করিয়াছে। তারপরে ভারতবর্ষের কিরূপ পরিবর্তন হইতে পারিত, তাহারই এক কাল্পনিক অথচ কৌতূহলপ্রদ বর্ণনা এই রোমান্সের মূল আখ্যান। লেখকের ইতিহাস-চেতনা, স্বাদেশিকতা এবং কল্পনা এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়া গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ভূদেব 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৬৩) নামক গ্রন্থে গল্পের ছলে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভূদেব জীবনে যেমন সংযত আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, ভাষারীতিতেও তেমনি সর্বদা আতিশয্য পরিহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভূদেবের ভাষা মাধুর্যগুণ-বর্জিত, নীরস। ইহা কিন্তু সত্য নহে। মননশীল প্রবন্ধের ভাষায় উপন্যাসের ভাষারীতি অনুসৃত হয় না। তাঁহার ভাষারীতি বক্তব্যবিষয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল, স্বচ্ছ, যুক্তিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। আড়ম্বর আবেগবর্জিত বলিয়া এই ভাষা মননশীল রচনার

পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। নিম্নে ভূদেবের সংযত ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

"কর্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের আদর্শ। যাহা কর্তব্য তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করার ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয়দিগের অবশ্য কর্তব্যকর্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।" ('সামাজিক প্রবন্ধ')।

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)॥

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের রচনাকার প্যারীচাঁদ বাঙালীসমাজে সুপরিচিত। বস্তুতঃ 'আলাল'ই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। প্যারীচাঁদের উপন্যাসে নানা ত্রুটি থাকিলেও তাঁহার প্রথম উপন্যাসে তিনি যে বাস্তব জ্ঞান, সরসতা ও নিপুণ ভাষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রথম ঔপন্যাসিকের গৌরব দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।[১]

উপন্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও আরও নানা দিক দিয়া তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত দেশবরেণ্য প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ডিরোজিয়োর ভাবরসে লালিত প্যারীচাঁদ যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও হিন্দুর উদার আধ্যাত্মিক মতের বিশেষ পরিপোষক ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা, সমাজকল্যাণ, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ, মাসিক পত্রের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, কৃষিবিদ্যাচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি অদ্ভুত প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। দেশের অভিজাতসমাজ ও ইংরাজসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে, তিনিই একমাত্র বাঙালী, যিনি বাঙালী ও ইংরাজসমাজের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ এদেশে কৃষিকার্যকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলিয়া ধরেন এবং প্রেততত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি রহস্যময় ব্যাপারকে দার্শনিকতার দিক হইতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করেন। ওলকট্, মাদাম ব্লাভাট্স্কি প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদিগণ (Theosophists) তাঁহার সহায়তায় ভারতবর্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিপরিষদ এবং অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

প্যারীচাঁদ তাঁহার বন্ধু রাধানাথ শিকদারের[২] সহযোগিতায় নারীশিক্ষা প্রচারের

১. 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম উপন্যাস কিনা তাহা পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

২. রাধানাথ শিকদার ভারত সরকারের জমি জরিপ বিভাগে কর্ম করিতেন। ইনিই সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করেন। কিন্তু তাঁহার বিভাগীয় প্রধান এভারেস্ট সাহেবের নামে শৃঙ্গটির নামকরণ হয়।

জন্য সহজ চলিতভাষায় ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতেই প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ও ইংরাজী পত্রিকায় তিনি কৃষিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজীতে ও বাংলায় অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) সম্পাদন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, বিদ্যাসাগরী ভাষা তখন সাহিত্যসমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গুরুগম্ভীর ব্যাপারে বিদ্যাসাগরী ভাষার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার্য, কিন্তু সে ভাষা স্বল্পশিক্ষিত পুরুষ বা অন্তঃপুরিকা নারী-সমাজের জন্য নহে। তখন প্যারীচাঁদ যথাসম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় কাহিনী রচনা আরম্ভ করিলেন। প্যারীচাঁদ সাহিত্যক্ষেত্রে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। তিনি প্রগতিবাদী হইলেও সামাজিক অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন। তিনি তাঁহার অনেক রচনায় তদানীন্তন সমাজের পানদোষ ও চরিত্রভ্রষ্টতাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন এবং ঈষৎ পূর্ববর্তী সমাজের প্রাচীন নষ্টামিকেও অনুরূপভাবে তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে সরস পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লাক্ত উপভোগ্যতা এবং প্রাজ্ঞ বিচক্ষণতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলা কথাসাহিত্যের যথার্থ জীবন দান করিয়া প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের একটা বড় ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির বাসনায় লেখনী পরিচালনা করেন নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীসমাজ এমন সমস্ত প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইয়াছিল যে, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সাহিত্যসৃষ্টির অবকাশ অনেকের জীবন হইতে অপসৃত হইয়াছিল; বিশেষতঃ প্যারীচাঁদের মতো জনহিতব্রতী ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক প্রয়োজনহীন নিছক রসচর্চা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তিনি অনেকগুলি আখ্যান-আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন ('আলালের ঘরের দুলাল'—১৮৫৮; 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'—১৮৫৯, 'রামারঞ্জিকা'—১৮৬১, 'অভেদী'—১৮৭১, 'আধ্যাত্মিকা'—১৮৮০) তাহার মধ্যে দুই-একখানিতে আখ্যান-উপাখ্যানের ধর্ম অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস অপেক্ষা বাঙালীর ঘরের কথা সহজ সাধারণ ভাষায় বিবৃত করিয়া লোকসমাজের বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের উপকার এবং তদানীন্তন সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ—প্রধানতঃ ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম সার্থক উপন্যাসের সম্মান পাইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সামাজিক আন্দোলন, অনাচার, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সাময়িকপত্রে নক্শা ধরনের রচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যুগে স্কুল-বুক সোসাইটী, গার্হস্থ্য পুস্তকভাণ্ডার প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইসলামী উপকথা-গল্প-আখ্যানকে ভাষান্তরিত করিয়া প্রচার করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় কোনখানিতেই আখ্যানের অতিরিক্ত কোন উপন্যাসের লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে নাই। ইতিপূর্বে আমরা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা

উল্লেখ করিয়াছি। তিনিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপন্যাসধর্মী নক্‌শার অবতারণা করেন। তাঁহার 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-আখ্যানে খানিকটা গল্পরস পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে প্যারীচাঁদ কতকটা এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পল্লী ও নাগরিকজীবনের বাস্তবধর্মী এবং কৌতুকপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের* মতো তিনিও কৌতুক-ব্যঙ্গপূর্ণরচনায় ছদ্মনাম (টেকচাঁদ ঠাকুর) ব্যবহার করিতেন। অবশ্য ভবানীচরণ অপেক্ষা প্যারীচাঁদের নৈপুণ্য অধিকতর প্রশংসনীয়। তিনিই সর্বপ্রথম আখ্যানকে নক্‌শার খর্বতা হইতে উদ্ধার করিয়া উপন্যাসের পথ প্রস্তুত করেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি আর একখানি উপন্যাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা প্যারীচাঁদের উপন্যাসের পূর্ববর্তী এবং উপন্যাসের লক্ষণবিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল' অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে। ১৮৫২ সালে কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটীর উদ্যোগে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স্ নাম্নী উক্ত মিশনের এক ফরাসী মহিলা[৩] 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনা করেন। ইহা কোন মৌলিক গ্রন্থ নহে, একখানি ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর। ইহাতে দেশীয় খ্রীস্টান পরিবার, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের বর্ণনা ও কাহিনী আছে। গোঁড়া পাদ্রীর মতো লেখিকা বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া যিশু না ভজিলে বাঙালীর নিস্তার নাই। এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই তিনি ইংরেজী ভাষায় লেখা মূল আখ্যানটির (*The Week*) গল্পাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই দেশে তাঁহার জন্ম এবং এখানেই দেহান্ত হয়। শ্রীমতী ম্যুলেন্স বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাংলাভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কথ্য বাংলাও জানিতেন। তাই অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি ভবানীপুর মিশন স্কুলে বাঙালী খ্রীস্টান বালিকাদের বাংলা পড়াইতেন। তাঁহার বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদের 'আলালে'র পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহাকে কোন দিক দিয়াই নিন্দা করা যায় না। মাঝে মাঝে ইহার ভাষা এত সহজ ও সরল যে, আখ্যানটি কোন বিদেশিনীর লেখা বলিয়া মনেই হয় না।[৪] গ্রন্থটি দেশীয় খ্রীস্টান মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল; মিশন পরিচালিত স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তক ছিল বলিয়া ইহার জনপ্রিয়তা উক্ত সমাজে আরও বাড়িয়া

---

* ভবানীচরণ কোন কোন রচনায় 'প্রমথনাথ শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৩. কেহ কেহ মনে করেন যে, ইনি বিদেশিনী ছিলেন না। কিন্তু আমরা সেরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই।

৪. ইহা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

"তখন আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম, করুণা, তুমি যদি একটি পয়সার অভাব প্রযুক্ত পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি সে পয়সাটি তোমাকে দিই। তুমি ধোপার নিকটে গিয়া ধৌত শাড়ী পরিয়া শীঘ্রই গীর্জায় যাও। কিন্তু করুণার মুখ দেখিয়া বোধ করিলাম,

গিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্যতঃ খ্রীস্টানধর্মের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে, দেশীয় খ্রীস্টান সমাজের চিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং বোধ হয় সেইজন্য সে যুগে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালীসমাজে ইহা আদৌ পরিচিত ছিল না। তাহা হইলেও সে যুগে এরূপ সরল সাধুভাষায় আখ্যায়িকা রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে বাদ দিলে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই এদেশে প্রথম উপন্যাসের গৌরব লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—(১) কাহিনী, (২) চরিত্র, (৩) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, (৪) স্থানীয় পরিবেশ, (৫) সংলাপ, (৬) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন। ইহার মধ্যে প্যারীচাঁদ কাহিনী চয়নে ও চরিত্র নির্মাণে কিঞ্চিৎ কৌশল দেখাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীসমাজ, বিশেষতঃ কলিকাতা সমাজের উচ্ছৃংখলতা ও অনাচার বর্ণনা ইহার মূল উদ্দেশ্য। বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু নামক এক ধনাঢ্য জমিদারের আদরের সন্তান মতিলাল কুসঙ্গে মিশিয়া কিরূপ অধঃপাতে যায় এবং পরে দারুণ দুঃখ ও দুর্ভাগ্য সহিয়া আবার সৎপথে ফিরিয়া আসে—এই নৈতিক তত্ত্বকথাটি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। নীতিকথার জন্য ইহার মূল্য নহে। বরং নীতির প্রতীক চরিত্রগুলি (বরদাবাবু, রামলাল, বেণীবাবু) সৎ চরিত্র হইলেও জীবন্ত হইতে পারে নাই। অপরদিকে বাবুরামবাবু, মতিলাল ও তাহার কুসঙ্গীরা, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম—এই সমস্ত অপদার্থ চরিত্র আশ্চর্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ ঠকচাচা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে একটি উজ্জ্বল চরিত্র। প্রাচীন বাংলার ভাঁড়ুদত্ত, মুরারিশীল প্রভৃতির স্বগোত্র হইলেও তাহাকে 'টাইপ' চরিত্র বলিয়া ভুল করার উপায় নাই। রচনাকৌশলের বাস্তবতা ও সজীবতা ঠকচাচার স্বার্থপর ধূর্ত চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসের অন্যান্য আঙ্গিক বিচারে 'আলাল' পূর্ণ উপন্যাস বলিয়া কখনও স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু ইহাতে কলিকাতার সজীব চিত্র, শিক্ষাদীক্ষা, আইন-আদালত এবং দৈনন্দিন জীবন এমন কৌশলে এবং উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে যে, প্যারীচাঁদের বর্ণনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সর্বোপরি ইহার ভাষা। বিদ্যাসাগরের গুরুগম্ভীর 'ক্লাসিক' ভাষা ছাড়িয়া কলিকাতা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সাহায্যে তিনি দৈনন্দিন জীবনের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়াছিলেন। ইহার মূল কাঠামো সাধুভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লেখক বর্ণনা ও চরিত্রকে জীবন্ত করিবার জন্য কলিকাতার চলতি বুলির যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ প্যারীচাঁদকে চলিত ভাষার লেখক বলিয়া প্রভূত সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ প্রচুর পরিমাণে চলিত শব্দ ব্যবহার করিলেও বিশুদ্ধ চলিত ভাষার কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। খাঁটি চলিত ভাষায়

তাহার গীর্জায় যাইবার ইচ্ছা ছিল না। সে পয়সাটি হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, ও বিবিসাহেব, দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু দেও। ঘরেতে আমার একটি সন্তান বড় পীড়িত আছে এবং তাহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিই, এমত আমার কিছু সঙ্গতি নাই।"

('ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', আধুনিক সংস্করণ, পৃঃ ২৮)

সর্বপ্রথম গ্রন্থ—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২)।* প্যারীচাঁদের ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

"বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতিপরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে। শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুই চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পান্‌সি ভাড়া কর তো। বড়মানুষের খানসামারা মধ্যে ২ বেআদব হয়, হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বসেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এয়েছি !...চল্‌তি পান্‌সি চারপয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—একি থুতকড়ি দিয়ে ছাতু গোলা ?"

প্যারীচাঁদের অন্যান্য আখ্যানে উপন্যাস-লক্ষণ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) উপন্যাস নহে ; দশটি আখ্যানে হিন্দু সমাজের মারাত্মক ত্রুটি মদ্যাসক্তি এবং ক্ষুদ্র-জাতিচেতনার বিষময় ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। আখ্যানগুলি জমিয়া উঠিতে না পারিলেও লেখকের সরস পরিহাসভঙ্গী উপভোগ্য হইয়াছে। 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) স্ত্রীলোকের জন্য কথোপথনের ঢঙে রচিত ; সামান্য আখ্যানের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু নীতি-উপদেশের বাড়াবাড়ি অধিক। 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) আখ্যানে গল্পের আকারে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) দুইখানিই রূপকধর্মী উপন্যাস। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন ইহাদের মূল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে 'থিয়োজফিস্ট' (অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্) প্যারীচাঁদ প্রাধান্য পাইয়াছেন বলিয়া ইহার গল্পরস ভারী ভারী তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। দুই-এক স্থলে সরস পরিহাসমুখর চিত্র আছে বটে, কিন্তু 'আলালের' তুলনায় তাহা নীরস ও পাণ্ডুর বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়াও তিনি কৃষি ও অন্যান্য তত্ত্ব বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও তাঁহার রচনা। অবশ্য এগুলিতে বিশেষ কোন সাহিত্যগুণ নাই। 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচনাকার ঘরের কাহিনীকে অতি সরস ভাষায় নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বাংলা সাহিত্যে সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত।

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ॥

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বাংলাদেশের এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি তদানীন্তন অভিজাত সমাজের কদাচারকে কখনও ক্ষমা করেন

---

* 'আলালী' ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষার অসতর্ক মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ মিশ্রণকে সে যুগের লেখক-পাঠকেরা ত্রুটি বলিয়া মনে করিতেন না।

নাই। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা এবং নানা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি কলিকাতা শহরে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে সংবর্ধিত করেন। 'নীলদর্পণে'-র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অপরাধে রেভাঃ লঙ সাহেবের কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন বিচারের দিন টাকা লইয়া আদালতে উপস্থিত হন এবং তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাকা প্রদান করেন। কলিকাতার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া এবং উদার মন ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বনামধন্য হইয়াছিলেন।

তিনি ছদ্মনামে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২) লিখিয়া একদিনেই কুখ্যাতি ও সুখ্যাতি—উভয়ই প্রচুর পরিমাণে লাভ করেন। তিনি সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকখানি নাটক-প্রহসন (বাবু-নাটক—১৮৫৪, বিক্রমোর্বশী—১৮৫৭, সাবিত্রী-সত্যবান্—১৮৫৮, মালতী-মাধব—১৮৫৯) এবং মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১৮৬০-৬৬) করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।* বর্ধমান রাজসভা প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলে পরবর্তী যুগে 'কালীসিংহের মহাভারত' বাংলার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে এবং দুইভাগ একত্রে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। 'কলকেতার হাটহদ্দ' (১৮৬৪ ?) এবং 'বাবুদের দুর্গোৎসব' রচনা দুইটির বিষয়বস্তু ও রচনারীতি অবিকল 'হুতোম প্যাঁচার নক্শার' মতো; তাই লেখক-নামহীন এই পুস্তিকা দুইটিও কালীপ্রসন্নের রচনা বলিয়া মনে করা হয়। কলিকাতার খাঁটি 'কক্নি বুলিতে'[৫] 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এবং অন্য দুইখানি পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার নাগরিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, চারিত্রদুষ্টি, নানাবিধ কদাচার প্রভৃতি কুৎসিত অধঃপতনের দৃশ্য হুতোমের নক্শায় এরূপ জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার অদ্ভুত সাহিত্যরস এখনও প্রশংসা দাবি করিতে পারে। কলিকাতার বিভিন্ন উৎসব, পালপার্বণ, দলাদলি, বারোয়ারী পূজা, নানাপ্রকার অদ্ভুত হাস্যকর হুজুগ, বুজরুগি, আকস্মিক ধনাগমে উদ্ধত 'ঠনঠনের হঠাৎ-অবতারগণের' মর্কটলীলা, মাহেশের রথযাত্রা ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের জীবন্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ হাস্যকর বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। কালীপ্রসন্ন মনেপ্রাণে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; তিনি বাঙালীর সমাজ ও জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেন, তাহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেও

* অবশ্য এই অনুবাদকর্মে তাঁহাকে বেতনভুক পণ্ডিতগণ সাহায্য করিতেন।

৫. কলিকাতা 'কক্নি'—কলিকাতার ঈষৎ নিম্নস্তরে ব্যবহৃত চলতি বুলি। 'Cockney' শব্দটি লণ্ডন শহরের সাধারণ লোকের কথ্যভাষা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। লণ্ডন 'কক্নি'র অনুকরণে বাংলা ভাষাতত্ত্বে কলিকাতা 'কক্নি' ('Calcutta Cockney') শব্দটি পরিকল্পিত হইয়াছে।

দ্বিধাবোধ করিতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখনও এই শহরের অধিবাসীরা কুৎসিত নাগরালিতে মত্ত হইত। তাই কালীপ্রসন্ন ক্ষিপ্ত হইয়া 'হুতোমে'র ছদ্মবেশে তীব্র ভাষায় এই সমস্ত কুৎসিত ব্যাপারকে আক্রমণ করিয়া দুইখণ্ডে 'নক্শা' রচনা করেন। বাঙালীর চারিত্রিক অধোগতি এবং কুসংস্কারকে এরূপ শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিবার মত দুঃসাহস ও সুকঠোর বাক্‌কৌশল সে যুগে আর কাহারও ছিল না। কালীপ্রসন্ন ছদ্মবেশের অন্তরালে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া তৎকালীন বাঙালীর নীচতা ও দুষ্ট চরিত্রকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কোন কোন স্থলে অশিষ্ট, কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন বর্ণনা ছাপার অক্ষরে মুদ্রণের অযোগ্য, উচ্চারণমাত্রেই ব্রীড়া জন্মায়। কিন্তু সমাজের দুষ্টক্ষত দূর করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই এই অপ্রীতিকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে যুগের ব্রাহ্ম-আদর্শে পরিপুষ্ট এবং 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' (Mid-Victorian)* নীতি ও সাহিত্যরুচিতে বর্ধিত অনেক শিক্ষিত বাঙালী হুতোমি আক্রমণের ঝাঁঝ সহ্য করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের বিশেষ প্রশংসা করিলেও হুতোমকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।" ইংরাজী-আওতায় বর্ধিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরুচি হুতোমের বিরুদ্ধে তাঁহার মনকে বিষাইয়া দিয়াছিল। হুতোমি ভাষার মত শক্তিশালী তীক্ষ্ণভাষা পরবর্তী কালে চলিত ভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মুখের ভাষাকে অবিকৃত রাখিয়া তাহাকে সাহিত্যে প্রয়োগের দুঃসাহস সে যুগে তো নহেই, বিংশ শতাব্দীতেই বা কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন ? কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কীর্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এখানে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"অমাবস্থার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুরগুর করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্চে—গাছের পাতাটি নড়ছে না—মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশের পানে চাচ্চেন, আর হন হন করে চলেছেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে যাবার উজ্জুগ কচ্চে—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।"

প্যারীচাঁদ ও হুতোমের ভাষার মধ্যে নানা দিক দিয়া বৈসাদৃশ্য আছে। প্যারীচাঁদ মূলত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন ; অবশ্য প্রয়োজন স্থলে কলিকাতার মুখের বুলি ও গ্রাম্য ভাষাও তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাধুভাষা

---

* ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির ফলে সমাজে নীতিবোধ, সাম্রাজ্যবাদী নিশ্চয়তা, খ্রীষ্টানী আদর্শের প্রতি ধ্রুব বিশ্বাস প্রভৃতি এত প্রবল হইয়াছিল যে, অত্যধিক শুচিতা ও নীতির কৃত্রিম প্রভাবে এই যুগের ইংরাজী সাহিত্য কিয়দংশে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

ও চলিতভাষার সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় লেখকই চলিতভাষা ও সাধুভাষার পার্থক্য মানিয়া চলেন নাই। এ বিষয়ে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি সাধুভাষায় পরম প্রাজ্ঞ হইলেও আগাগোড়া কলিকাতার চলতি বুলিতে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনা করিয়া নিপুণ ও তীক্ষ্ন ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এমন ঘনিষ্ঠভাবে মুখের ভাষাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত উচ্চারণরীতি, উচ্চারণের মুদ্রাদোষ—এ সমস্তকেই ধ্বনি অনুসারে বানান করিয়াছিলেন, ব্যাকরণের বানান অনেক সময় গ্রাহ্য করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর কোন গ্রন্থে পুরাপুরি চলিতভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী চলিতভাষাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন, নিজেও চলিতভাষার একজন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন। কিন্তু হুতোমের তুলনায় "বীরবলের" (প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম) ভাষা বিশুদ্ধ কথ্য ভাষা নহে; বলিতে কি প্রমথ চৌধুরীর ভাষা অতিশয় মার্জিত, এবং এতই ভদ্র যে, প্রায়ই সাধুভাষার মতো অল্পাধিক কৃত্রিম ও গুরুভার। প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে রচিত হুতোমি ভাষার তীব্র প্রকাশরীতি এবং অনাবৃত জীবনের অসঙ্কুচিত প্রকাশের দুঃসাহস চিরদিন প্রশংসা লাভ করিবে।

প্যারীচাঁদের সঙ্গে হুতোমের আরও একটা বড় রকমের পার্থক্য—প্যারীচাঁদ আখ্যান লিখিয়াছেন, হুতোম 'নকশা' উড়াইয়াছেন। হুতোমের বিদ্রুপাত্মক ভূমিকাটিই প্রধান। অপরদিকে প্যারীচাঁদ রঙ্গরসের সাহায্য গ্রহণ করিলেও মূলতঃ উদারতর পটভূমিকায় মানুষের জীবনকাহিনীকে বিবৃত করিয়াছেন। হুতোম সামাজিক ব্যাধিকে আক্রমণ করিতে গিয়া সুরুচির মুখ রক্ষা করা আদৌ প্রয়োজন বোধ করেন নাই, অতিশয় কুৎসিত শব্দ ব্যবহার করিয়া অশিষ্টের ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়াছেন। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরিচিত প্যারীচাঁদ লঘু হাস্যপরিহাস করিলেও কখনও অশ্লীলতা বা অশিষ্টতার ধার দিয়া যান নাই। হুতোম জানিতেন যে, তাঁহার রচনা সমসাময়িক প্রয়োজনে আবির্ভূত হইয়াছে, সেই যুগ কাটিয়া গেলে তাঁহার গ্রন্থও লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া যাইবে—যদিও তাহা হয় নাই,—বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা সত্ত্বেও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ঊনবিংশ শতাব্দীর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। অপরদিকে প্যারীচাঁদ নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একস্থানে দুইজনের মিল আছে। দুইজনেই বাঙালীর সমাজ ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং উভয়েই বাঙালীর সামাজিক কুক্রিয়াকে নিন্দা করিয়াছেন। প্যারীচাঁদের নিন্দা পরিহাসমিশ্রিত হাস্যরসে উতরোল; হুতোমের নিন্দা তীব্র ও নির্মম কশাঘাতে দুর্বিষহ।*

* সম্প্রতি কেহ কেহ বলিতেছেন যে, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কালীপ্রসন্নের রচনা নহে, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার এক অনুগত ব্যক্তির রচনা। এবিষয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

আরও কয়েকজন গদ্যলেখক ॥

এই যুগে আরও কয়েকজন লেখক গদ্যসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১) সে যুগের একজন মনীষী-ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাময়িকপত্র পরিচালনা, নানা সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের সম্পাদনা প্রভৃতির দ্বারা তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয়ের পক্ষ হইতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) এবং 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩) জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যপত্রিকা হিসাবে প্রায় 'বঙ্গদর্শনে'র মতোই জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য রীতিতে গ্রন্থ সমালোচনা আরম্ভ করেন; তিনিই পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার আদর্শে আধুনিক বাংলা সমালোচনার জন্মদান করেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৫৮ সালে মৃত্যু) বিদ্যাসাগরের ছাত্র এবং অনুচর ছিলেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁহারও একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। বাণভট্টের কাদম্বরীকে সরল বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া (১৮৫৪) এবং জনসনের উপন্যাস অবলম্বনে 'রাসেলাস' (১৮৫৭) রচনা করিয়া একদা তিনি বাংলা গদ্যের একটি গাম্ভীর্যমিশ্রিত ক্লাসিক রীতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭—১৯০৫) সে যুগের একজন স্থিতধী আত্মস্থ ধর্মপ্রাণ সাধুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র, মহত্ত্ব, আদর্শনিষ্ঠা বাঙালীর সুবিদিত। দেবেন্দ্রনাথ শান্ত সংযত ঔপনিষদিক ভক্তিবাদে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও দেশ ও সমাজের নানা কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজে নূতন জীবনরস প্রবেশ করে; তিনিই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রকাশের উদ্যোগ করিয়া বাঙালী-মনীষার একটা মহৎ উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভাও অতিশয় মূল্যবান। প্রধানত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের ভূমিকা লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। তিনি ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে যে সমস্ত অভিভাষণ দিতেন, তাহার ধর্মীয় নিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা ও উপলব্ধির নিবিড়তা বিস্ময়কর। উপরন্তু তাঁহার ভাষার মধ্যে একটা সরল সহজ সাহিত্য রসসিক্ত মনের কথাটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সে যুগের অনেকে এই সমস্ত ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানকে ধর্মীয় ব্যাপার বলিয়া ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন; তাই তখন ইহার মাধুর্য ততটা বুঝা যায় নাই। মহর্ষির স্বরচিত জীবনচরিতটি ('পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত'—১৮৯৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর একখানি

বর্তমান প্রসঙ্গে এ আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়া আমরা তাহাতে বিরত হইলাম। কিন্তু এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কালীপ্রসন্নকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র গ্রন্থকর্তৃত্ব হইতে খারিজ করিবার মতো জোরালো প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অবশ্য ইহাতে মহর্ষিদেবের ধর্মানুভূতি ও অধ্যাত্ম উপলব্ধিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তবু ইহাতে তদানীন্তন দেশ ও কালের এমন অনেক সংবাদ আছে যে, ইতিহাস হিসাবেও ইহার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। মহর্ষির ভাষা তাঁহার চরিত্রের মতোই পবিত্র, উজ্জ্বল ও সাত্ত্বিক গুণান্বিত। ইহার শান্ত সংযত শ্রী এখনও অনুকরণযোগ্য।

দেবেন্দ্র-প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। তাঁহার চরিত্র, শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি সুদৃঢ় আস্থা আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। ডিরোজিওর ভাবরসে বর্ধিত মধুসূদন-ভূদেবের সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণের জীবন গোটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ছাত্র-জীবনে তিনি অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলদের' মতো ভাঙনের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। মদ্যপান, নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে মত্ত হইয়াও যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের মহৎ আদর্শ গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান নেতা বলিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হন। সারাজীবন তিনি সদ্ধর্ম পালন ও শিক্ষা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এদেশের সংস্কৃতিকে ভালবাসিয়া, সমাজে ও জীবনে স্বদেশী মনোভাব প্রচার করিয়া, হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র ভাবদ্বন্দ্বকেই যেন নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশগুলি সুখপাঠ্য ও সাহিত্য-গুণান্বিত। বাংলা গদ্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সহজ, সুললিত ও প্রসন্ন গদ্যরীতিটি তিনি অতি নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭), 'আত্মচরিত' (১৯০৯ সালে মুদ্রিত) প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার প্রসন্ন, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং স্বদেশী মনটি তাঁহার রচনায় একটি মধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পূর্বতন ধারা ॥

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ধরনের মঞ্চাভিনয় শুরু হয় ইংরাজ বিজয়ের পর—কলিকাতা শহরে। তাহার পূর্বে বাংলাদেশে যে অভিনয়ের অস্তিত্ব ছিল না, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতে নাটক ও নাট্যাভিনয় অভিজাতসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; সংস্কৃতে বহু নাটক রচিত হইয়াছিল এবং নাট্যকলা, নাট্যতত্ত্ব ও মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে সংস্কৃতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অভিজাত-সমাজের নাট্যাভিনয়ে সব সময়ে সাধারণে প্রবেশাধিকার পাইত না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের অনুরূপ একপ্রকার লোকাভিনয় (Folk Drama) প্রচলিত ছিল। হোলিকা, শবরোৎসব, অন্যান্য দেবদেবীর পূজা-অর্চনা, শুভযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষে এই সমস্ত লোকাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। পরবর্তী কালের বাংলাদেশের যাত্রা এই লোকাভিনয়েরই বংশধর। এখনও উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে জনসাধারণে দল বাঁধিয়া রামযাত্রার ('রামলীলা') অনুষ্ঠান করে। পরে মুসলমান শাসনকালে মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিকূলতার জন্য অভিজাতসমাজ হইতে অভিনয়-কলা একেবারে লোপ পাইয়া গেল। বস্তুতঃ পৃথিবীতে কোন মুসলমান রাজশক্তি অভিনয়-কলাকে সাহায্য করে নাই, সর্বত্রই এই আমোদ-প্রমোদ কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিল। কারণ ইসলামি শাস্ত্রমতে সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় নিষিদ্ধ।

খৃীঃ ১০ম শতাব্দীর পরে অভিজাতসমাজে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না ; ইহার পর সংস্কৃত সাহিত্যেরও পতন হয়। কিন্তু জনসমাজে লোকাভিনয়ের ধারা লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংল্য গ্রন্থের অনেক স্থলে অভিনয়-সংক্রান্ত নানা ইঙ্গিত আছে। চর্যাপদে অভিনয়ের উল্লেখ আছে ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লোকাভিনয় বা ঝুমুর-ঢঙে রচিত ; নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটকও এই লোকাভিনয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ঝুমুর, তর্জা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি লোকাভিনয় বাংলাদেশে বহুদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আধুনিকতার প্লাবনে নাগরিক জীবন হইতে লোকাভিনয়ের ধারা লুপ্ত হইয়া গেলেও পল্লীগ্রামে ইহার ক্ষীণধারা এখনও বহমান। স্বয়ং চৈতন্যদেব নাটকাভিনয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন, তাঁহার অনুচর-পরিকরদের লইয়া তিনি একাধিকবার কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা যাত্রাভিনয়—মঞ্চাভিনয় নহে। তাঁহার প্রভাবেই হয়তো রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে ('বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব') এবং কবিকর্ণপুর চৈতন্যলীলা অবলম্বনে ('চৈতন্যচন্দ্রোদয়') সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যাত্রাভিনয় অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলে মহাসমারোহে কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত। 'কালীয়দমন লীলা' যাত্রাগান অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিলে সমস্ত কৃষ্ণযাত্রাই 'কালীয়দমন পালা' নামে অভিহিত হইত। চণ্ডী ও মনসার লীলাও পূজা-অনুষ্ঠানে অভিনীত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কৃষ্ণনগরের দরবারী আদর্শে আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও কবিগান, আখড়াই গান, হাফ-আখড়াই গানের সঙ্গে কলিকাতা অঞ্চলে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'কালীয়দমন' যাত্রার পরিচালক শিশুরাম অধিকারী, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুবল, বদন অধিকারী এবং লোচন অধিকারী সুখ্যাত ছিলেন। নিমাইসন্ন্যাসের পালাও পশ্চিমবঙ্গে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। যাত্রাওয়ালা হিসাবে গোবিন্দ অধিকারীর দেশব্যাপী খ্যাতি ও সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ও সুগায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ভক্তিরস ও গীতিরসের সংমিশ্রণে মার্জিত রুচির যাত্রাগান ('রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্নবিলাস' ইত্যাদি) রচনা করিয়া যাত্রার মান ও প্রভাব অনেক বর্ধিত করিয়াছিলেন। অবশ্য বিদ্যাসুন্দর যাত্রার রুচিবিগর্হিত প্রভাব একটু বেশী মাত্রায় সমাজজীবনে প্রবেশ লাভ করে। গোপাল উড়ে খেমটার ঢঙে বিদ্যাসুন্দর পালা নাচিয়া গাহিয়া নাগরিক সমাজকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ভাবধারা যাত্রাকেও প্রভাবিত করিল; ইহাতে মঞ্চাভিনয়ের ধারা অনুসৃত হইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতার অনেক ভদ্র ব্যক্তি যাত্রার দল খুলিয়া যাত্রার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যকে নাগরিকতায় রূপান্তরিত করিলেন। ইহার ফলে যাত্রার প্রাচীন বিশুদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। ইহাকে ইংরাজী 'অপেরা'র আদর্শে 'অপেরা' নামেই অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগে য়ুরোপে 'Miracle Play' ও 'Morality Play' নামক একপ্রকার ধর্মীয় অভিনয় প্রচলিত ছিল। ইহাতে যাজকসম্প্রদায় প্রধান কর্মকর্তার ভূমিকা গ্রহণ এবং অভিনয়াংশে যোগদান করিতেন। যাত্রার সঙ্গে এই 'মিরাক্‌ল্' ও 'মরালিটি' নাটকের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য বড় কম নয়। যাত্রা প্রধানতঃ গীতাত্মক, গদ্য সংলাপের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; প্রথম যুগে তো বাঁধাদস্তুর কোন সংলাপই ছিল না, অভিনেতারাই নৃত্যগীতের ফাঁকে ফাঁকে স্থানকালোপযোগী সংলাপ ইচ্ছামতো জুড়িয়া দিতেন। কিন্তু 'মিরাক্‌ল্' ও 'মরালিটি' অভিনয় মূলতঃ অভিনয়াত্মক, পুরাপুরি নৃত্যগীতাত্মক নহে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় ব্যাপার, বাইবেলের আখ্যান বা কোন মহাপুরুষের (সেন্টের) জীবনী ছাড়া অন্য কোন বাস্তব লৌকিক কাহিনী ইহাতে অভিনীত হইতে পারিত না। কিন্তু আমাদের দেশে যাত্রার শেষের দিকে রোমান্টিক প্রণয়মূলক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। অবশ্য য়ুরোপে রেনেসাঁসের প্রভাবে যাজক-সম্প্রদায়-নিয়ন্ত্রিত মরালিটি অভিনয়ে ধর্মীয় ভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতে লৌকিক জীবনের প্রভাব অধিকতর প্রাধান্য অর্জন করে। আধুনিক কালে বাংলা নাটক ও অভিনয়-কলা যাত্রা হইতে জন্মলাভ

করে নাই। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী নাটকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ইংরাজের নাট্যমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই তরুণ বাঙালী-সমাজে অভিনয়ের আদর্শ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আধুনিক নাটক ও নাট্যমঞ্চের সূচনা ॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য নাটক ও নাট্যাভিনয় হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে ইংরাজী নাটকাভিনয় দেখিয়া সর্বপ্রথম অভিনয়-কলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন অবশ্য কলিকাতায় পুরাতন লোকাভিনয়কে অপেরার ছাঁচে ঢালা হইতেছিল। কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের আধুনিক রুচি অপেরার গীতাত্মক আবেগধর্মী অভিনয়ে এবং যাত্রার হাস্যপরিহাসে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য নাট্যধারার অনুগামী হইয়া বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় প্রচলিত করিবার প্রথম গৌরব লাভ করিলেন। অবশ্য বাংলা নাটক ইংরাজী নাট্যকলা ও নাট্য-সাহিত্যকে অনুকরণ করিলেও কখনই পুরাপুরি যাত্রার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনার বহুস্থলে উৎকটভাবে যাত্রার প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই কলিকাতায় ইংরাজ বণিকের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল, কিছু কিছু ইংরাজ এখানে বাস করিতেন। তাঁহাদের জাতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর যেখানে তাঁহারা দল বাঁধিয়া থাকেন, সেখানেই একটি 'প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাট্যকলা অনুশীলন করেন। কলিকাতায় আধুনিক নাগরিক জীবন আরম্ভ হইবার পূর্বেই মুষ্টিমেয় ইংরাজ অধিবাসী এখানে নাট্যশালা স্থাপন করিয়া রীতিমতো অভিনয় করিতেন। ১৭৫৩ সালেরও পূর্বে কলিকাতার লালবাজারে উত্তর-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে হাউস' ইংরাজদের প্রথম রঙ্গালয়। তাহার পরে ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা থিয়েটার একদা ইংরাজ মহলে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইঁহারা শুধু ইংরেজী নাটক অভিনয় করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না; দেশীয় নাটকের ইংরাজী অনুবাদের অভিনয়েও ইঁহাদের আপত্তি ছিল না। ১৭৮৯ সালে এই নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কালিদাসের শকুন্তলা *The Indian Drama of Shakuntola or Fatal Ring* নামে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। সে যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী ব্রিস্টো ইহাতে নিয়মিত অভিনয় করিতেন। তিনি নিজেই নিজ নামে ব্রিস্টো থিয়েটার (১৭৮৮) প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত চন্দননগর থিয়েটার (১৮০৮), 'এথেনিয়ম' (১৮১২), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), খিদিরপুর থিয়েটার (১৮১৫), দমদম থিয়েটার (১৮১৭), বৈঠকখানা থিয়েটার (১৮২৭), সাঁসুচি থিয়েটার (১৮৩৯) প্রভৃতি ইংরাজী রঙ্গালয়ের নাম উল্লেখ

করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটার ও সাঁসুচি থিয়েটার সে যুগে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাতে অভিনয় করার সুযোগ পাইলে যে-কোন ইংরাজ পরম গৌরব লাভ করিতেন। অনেক শিক্ষিত বাঙালী এই থিয়েটারে নিয়মিত ইংরাজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং এই অভিনয় দেখিয়াই তাঁহারা বাংলাদেশে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে হেরাসিম (জেরাসিম বা গেরাসিম) লেবেডেফের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারের (১৭৯৫) পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

বিচিত্র প্রতিভাধর লেবেডেফ নামক এক রুশীয় পর্যটক কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার পুরাতন চীনাবাজারের নিকট ডোমতলা লেনে তিনি ১৭৯৫ সালে দেশীয় নট-নটীর সাহায্যে *The Disguise* নামে একখানি ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া (ইহার বাংলা নাম 'কাল্পনিক সংবদল') মহাসমারোহে অভিনয় করাইয়াছিলেন (নভেম্বর, ১৭৯৫)। অভিনয়ে ভারতচন্দ্রের কবিতা গান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ঐকতান সঙ্গীতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভব ইহাতে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার হাল্‌কা গান ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের ফরাসী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ *Love is the Best Doctor* (অভিনয়ের তারিখ—মার্চ, ১৭৯৬) বাংলায় অনুবাদ করিয়া তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয় দেখিবার জন্য ইংরাজ ও বাঙালী দর্শকের প্রচুর সমাগম হইয়াছিল। ইহার পর দীর্ঘদিন বাংলা নাট্যাভিনয়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলিকাতার শুঁড়া অঞ্চলে যে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন, তাহাতে ইংরাজী নাটক ও সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ব্যতীত কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয় নাই। তারপর স্কুল-কলেজের ছাত্রেরাও নানা উপলক্ষে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের দুই-চারি দৃশ্য অভিনয় করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রেরা ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার (১৮৫৩) প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজী নাটকের অভিনয় করিতেন। অবশ্য এসব প্রচেষ্টা দীর্ঘজীবী হয় নাই।

১৮৩৩ সালের দিকে শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাটিতেই বোধহয় সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের যথার্থ অভিনয় হইয়াছিল ('বিদ্যাসুন্দর')। তাহার বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে আশুতোষ দেবের বাটীতে নন্দকুমার রায় রচিত 'শকুন্তলা'র অভিনয় (১৮৫৭) হইয়াছিল। অভিনয়ের জনপ্রিয়তা দেখিয়া ইহার কিছু পূর্বেই কেহ কেহ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫৩), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' (১৮৫২), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক'

(১৮৫১), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' (১৮৫৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'কীর্তিবিলাস' বাংলাদেশের প্রথম ট্র্যাজেডী, 'বিধবা-বিবাহ নাটক' দ্বিতীয় ট্রাজেডি। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' উৎকৃষ্টতর হইলেও প্রথম ট্র্যাজেডি নহে। তারাচরণের 'ভদ্রার্জুনে' সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসৃত হইয়াছিল; ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী প্রস্তাবনা, নট-নটী প্রভৃতি পুরাতন ধরনের রীতি অনুসৃত হইত। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' শেক্‌স্‌পীয়ারের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস' অবলম্বনে রচিত। উমেশ মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ-নাটক' এই দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বিধবা-বিবাহ সমাজে না চলিলে নারীজীবনে কিরূপ ট্রাজেডি ঘনাইতে পারে তাহা সহৃদয়তার সঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) এবং 'বাবু নাটক' ছাড়াও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন—যথা, 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯)। এগুলি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগের প্রায় কোন নাটকেই অভিনয়গুণ বিশেষ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। একমাত্র রামনারায়ণ তর্করত্নের কয়েকখানি নাটক বাদ দিলে কাহারও নাটক অভিনেতব্য নাটক হিসাবে সার্থক হয় নাই।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২—১৮৮৬) মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যকার ও প্রহসনকাররূপে কলিকাতার অভিজাত সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।[২] কৌলীন্য প্রথার কুফল প্রদর্শনের জন্য হাস্যপরিহাস ও লঘুভাব অবলম্বনে তিনি এই নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩] এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক নাটক ('রুক্মিণীহরণ'—১৮৭১, 'কংসবধ'—১৮৭৫, 'ধর্মবিজয়'—১৮৭৫), অনুবাদ নাটক ('বেণীসংহার'—১৮৫৬, 'রত্নাবলী'—১৮৫৮, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'—১৮৬০, 'মালতীমাধব'—১৮৬৭) এবং কয়েকখানি প্রহসন ('যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট') রচনা করিয়া রামনারায়ণ সর্বত্র 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। পুরাতন আদর্শ ও বিষয়বস্তু লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন নাটকই উল্লেখযোগ্য নহে। তবে মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি বাঙালী জনসাধারণের রুচিকে নাট্যাভিনয়ের দিকে খানিকটা ফিরাইতে পারিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন।

২. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. তাঁহার 'নবনাটক' (১৮৬৬) বহুবিবাহের কুপ্রথাকে নিন্দা করিয়া রচিত হয়। ইহা 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র মতো জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের পর বাঙালী সমাজে বাংলা নাটকাভিনয়ের সাড়া পড়িয়া গেল। বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৫), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৭), বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৮) প্রভৃতি নাট্য প্রতিষ্ঠানে অনেক নাটক অভিনীত হইয়াছে[৪]; বাঙালীর নাট্যরুচিও মার্জিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন না হইলে নাটকের উন্নতি হইতে পারে না। এতদিন ধর্মীয় উৎসব, সখ-সৌখীনতা ও ধনীর খেয়ালখুশির উপর নাটকাভিনয় নির্ভর করিত, এবং সে সমস্ত অভিনয়ে অধিকাংশ সময়ে অভিজাত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কেহ প্রবেশাধিকার পাইত না। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর বাংলা নাটকে যুগান্তর দেখা দিল। ইতিপূর্বে বাংলা নাটকাভিনয়ে টিকিট বিক্রয়ের প্রথা ছিল না। অবশ্য ইহার কিছু পূর্বে ঢাকা শহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় টিকিট বিক্রয় করিয়া নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর হইতে। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অভিনেতা ও নাট্যকারগণ নাটকাভিনয় ও নাটক রচনায় দ্বিগুণ উৎসাহে যোগদান করিলেন। বাংলা নাটকের যথার্থ গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইল গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পর।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) ॥

বাংলা সাহিত্যের পরম মাহেন্দ্রক্ষণে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছিল। মাত্র সাতটি বৎসর সাহিত্য রচনা করিয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যকে এক শতাব্দী আগাইয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাব আকস্মিক, এবং প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নহে—নাট্যকাররূপে। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদন ইংরাজী কবিতা রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার অনেক ইংরাজী কবিতা স্থানীয় ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। মাদ্রাজে বাস করিবার সময় তিনি দুইখানি ইংরাজী কাব্য প্রণয়ন করেন—*Captive Ladie* এবং *Visions of the Past*, দুইখানি কাব্য একত্রে ১৮৪৯ সালে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি *Rizia* নামক একখানি ইংরাজী নাটকও লিখিয়াছিলেন কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই। মধুসূদন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কলিকাতা পুলিশকোর্টে দোভাষীর চাকুরী করিতেছেন। সেই সময় কলিকাতায় নাটকাভিনয় খুব জমিয়া উঠিয়াছে। ভালো নাটক নাই, কিন্তু তাহাতে অভিনয়ে বাধা ঘটিতেছে না। সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া মহাসমারোহে অভিনয় চলিতেছে। সে অনুবাদ সুশ্রাব্য তো দূরের কথা, প্রায় অপাঠ্য বলিলেই চলে। সাধুভাষা ও পয়ার-ত্রিপদীতে রচিত সংস্কৃত হইতে অনূদিত এইরূপ একখানি বাংলা নাটক দর্শন করিবার জন্য মাইকেল

৪. এখানে বন্ধনীর মধ্যে প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে ৩১শে জুলাই পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সিংহভ্রাতৃদ্বয়ের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অভিনয়ে মধুসূদন উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কারণ সে যুগে বাঙালীর নাট্যাভিনয়েও ইংরাজ অধিবাসীরা আমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য অভিনেতব্য বাংলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ সভামধ্যে বিতরিত হইত। 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ মধুসূদনকৃত। মাইকেল দেখিলেন যে, রাজারা একখানি অপদার্থ নাটকাভিনয়ের জন্য জলের মতো অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তখন তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিষয়বস্তু আহরণের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার হইতে কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ আনাইয়া লইলেন। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। শুনা যায়, ইতিপূর্বে তিনি নাকি সামান্য 'পৃথিবী' কথাটারও বানান জানিতেন না। সেই মধুসূদন বাংলা নাটক রচনায় প্রস্তুত হইলেন এবং মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী কাহিনী অবলম্বনে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা নাটকের' কিয়দংশ লিখিয়া ফেলিলেন। ১৮৫৯ সালে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হইল—বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব হইল।

মধুসূদন আমাদের দেশে মহাকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হয় নাট্যকাররূপে। নাটক লিখিয়া তিনি যখন নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, তখন মহাকাব্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নাটক ও প্রহসন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—পৌরাণিক ('শর্মিষ্ঠা'—১৮৫৯, 'পদ্মাবতী'—১৮৬০), ঐতিহাসিক ('কৃষ্ণকুমারী'—১৮৬১) এবং প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা'—১৮৬০, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'—১৮৬০)।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত শর্মিষ্ঠা দেবযানী-যযাতির উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মূল আখ্যানের চরিত্রগুলিকে নাট্যকার উচ্চতর ভাবকল্পনার বাহন করিয়া শর্মিষ্ঠাকে আদর্শ ভারতীয় নারীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অবশ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে দেবযানী অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তব হইয়াছে। কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে তিনি প্রধানতঃ কালিদাসের শকুন্তলা নাটক হইতে আদর্শ এবং বক্তব্যভঙ্গিমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ে এই নাটক আশ্চর্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার সাফল্যে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের উদীয়মান লেখকরূপে পরিচিত হইলেন, এবং আরও নাটক-প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য রীতিকে অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইলে ইহার পর সংস্কৃত রীতিতে রচিত আর কোন নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মধুসূদনের এই প্রথম নাটকটিতে নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাইবে। মাইকেল ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের দিকে কোন দিনই আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এক চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'In the great European Drama you have the

stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment; with us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy land······Ours are dramatic poems······' এখানে তিনি যে জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ত্রুটিগুলি 'শর্মিষ্ঠা' হইতে মুছিয়া যায় নাই। ইহার ঘটনাতে নাটকীয় রস সঞ্চারিত হইতে পারে নাই; গতিবেগ (action) অপেক্ষা বিবৃতিমুখিতা (narration) অধিক। একমাত্র দেবযানী ও শুক্রাচার্য ব্যতীত কোন চরিত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নাই। সর্বোপরি ইহার যাত্রার ধরনের কৃত্রিম অলঙ্কারবহুল ভাষা নাটকীয় রসকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের পুচ্ছগ্রাহিতাই মাইকেলের প্রথম নাটকটির নাট্যগুণকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। বরং তাঁহার 'পদ্মাবতী'র (১৮৬০) আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয়তা অনেক বেশী স্বাভাবিক হইয়াছে।

'পদ্মাবতী' পৌরাণিক নাটক, তবে ভারতীয় পুরাণের কাহিনী নহে। গ্রীক পুরাণের প্রসিদ্ধ 'Apple of Discord' নামক কাহিনীকে তিনি বাংলাদেশের উপযুক্ত করিয়া ভারতীয় পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। গ্রীক পুরাণে আছে, জুনো, ভিনাস ও প্যালাস নাম্নী তিনজন দেবী একটি সোনার আপেল লইয়া কলহ করিতেছিলেন। যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী সে-ই ঐ আপেলটি পাইবার অধিকারিণী। প্যারিসের উপর সেই বিচারের ভার পড়িল। তিনি ভিনাসকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। ভিনাস কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাভের বর দিলেন। পরে প্যারিস হেলেনকে হরণ করেন এবং সেই ব্যাপার লইয়া ট্রয়যুদ্ধ ও ইলিয়াড মহাকাব্যের সূচনা। মাইকেল এখানে শচী (জুনো), মুরজা (প্যালাস), রতি (ভিনাস), ইন্দ্রনীল (প্যারিস) ও পদ্মাবতী (হেলেন) চরিত্র অঙ্কন করিয়া গ্রীক পুরাণের গল্পটিকে যথাসম্ভব কৌশলের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। এই নাটকেও তিনি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছাড়াইতে পারেন নাই; ভাষাতেও সেইরূপ গুরুভার আলঙ্কারিক মুদ্রাদোষ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় 'পদ্মাবতী'র ভাষা ও নাটকীয়তা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি এই নাটকে সর্বপ্রথম কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধে'র ছন্দের প্রথম ইঙ্গিত ইহাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। যখন তিনি এই নাটক রচনা করিতেছিলেন, তখন তাহারই ফাঁকে ফাঁকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসন রচনা করেন।

ইহার পর ১৮৬১ সালে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। ইহার ঘটনা টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত। ইতিহাসের আংশিক কাহিনী লইয়া রচিত বলিয়া ইহাকে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। ইহাতে রাণা ভীমসিংহের কন্যা কুমারী কৃষ্ণার আত্মহত্যা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মরুদেশের মানসিংহ এবং জয়পুরের জগৎসিংহ—দুই রাজা কৃষ্ণার পাণি প্রার্থনা করিলেন, এবং না পাইলে

উদয়পুর ধ্বংস করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। রাণা ভীমসিংহ, কন্যাস্নেহ, না দেশরক্ষা—কোন্‌টি বাছিয়া লইবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণা আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করিলেন। এই দুর্ঘটনায় ভীমসিংহ উন্মাদ হইয়া গেলেন। অতি মর্মন্তুদ গ্রীক নাটক 'ইফিগেনিয়া'[৫] (ইউরিপিদেস প্রণীত) নাটকের সঙ্গে কাহিনীটির সাদৃশ্য আছে। মধুসূদন পুরাণ ছাড়িয়া ইতিহাসে অবতীর্ণ হইলেন; ইহাতে তাঁহার নাট্যশক্তি পরিপক্কতা লাভ করিল। 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর গ্রন্থন (কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী ও বিলাসবতীর কাহিনী), চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ এবং মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতিকে তীব্রতর করিয়া তিনি বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাকে বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বলা যায়। অবশ্য কুমারী কৃষ্ণার আত্মহত্যা ব্যাপারটি করুণরস উদ্রেকে সার্থক হইলেও ট্র্যাজেডির বিয়োগান্ত বেদনার মর্মগূঢ় তীব্রতা ইহাতে ততটা সফল হইতে পারে নাই। ট্র্যাজিক নায়িকার চরিত্রে যে ধরনের দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন কৃষ্ণার অতিকোমল চরিত্রে তাহা ততটা নাই বলিয়া ইহা সার্থক ট্র্যাজেডি হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, মধুসূদন গ্রীক অদৃষ্টতত্ত্বকেই যেন এই নাটকে জয়ী করিয়াছেন। এই সময় হইতে জীবনের গভীরতর বিষাদ-বেদনার দিকটি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার অল্প পরে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ট্র্যাজেডির সেই বিষাদ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করিবার সময় মধুসূদন প্রহসনের অভাব বোধ করিতেছিলেন। পাইকপাড়ার সিংহভ্রাতৃদ্বয়ের অনুরোধে তিনি প্রহসন রচনার সংকল্প করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইখানি প্রহসন রচিত হইল—'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। দুইখানি প্রহসনে সমাজের দুই শ্রেণীকে এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে যে, পরবর্তী কালের সমস্ত প্রহসন মধুসূদনের ছাঁচেই ঢালা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভ্রান্ত দিকটিকে মূঢ়ের মতো অনুকরণ করিয়া 'ইয়ং বেঙ্গল' দল 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় হাস্যকর রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে উপস্থাপিত হইয়াছেন। মধুসূদন ইঁহাদের চরিত্রদুষ্টি, পানাসক্তি এবং ইংরাজী বুলির অজীর্ণ উদ্গার চমৎকার ফুটাইয়াছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যেমন নবীন সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তেমনি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে ভক্তপ্রসাদ নামক এক ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ জমিদারের কুকীর্তি ও লাম্পট্য বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি রঙ্গনাট্য হইলেও ইহাতে ক্ষীণভাবে কাহিনীর ধারাও বহমান এবং কয়েকটি চরিত্র অতিরঞ্জনের ('ক্যারিকেচর') দ্বারা উপহাস বা ব্যঙ্গকৌতুক ছাড়াইয়া চরিত্রের পর্যায়ে উঠিয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যেমন

---

৫. প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদেস (৪৮০—৪০৭ খ্রীঃ পূঃ) প্রণীত 'Iphigenia in Tauris'-এর রাজা আগামেম্নন দেবী আর্টেমিসের রোষ শান্তির জন্য তাঁহার কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিয়াছিলেন। এই কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

কলিকাতার নাগরিক জীবনের অধঃপতন বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে গ্রাম্য বাংলার স্খলন-পতন বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন নিপুণ লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন, সাধারণের জীবন, সংলাপ, আচার-আচরণের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতেন, বিশেষতঃ সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার গভীর পরিচয় ছিল ; পরবর্তী কালে যত প্রহসন রচিত হইয়াছিল, সবই এই দুইখানির প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি দীনবন্ধুর মতো প্রথমশ্রেণীর নাট্যপ্রতিভাধরের 'সধবার একাদশী'তে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। মাইকেলের প্রহসন দুইখানি সে যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলেও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে ইহাদের কোনখানি অভিনীত হইতে পারে নাই। প্রথমখানি অভিনীত হইলে তরুণের দল ক্ষিপ্ত হইত, দ্বিতীয়খানি অভিনীত হইলে প্রবীণের দল রুষ্ট হইত। তাই পাইকপাড়ার সিংহভ্রাতৃদ্বয় দুইখানার কোনটারই অভিনয় করাইতে সাহসী হন নাই। এইজন্য মধুসূদন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "Mind you all broke my wings once about the farce ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese !" অবশ্য বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হইলেও কলিকাতার নানাস্থানে সাফল্যের সঙ্গে প্রহসন দুইখানি অভিনীত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে দেহমনে পীড়াগ্রস্ত হইয়া মধুসূদন দুইখানি নাটকের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মায়াকানন' (১৮৭৪) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে সান্ত্বনাহীন বিষণ্ণতা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যলক্ষণ ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক আর একখানি নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া মধুসূদনের দেহান্ত হয়। তখন মধুসূদনের আয়ুর পরিধিপরিক্রমা শেষ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং মাইকেল-প্রতিভা বিচারে এই দুইখানিকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

সম্প্রতি কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন যে, মাইকেল নাকি বাংলা জানিতেন না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি ও দুইখানি প্রহসনের রচনাকার বাংলা জানিতেন না, একথা বলা যেরূপ, আর শেক্‌স্‌পীয়র-মিল্টন ইংরাজী জানিতেন না বলাও কতকটা সেইরূপ। মধুসূদনের বাংলা ভাষার অধিকার যে কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, তাহা জানিবার জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না, তাঁহার প্রহসন দুইখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের ইংরাজী মিশ্রিত খিচুড়ি বুলি, মুসলমান রায়তের ফার্সী-মিশ্রিত বাংলা, ইতর স্ত্রীলোকের অমার্জিত ভাষা, পূর্ববঙ্গীয় মুটেমজুরের আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ—প্রত্যেকটি ভাষাভঙ্গিমা তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মাইকেলের প্রহসন হইতেই বাগ্‌ধারা ও সংলাপ রচনার দীক্ষা লইয়াছিলেন। যাহা হউক, মধুসূদন বাংলাদেশে সার্থকভাবে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বনে যে নাটক-প্রহসন রচনা করেন, তাহার অভিনয়মূল্য এবং সাহিত্যমূল্য—উভয়ই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) ॥

মধুসূদন প্রহসনে উজ্জ্বল বাস্তবচিত্র অঙ্কন করিলেও নাটকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ ছাড়াইয়া দৈনন্দিন জীবনের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিতে পারেন নাই। কিন্তু দীনবন্ধু প্রহসনের রঙ্গরসকে বাস্তব জীবনের কঠোর পরিবেশ আনয়ন করিয়া প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' রঙ্গরসের কবিতা লিখিতেন। পরে তিনি কিছু কিছু গীতি-কবিতা লিখিলেও কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি নগণ্য। বস্তুতঃ নাট্যকারের প্রতিভা লইয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বস্তুগত চেতনা (objective imagination), মানবজীবন সম্বন্ধে তীক্ষ্ন বোধ এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন রসদৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকিলে নাটক সার্থক হইতে পারে না। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এই গুণগুলি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দীনবন্ধু কিয়দংশে এই গুণগুলির অধিকারী ছিলেন। তিনি ডাকবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। মফঃস্বলের ডাকঘর ও ডাকবিভাগ পরিদর্শনের জন্য তাঁহাকে বাংলা ও বাংলার বাহিরে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন সম্বন্ধে নিপুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা এবং জগতের প্রতি নিঃস্পৃহ প্রসন্নতা তাঁহাকে নাট্যরচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর প্রথম আবির্ভাব হয় 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক লইয়া। তিনি সরকারী কর্ম করিতেন বলিয়া এই নাটকে নিজ নাম মুদ্রিত করিতে সাহসী হন নাই। "কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্"—লেখকের এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বহুবার ইহার অভিনয় হইয়াছিল। এমন কি বাংলার বাহিরেও ইহার অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তখন বাংলাদেশে নীলকর আন্দোলন চলিতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। পল্লীগ্রামের দারোগা এবং শহরের উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীদের হাত করিয়া নীলকর সাহেবেরা দরিদ্র রায়ত এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সমূলে নষ্ট করিত, জমিজমা বলপূর্বক দখল করিত, অথবা, কৃষকদিগকে ধানজমিতে নীল বুনিতে বাধ্য করিত এবং তাহার জন্য যৎসামান্য দাদন (অগ্রিম) দিয়া তাহাদের রুজি-রোজগারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিত। এই অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং যশোহরের সাধারণ প্রজা এবং সম্পন্ন গৃহস্থ—সকলেই নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল এবং সেই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে দেশের শিক্ষিত সমাজকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ঠিক সেই সময়ে সত্য ঘটনা কেন্দ্র করিয়া নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের মর্মন্তুদ বর্ণনাসহ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত

হইল। শুনা যায় বাঙালীপ্রেমিক রেভাঃ লঙ সাহেব মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা* ইহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়াছিলেন—*Nil Durpun or The Indigo planting Mirror* (1861); এই অপরাধে লঙ সাহেবের কারাবাস ও জরিমানা হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গ্রন্থে অনুবাদকের নাম ছিল না বলিয়া মধুসূদন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। অনুবাদটি বিলাতে প্রেরিত হইল, সেখানেও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। ক্রমে ইন্ডিগো কমিশন বসিল; আইনের সাহায্যে এই সমস্ত অত্যাচার হ্রাস পাইল। 'নীলদর্পণে'র দ্বারা এই মহৎ ব্যাপারটি সমাধা হইয়াছিল। বস্তুতঃ বাংলাদেশে প্রথম ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলন নীলকর বিরোধিতা হইতেই শুরু হইল, এবং 'নীলদর্পণ' তাহাতে উৎসাহ যোগাইয়াছিল। এইজন্য বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসে ইহার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। আমেরিকার মহিলা-ঔপন্যাসিক শ্রীমতী স্টো নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গের নির্মম অত্যাচার বর্ণনা করিয়া ১৮৫২ সালে *Uncle Tom's Cabin* লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমেরিকায় নিগ্রোদলনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে নিগ্রোদাসত্ব লোপ পাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ'কে বাংলার *Uncle Tom's Cabin* বলিয়াছেন। কথাটা অতিশয় যুক্তিসংগত। বাংলায় নীলকর-অত্যাচার 'নীলদর্পণে'র দ্বারা প্রশমিত হইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের কোপে পড়িয়া কীভাবে গোলোক বসুর সম্পূর্ণ পরিবার এবং সাধুচরণ নামক এক রায়তের বংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল, সেই শোকাবহ নির্মম চিত্র এই নাটকে আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালীন পল্লীবাংলার এরূপ প্রাণপূর্ণ চিত্র, সুখদুঃখ, ব্যথা-ব্যর্থতা, অত্যাচার-পীড়নের এমন নাটক তাহার পূর্বে রচিত হয় নাই, পরেও রচিত হয় নাই। এই দুঃসহ বিয়োগান্ত নাটক যেন জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যরূপে নাটমঞ্চে উপস্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য-অভিনয়ের দিক হইতে অসাধারণ প্রতিপত্তি অর্জন করিলেও নাটক হিসাবে ইহা নানা ত্রুটিযুক্ত। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা, খুন-জখম, আত্মহত্যা, নারী-নির্যাতন প্রভৃতি উৎকট ব্যাপারের বাড়াবাড়ি ইহার ট্র্যাজেডিকে কোথাও গভীর স্তরে লইয়া যাইতে পারে নাই। স্প্যানিশ ট্র্যাজেডিতে যেমন খুন-জখমের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি থাকে, ইহাতেও সেইরূপ রক্তোৎসবের তান্ডব নৃত্য নাটকীয় রসকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। নাট্যকার সাধারণ মানুষের চরিত্র, ভাষা ও আচরণের যেরূপে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, উচ্চশ্রেণীর চরিত্রে সেরূপ কোন কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভদ্রচরিত্রগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম এবং ব্যর্থ। 'নীলদর্পণ' নাটক নাটকহিসাবে সার্থক হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলার নাটকের ইতিহাসে এবং সমাজ-আন্দোলনে ইহার প্রভাব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

* ইদানীং কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই অনুবাদ মধুসূদনের নহে। কারণ ইহাতে এত ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে যে, ইহা মধুসূদনের অনুবাদ হইতে পারে না। এই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হয় নাই।

একথা অবশ্য সত্য যে, দীনবন্ধুর প্রতিভা মূলতঃ প্রহসনকারের প্রতিভা ; গভীর-গম্ভীর নাটকে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' ছাড়া তিনি আর কোন গম্ভীর ধরনের নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার দুইখানি রোমান্টিক নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) এবং 'কমলে-কামিনী'র (১৮৭৩) আখ্যান-নির্বাচন সুকৌশলী বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহাতে যে অংশে নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম বর্ণিত হইয়াছে, সেই অংশগুলি প্রাণহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ; বরং পার্শ্বচরিত্রগুলি পরিহাস ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়া দর্শকের অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়াছে। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধরচরিত্র শেক্‌স্‌পীয়রের ফলস্টাফকে স্মরণ করাইয়া দিলেও তাহা নিছক অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না। দীনবন্ধু রোমান্টিক আখ্যান ও ঘটনাসংস্থান বর্ণনায় কোন দিনই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। হয়তো বাস্তব জীবনের উজ্জ্বল চিত্রপটখানার আলো-আঁধারের লীলা তাঁহাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে. তিনি তাহার অন্তরালবর্তী রোমান্সের স্বপ্নপুরে প্রয়াণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

'নীলদর্পণে'র পরেই তাঁহার খ্যাতি নির্ভর করিতেছে কয়েকখানি প্রহসনের উপর। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে এক বৃদ্ধের বিবাহের বিড়ম্বনা হাস্যকর অসঙ্গতির মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'জামাই বারিকে' (১৮৭২) ধনিসমাজের ঘরজামাই পোষার প্রথাকে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়া নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। শুনা যায়, কলিকাতার কোন ধনাঢ্য পরিবার এই প্রহসনের লক্ষ্যস্থল। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'র ঘটনা নামমাত্র, কিন্তু 'জামাই বারিকে' জামাতাদের মর্কটলীলার পাশেই দুইটি উপকাহিনীর ধারা বহমান। একটি—দুই সতীনের জ্বালায় বিড়ম্বিত পদ্মলোচনের সকরুণ জীবন, আর একটি—ঘরজামাই অভয়ের লাঞ্ছিত জীবন। বাংলা সাহিত্যে বগী ও বিন্দী—দুই সতীনের কোন্দল প্রায় ক্লাসিক রসিকতার পর্যায়ে পেঁছাইয়াছে।

দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কলিকাতা ও ও শহরতলীর বাস্তবচিত্র ও হাস্যপরিহাসমুখর বিচিত্র বর্ণনা আছে। ইহাতেও একটা জটিল কাহিনী ও রোমান্টিক প্রণয়চিত্র (ললিত ও লীলাবতীর কাহিনী) আছে। কিন্তু কাহিনীটিকে অনাবশ্যক জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে, এবং রোমান্টিক প্রণয়দৃশ্যগুলি হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। রোমান্টিক দৃশ্য বা প্রেমের ঘটনা বর্ণনায় দীনবন্ধু কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কেবল বাস্তবচিত্রগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ললিত ও লীলাবতীকে ভুলিয়া যাওয়া সহজ, কিন্তু নদের চাঁদ ও হেমচাঁদের রঙ্গকৌতুক চিরদিন মনে থাকিবে।

'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) দীনবন্ধুকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহা প্রহসন হইলেও মূলতঃ নাট্যধর্মী। তৎকালীন কলিকাতার উচ্চশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, বারাঙ্গনাসেবা, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি লাম্পট্যই ইহার প্রধান কাহিনী। প্রহসনখানি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে পরিকল্পিত

হইয়াছিল। কিন্তু মাইকেলের রচনাটি একেবারেই প্রহসন, কাহিনীর সূত্র অত্যন্ত শিথিল—চরিত্রবিকাশও ইহার উদ্দেশ্য নহে। অপরদিকে 'সধবার একাদশী'তে তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজের ব্যঙ্গচিত্র থাকিলেও ইহা কেবলমাত্র প্রহসন নহে; ইহাতে নাটকের মতো কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে। মূল চরিত্রে নিমচাঁদ দত্তের সুখদুঃখ, মাতলামির ঝোঁকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ ইত্যাদি অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। নিমে দত্ত উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হইয়াও সংযমের অভাবে মদ্যের স্রোতে দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার সেই হতাশা ও পরাভূত মনোবেদনার আত্মগ্লানি হাস্যপরিহাসমুখর ভাষা ও আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার পরিহাস, বাকচাতুরী, ব্যঙ্গ—সমস্তই একটা ছদ্মবেশ। সে যেন জীবনের অনতিক্রমণীয় পরাজয়কে অট্টহাস্যে ঢাকা দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মুখের হাসিতে চোখের জল ঢাকা পড়ে নাই; মাঝে মাঝে তাহার উতরোল হাস্যের পশ্চাতে অশ্রুনিরুদ্ধ ভগ্নস্বর ক্ষীণসুরে বাজিতে থাকে। 'সধবার একাদশী' বাংলা নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত; প্রহসন ও নাটক একসূত্রে মিলিত হইয়া ইহা দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভাকে এক নূতন পথে প্রেরণ করিয়াছে। দীনবন্ধু মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তিনি আর একটু দীর্ঘজীবী হইয়া আরও পরিণত নাটক রচনা করিতে পারিলে বাংলা নাটক যে-কোন দেশের প্রথমশ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারিত।

কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকার ॥

বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে কয়েকজন স্বল্পপ্রতিভাবিশিষ্ট নাট্যকার কিছুকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ॥ ঈশ্বর গুপ্তের ভক্তশিষ্য মনোমোহন নাটক রচনায় যেন ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। মনেপ্রাণে পুরাতন যাত্রাভিনয়ের রীতি গ্রহণ তাঁহার নাটক রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি পুরাপুরি পুরাতন লোকাভিনয় ও অপেরার (অর্থাৎ নৃত্যগীতি প্রধান নাটক) আদর্শে কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'সতী' (১৮৭৩) ও 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) একদা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। সুলভ করুণরস, উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস এবং অল্পস্বল্প হাস্যরসের সাহায্যে দেবদেবীর চরিত্রকে একেবারে বাঙালী ঘরের মানুষ করিয়া তোলার কৃতিত্ব তিনি দাবী করিতে পারেন। বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের পূর্বে তাঁহার 'সতী' নাটক দর্শকের পৌরাণিক ভক্তিরসপ্রধান নাটকের ক্ষুধা মিটাইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন দিনই যাত্রাভিনয়ের আদর্শ ছাড়াইয়া উচ্চতর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার 'প্রণয়-পরীক্ষা' (১৮৬৯) এবং 'আনন্দময়' (১৮৯০) নামক সামাজিক

ও গার্হস্থ্য নাটকগুলিরও কোন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালার শেষ উত্তরাধিকারী মনোমোহন লোকখ্যাতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)॥ কৈশোরকাল হইতে নাট্যাভিনয়ের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য দেখা যায়। যৌবনকালে তিনি জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া একটা বড় প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য অনুবাদগুলি আদৌ সুখপাঠ্য হয় নাই, অভিনয়ের দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে নাই। কিছু রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রহসন রচনা করিয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং সৌখীন অভিনেতৃসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে রাণা ভীমসিংহের উক্তিতে দেশপ্রেমের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিলেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি ইতিহাস ও নাটক কোনটারই যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিক চেতনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক আদর্শের মধ্যে বর্ধিত হইয়া এবং নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত 'হিন্দুমেলা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিক চেতনাকে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে 'পুরুবিক্রম', ১৮৭৫ সালে 'সরোজিনী', ১৮৭৯ সালে 'অশ্রুমতী' এবং ১৮৮২ সালে 'স্বপ্নময়ী' নামক ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক নাটকগুলি রচিত হইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হইলেন। 'পুরুবিক্রমে' আলেকজাণ্ডার ও পুরুর সংঘর্ষের পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান অনুসৃত হইয়াছে, এবং তাহাই প্রাধান্য পাইয়াছে। 'সরোজিনী' নাটক আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায়, 'অশ্রুমতী'র কাহিনী প্রতাপসিংহ ও মানসিংহের বিরোধের পটভূমিকায় এবং 'স্বপ্নময়ী' নাটক বাংলাদেশে শোভাসিং-এর উত্থানের পরিবেশে রচিত হইয়াছে। এই নাটকগুলিতে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ বহমান, কিন্তু ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাস, স্বাদেশিকতা ও নাটক—কোনটারই মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিনাটকীয়তার ফুৎকারে ইতিহাস ও নাট্যধর্ম শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয়যোগ্য কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়া সে যুগের সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়কে সহায়তা করিয়াছিলেন। ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের প্রহসন অবলম্বনে 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯) এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭), 'হিতে বিপরীত' (১৮৮৬) ইত্যাদি প্রহসনগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাতে যেমন উতরোল অট্টহাস্য নাই, তেমনি ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষজ্বালাও নাই। জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথ আর একটু সংযত হইয়া ইতিহাস ও নাটকের যথার্থ সম্পর্ক বুঝিতে পারিলে একজন শক্তিশালী নাট্যকার হইতে পারিতেন।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)॥ মনোমোহন বসুর প্রায় সমকালেই রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবে প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। গদ্যে ও পদ্যে এত অজস্র রচনায় বোধ হয় সে যুগে আর কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি ফারসী বিষয় লইয়া নাটিকা (লয়লামজনু—১২৯৮, বেনজীর বদরেমুনির—১৩০০) রচনা করিলেও প্রধানতঃ পৌরাণিক নাটকের উপর তাঁহার খ্যাতি নির্ভর করিতেছে। একদা তিনি দক্ষতার সঙ্গে 'বীণা' নামক সাধারণ রঙ্গালয় পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী অবলম্বনে 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে 'অনলে বিজলী', 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১৮৮৪) প্রভৃতি একদা নানাস্থানে অভিনীত হইত। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, এই সমস্ত নাটক কোন দিক দিয়াই বিশেষ কোন নাটকীয় আদর্শ স্থাপন করিতে পারে নাই। রাজকৃষ্ণ যাত্রাদলের অধিকারীর প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পৌরাণিক নাটক অতিনাটকীয় যাত্রার প্রভাব ছাড়াইয়া অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই। বরং তাঁহার অন্যান্য গদ্য-পদ্য রচনা নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ কবিতার পংক্তিবিন্যাস সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বলিতে কি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম গদ্য কবিতার ("পদ্যপংক্তি গদ্য") রীতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। সে যুগে একশ্রেণীর ভক্তিরসাতুর আবেগপ্রবণ বাঙালী দর্শক তাঁহার নাটকাভিনয় দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র প্রভাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের মধ্যম শ্রেণীর নাটক পরবর্তী কালে জনপ্রিয়তা রক্ষা করিতে পারে নাই।

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২)॥ উপেন্দ্রনাথ* এমন একযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন যখন বাংলাদেশে স্বাদেশিক আন্দোলন, ইংরাজবিদ্বেষ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঙালীর মনে উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ তাঁহার দুইখানি নাটকে ('শরৎ-সরোজিনী'—১৮৭৪, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'—১৮৭৫) লোমহর্ষক ঘটনা, বন্দুক-পিস্তল ছোড়াছুড়ি, ডাকাতি, খুন-জখম, গোরাপ্রহার, সাহেব শায়েস্তার জন্য নায়ক—বিশেষতঃ নায়িকার পিস্তল হইতে যথেচ্ছা গুলি বর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার সাহায্যে রোমাঞ্চকর অতি-নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সংঘর্ষময় ও আক্রমণধর্মী দেশ-প্রেমের মোটা সুর আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই সমস্ত অপদার্থ 'মেলোড্রামা' একদা বাংলার রঙ্গমঞ্চ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আরও একটি কারণে

* ইনি এক বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইঁহার শোকাবহ পরিণামের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্মচরিত' (১৯১৮) দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি তাঁহার নাটকীয় জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একখানি মধ্যম শ্রেণীর নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছে।

স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইহাতে একটি দৃশ্যে আছে, হুগলির একজন লম্পট শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট এক বাঙালী রমণীর অমর্যাদা করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দৃশ্যে ইংরাজবিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন সরকারের টনক নড়িল। তাঁহারা অশ্লীল দৃশ্য অভিনয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতৃসম্প্রদায়কে গ্রেফ্‌তার করিয়া বিচারার্থে চালান দেন। অবশ্য পরে সকলেই মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর সরকার দেশীয় রঙ্গমঞ্চকে শায়েস্তা করিবার জন্য ১৮৭৬ সালে "Dramatic Performance Act" পাস করাইয়া কঠোরহস্তে অভিনয় ও নাটকমঞ্চ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বলিয়া 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের নামটি বাংলা-সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকিবে। উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাত যাত্রাও করিয়াছিলেন। তাহাতেও যে তাঁহার রুচি ও রচনাশক্তি পরিমার্জিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না; অন্তত 'দাদা ও আমি' (১৮৮৮) প্রহসনধর্মী নাটক পাঠে তাহাই মনে হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) ॥

বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অভিনেতা, নটগুরু, নাট্যপরিচালক, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পরিপোষ্টা এবং অভিনয়-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাটককে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে রক্ষা করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যকে যৌবনের বলিষ্ঠতা এবং পরিণতি দান করিয়াছেন। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন; অভিনয়-কলাতে তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার ছিল। তৎকালীন অনেক বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অভিনয়কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে যুগে বিলাত হইতে বিখ্যাত অভিনেতৃ-সঙ্ঘ কলিকাতায় আসিত এবং শেকস্‌পীয়র ও অন্যান্য নাট্যকারের নাটক অভিনয় করিত। গিরিশচন্দ্র নিয়মিত ইংরাজী অভিনয় দেখিতেন এবং তাঁহার অনুচর অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এই অভিনয়কলা দেখাইয়া অভিনয়ের উৎকর্ষ শিক্ষা দিতেন। সে যুগের অভিনেত্রীরা অধিকাংশই সমাজের হীনশ্রেণী হইতে আসিতেন; অনেকের অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতাও ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই সমস্ত অশিক্ষিত স্ত্রীলোককে যেন 'পাখী পড়াইয়া' অভিনয় শিক্ষা দিতেন। শুধু তাঁহার শিক্ষাগুণেই এই সমস্ত সামান্য রমণীও পরবর্তী কালে বিখ্যাত অভিনেত্রী হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রধান গৌরব—'ন্যাশনাল থিয়েটারের' গৌরব বর্ধন। ইতিপূর্বে ধনী জমিদার বা দু'একটি সৌখীন সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশি ও বদান্যতার উপর অভিনয় নির্ভর করিত। অনেক সময়েই জনসাধারণ এই সমস্ত অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাইত না। গিরিশচন্দ্রের কয়েকজন সহকর্মী ও অভিনেতার সাহায্যে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল; এখানে নিয়মিত টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল।* পরে ইহার দেখাদেখি কলিকাতার আরও কয়েকটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ও বেতনভুক অভিনেতৃসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। এই সমস্ত ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র

* কোন কারণে মতভেদ হওয়াতে গিরিশচন্দ্র প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন, পরে গোলমাল মিটিয়া গেলে পুরাতন সহকর্মীদের সঙ্গে যোগদান করেন।

বিপুল পরিশ্রম করিয়া অসাধ্য সাধন করেন। পরবর্তী কালে ন্যাশনাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেন এবং নাট্যাভিনয়কে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান-রূপে গঠন করেন। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে আজ বাংলা নাটক ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যে ঐশ্বর্য দেখা যাইতেছে, হয়তো তাহার এতটা শ্রীবৃদ্ধি হইত না। তাই নাট্যামোদী বাঙালী মাত্রেই গিরিশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিকে শ্রদ্ধা করেন এবং অভিনেতারাও তাঁহাকে 'নটগুরু' বলিয়া প্রণাম করেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সুদক্ষ অভিনেতারূপে যে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন ইদানীং বিখ্যাত নটের ভাগ্যেও ততটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি বর্ষিত হয় না। ইতিমধ্যে যে সমস্ত নাটক লিখিত হইয়াছিল, তাহার অভিনয় শেষ হইয়া গেল; মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক পুরাতন হইয়া গেল। অতঃপর অভিনয়যোগ্য নাটক না পাইয়া গিরিশ বিখ্যাত কাব্য ও উপন্যাস্যের ('মেঘনাদবধ কাব্য', 'পলাশীর যুদ্ধ', বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাস) নাট্যরূপ দিয়া দর্শকের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কুলাইল না। বাধ্য হইয়া পরিচালক ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রকে পুরাপুরি নাট্যকার হইয়া নাটক রচনা করিতে হইল। এবিষয়েও তিনি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং বিখ্যাত নাট্যকারের প্রতিভা বিদেশী অভিনেতাদের মধ্যেও দুর্লভ। ইংলন্ডের ডেভিড গ্যারিক (১৭১৭-৭৯) শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করিয়া এবং লন্ডনের 'ড্রুয়ুরী লেন থিয়েটার' পরিচালনা করিয়া য়ুরোপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি দুই-একখানি প্রহসন ব্যতীত কোন নাটক লিখিয়া যান নাই। শেক্‌স্‌পীয়র নিজে নাটক অভিনয় করিলেও একজন বিখ্যাত সুনিপুণ অভিনেতা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব বাস্তবিক বিস্ময়কর।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশ; প্রহসন বা 'পঞ্চরং রূপক,' গীতিনাট্য, অপেরা প্রভৃতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। এত কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি কিরূপে শতসংখ্যক নাটক-নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। কোন-এক সমালোচক বলিয়াছেন যে, অর্ধশত নাটকের স্থানে গিরিশচন্দ্র পাঁচখানি নাটক লিখিলেই চলিত। তাঁহার এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া তাঁহাকে প্রায় রাতারাতি নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। তিনি যত বড় প্রতিভাধর হউন না কেন, প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত কোন রচনাই শিল্পসমুৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক তাঁহার প্রায় একশত নাটক-নাটিকার মধ্যে অল্পই কালের কষ্টিপাথরে উৎরাইবে। আমাদের দেশ অতিশয় ভাবপ্রবণ, তাই গিরিশ-ভক্তগণ কখনও তাঁহাকে গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করেন, কখনও শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে এক-

পংক্তিতে বসাইয়া দেন, কখনও বা তাহাতেও খুশি না হইয়া তাঁহাকে শেক্‌স্‌পীয়রের মাথার উপরে স্থাপন করেন। একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভাবালুকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ডে যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের আদর হইয়াছিল—তেমনি একদিন আসিবে—যেদিন এদেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাঁহাকে আদর করিবে, তাঁহার গুণকীর্তনে গর্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার গান, তাঁহার নাটক যাচাই করিবার জন্য সাগর পাড়ি দিতে হইবে না; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজানু হইয়া শিখিয়া যাইবে—গিরিশ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য।" এ সব উচ্ছ্বাস অতিভক্তির ভাবাবেগরুদ্ধ স্তুতিবাদ। ইহা আর যাহাই হউক, সাহিত্যবিচার নহে।

গিরিশচন্দ্র প্রথম দিকে গীতিনাট্য লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন ('আগমনী'—১৮৭৭, 'অকালবোধন'—১৮৭৭, 'দোললীলা', 'মোহিনী-প্রতিমা' ইত্যাদি)। কিন্তু এই গীতিনাট্যগুলি দর্শকের মনোরঞ্জন করিলেও সাহিত্য-গুণবর্জিত বলিয়া পরবর্তী যুগে বড় একটা অভিনীত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ পৌরাণিক নাট্যকাররূপেই সমগ্র বাংলাদেশে অদ্ভুত গৌরব লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মনোমোহন বসু যাত্রার ঢঙে কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া বাঙালী দর্শকের ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শটি নিজ ভাবনাচিন্তার অনুকূল করিয়া প্রধানতঃ বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে আখ্যান গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি মঞ্চ-সফল পৌরাণিক নাটক রচনা করিলেন। তাঁহার 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮১), 'জনা' (১৮৯৪) এবং 'পাণ্ডব-গৌরব' (১৯০০) একদা এদেশে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। ভক্তি, করুণরস, অদৃষ্টবাদ, মহৎ চরিত্রাদর্শ, নীতিধর্মের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি পৌরাণিক ও শ্রেষ্ঠ মানব-ধর্মগুলিকে তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়া আশ্রিতরক্ষণনীতি অনুযায়ী পাণ্ডবগণ তাঁহাদের একমাত্র সহায় কৃষ্ণের বিরোধিতা করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই ('পাণ্ডব-গৌরব')। জনা পুত্রের ক্ষত্রিয়-বীরগর্ব রক্ষার জন্য প্রবীরকে নর-নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহ দিয়াছেন ('জনা')। এই সমস্ত অতি উচ্চস্তরের আদর্শ একদা বাংলার রঙ্গমঞ্চকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের দিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি বাঙালীর আস্থা আবার ফিরিয়া আসিতেছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' দল, রামমোহনপন্থী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খানিকটা খর্ব হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধাভক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে তাহারই সূচনা। এই 'Hindu Revival'-এর (হিন্দুধর্মের পুনর্জাগৃতি) যুগে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার 'জনা' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জনা বীরের জননী, এই গৌরব তাঁহাকে

বীর মাতায় পরিণত করিয়াছে। নাট্যকার কিছু নাটকীয় অতিরেক সত্ত্বেও জনাকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিখ্যাত চরিত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। সে যুগে যে অভিনেত্রী এই চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন, তিনি সর্বজন-প্রীতি লাভ করিতেন। প্রাচীন বাংলার কথকঠাকুরেরা কথকতার দ্বারা যাহা করিতেন, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। কথকগণ শুধু কথকতার দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পৌরাণিক আখ্যান, চরিত্র ও নীতি-উপদেশের উচ্চ আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিতেন। গিরিশচন্দ্রও পৌরাণিক নাটকের দ্বারা জনচিত্তে ভারতীয় জীবন ও সাধনার নীতিগুলিকে সুকৌশলে প্রচার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার উপরে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, গিরিশচন্দ্র সুলভ ভাবালুতা, ভক্তিবাদ, করুণরস, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়—এই সমস্ত মোটা মোটা নীতি ও আদর্শের প্রাধান্য দিতে গিয়া পৌরাণিক নাটকগুলির সাহিত্যগুণ অনেকাংশে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। দর্শকের দিকে সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি খানিকটা ব্যাহত হইবেই। গিরিশচন্দ্র প্রকৃতিদত্ত নাট্যপ্রতিভা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর দর্শক সমাজের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া সে যুগে তিনি অভিনন্দিত হইলেও এখন তাঁহার সেই সমস্ত নাটক জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত যুগের মনের কথাকে নাটকে গাঁথিয়া দিবার মতো শেক্সপীয়রসুলভ অলোকসামান্য নাট্যপ্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না, এই সত্য কথাটা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার ভক্তিরসের নাটকগুলিও ('চৈতন্যলীলা'—১৮৮৪, 'বিল্বমঙ্গল'—১৮৮৮) তরল ভক্তিরসের অবারিত প্রাচুর্যে সে যুগের নাটমঞ্চ প্লাবিত করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই প্রভাব তাঁহার এই যুগের প্রায় সমস্ত নাটকেই লক্ষ্য করা যাইবে। এই আবেগোন্মত্ত নাটকগুলি যাত্রার ঢঙে রচিত হইলেও ইহাতে নাট্যকারের অকপট হৃদয়ের পবিত্র আনন্দবেদনার কথাটি এমন স্নিগ্ধতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, নাটক হিসাবে ইহাদের মূল্য যেরূপ হউক না কেন, সেযুগের বাঙালী-মানস বুঝিতে হইলে এই সমস্ত পৌরাণিক ও ভক্তিভাবের নাটকের সাহায্য লইতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের উত্তাপে পৌরাণিক নাটক লইয়া তিনি আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। দেশপ্রেমমূলক কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক তাঁহার এই সময়ের সৃষ্টি (সিরাজদ্দৌল্লা'—১৯০৬, 'মীরকাশিম'—১৯০৪, 'ছত্রপতি শিবাজী'—১৯০৭)। 'অশোক' (১৩১১), 'সৎনামে' (১৯০৬) যৎসামান্য ঐতিহাসিক উপাদান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি ঐতিহাসিক নাটক নহে। যথার্থতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাই তাঁহাকে দেশপ্রেমমূলক তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক

রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শুনা যায় তিনি নাকি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। অথচ দেখা যাইতেছে, তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গ্রন্থ হইতেই 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিমের' আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্য কোনো উৎসের অনুসন্ধান করেন নাই। অহেতুক স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থানকালপাত্রের কালানৌচিত্য দোষ (anachronism), নাটকীয় বাস্তব ঘটনাকে মেলোড্রামাটিক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সীমাকে অবহেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার অনুচিত ঝোঁক গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছে। সুলভ উচ্ছ্বাস, অতিনাটকীয়তা, অনৈসর্গিকতা ইত্যাদি মারাত্মক ত্রুটি না থাকিলে এবং ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ সংযত হইলে তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' সার্থক ঐতিহাসিক নাটকে পরিণত হইতে পারিত। তিনি যুগের দাবি মিটাইতে গিয়া ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্য সাহিত্যের দাবি মিটাইতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন, ঐ অঞ্চলের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কদাচার, ভাঙনদশা, অধঃপতন প্রায়ই তাঁহার চোখে পড়িত। বোধহয় স্থানীয় সমাজ ও পরিবার-জীবনের নানা মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক মন সাড়া দিয়াছিল। তদানীন্তন সমাজ ও পরিবারের সমস্যাসঙ্কুল উৎপীড়িত রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তিনি 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (বাংলা ১৩১৫), 'মায়াবসান' (১৮৯৮) প্রভৃতি গার্হস্থ্যধর্মী সামাজিক নাটক রচনা করেন। এই নাটকে পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারী কন্যার বিবাহসমস্যা, বৈধব্যসমস্যা, লাম্পট্য, মাতলামি, জালজুয়াচুরি, মামলামোকদ্দমা ইত্যাদি কলিকাতার দৈনিক জীবনের হুবহু চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থনৈতিক কারণেই বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র সেই মর্মন্তুদ ভাঙনের ইতিহাস অনেকগুলি নাটকে খুলিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে তিনি অধিকাংশ স্থলে বিশেষ কোন উৎকট সমাজ-সমস্যার তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই এবং উক্ত করুণ-রসাত্মক নাটকগুলির পশ্চাতে ক্রিয়াবান কোন শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য সমাজ-শক্তির অমোঘ তাড়নাও নাই। কয়েকজন দুর্বৃত্ত লম্পট ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভালমানুষের চরিত্রের দু'একটা ছিদ্রপথ দিয়া কীভাবে প্রবেশ করে, মূলতঃ সমস্ত কাহিনী প্রায় এই জাতীয়। তন্মধ্যে 'প্রফুল্ল' নাটক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সে যুগে তো বটেই, এখনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও সৌখীন অভিনয়ে এই নাটকের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যাইবে। দোষে-গুণে ইহা গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যোগেশের সামান্য চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে কেমন করিয়া তাহার 'সাজানো বাগান শুকাইয়া' গেল, সেই মর্মন্তুদ ঘটনা এই পারিবারিক নাটকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তদানীন্তন আর কোন

নাটকেই এরূপ মর্মস্পর্শী করুণরস এমন নিপুণভাবে পরিবেশিত হয় নাই। তবে নাট্যকলা, কাহিনী ও চরিত্র বিচার করিলে ইহাকে ততটা প্রশংসনীয় মনে হইবে না। বিশেষতঃ ইহাকে কোনক্রমেই ট্র্যাজেডি বলা যায় না। অতিনাটকীয়তা, খুন-জখম, মাতলামি প্রভৃতি ব্যাপারের এরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, ইহার নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হয়তো দর্শকের মনে ইহা করুণরস উদ্রেকে খানিকটা সাহায্য করে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সান্ত্বনাহীন ভয়াবহ পরিণতি এবং বিরাট গাম্ভীর্য গিরিশচন্দ্র কোনদিন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং 'প্রফুল্ল' ট্র্যাজেডি হিসাবে আদৌ সার্থক হইতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র কতগুলি রঙ্গব্যঙ্গমুখর নাটিকা ('সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পান্ডা', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা') রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি নাট্যকারের অক্ষমতার জন্যই হাস্য উদ্রেক করে ; ইহার ঘটনা বিরক্তিকর এবং সংলাপ নীচ পল্লী হইতে আমদানি করা হইয়াছে। এই সমস্ত নাটিকা বা 'পঞ্চরং' পাঠেই ঘৃণা জন্মে ; সে যুগের দর্শকগণ যে কি করিয়া ধৈর্য ধরিয়া নাটমঞ্চে এই সমস্ত কুপথ্য হজম করিত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তবে তাঁহার 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বাংলাদেশে এপর্যন্ত একজনও প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারের আবির্ভাব হয় নাই, একখানিও প্রথমশ্রেণীর নাটক রচিত হয় নাই—একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক অভিনয়ে উৎরাইলেও নাটক হিসাবে বিশেষ গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, গিরিশ ঘোষের নাটকে নানা ত্রুটি থাকিলেও তাঁহার রচনায় যে একনিষ্ঠ সরলতা (honesty) লক্ষ্য করা যায়, তাহা প্রশংসার যোগ্য। বাস্তবিক গিরিশচন্দ্রের রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার ঠাঁই ছিল না। সেই দিক দিয়া তাঁহার নাটকগুলি প্রশংসা দাবি করিতে পারে। কিন্তু ইহাই কি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের একমাত্র গৌরব? শুধু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকিলেই চলিবে না, রচনা-কৌশল ও উচ্চতর সাহিত্যবোধ না থাকিলে নাটক কখনও কালের কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল হইয়া থাকিতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সাহিত্যগুণ ও রচনাকৌশল উচ্চশ্রেণীর নহে। সে যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটক ও নাটমঞ্চ গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে যুগের বাঙালী দর্শকের রুচি তৈয়ারী করিয়াছেন—এইজন্য তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) ॥

গিরিশচন্দ্রের সহযোগী নট, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক অমৃতলাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুদক্ষ অভিনেতা এবং রঙ্গনাট্য-রচয়িতারূপে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় প্রতিভা লইয়া অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়াছিলেন এবং বন্ধু ও গুরুসদৃশ

গিরিশচন্দ্রের নিকট অভিনয় ও নাটক সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনিও গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিনয়ের অবকাশে অনেকগুলি গভীর রসের নাটক, রোমাণ্টিক নাটক, হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ প্রহসন এবং গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা পুরাপুরি প্রহসন ও রঙ্গনাট্যের প্রতিভা; গম্ভীর নাট্যরচনা তাঁহার পক্ষে 'পরধর্মে'র মতো ভয়াবহ হইয়াছিল। 'হীরকচূর্ণ' বা 'গায়কোয়াড়' নাটক (১৮৭৫), 'তরুবালা' (১৮৯১), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৯৯) এবং 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) প্রভৃতি গম্ভীর রসের নাটক কোন দিক দিয়াই বিশেষ সার্থক হইতে পারে নাই। তন্মধ্যে 'যাজ্ঞসেনী' নামক পৌরাণিক নাটক আমাদের নিকট এখন অসহ্য বোধ হয়। ১৯২৮ সালেও যিনি এইরূপ বিরক্তিকর অপদার্থ পৌরাণিক ভাঁড়ামির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও রুচিবোধের প্রতি সন্দেহ জন্মে। কিন্তু তাঁহার 'নবযৌবন' (১৯১৪) একখানি উৎকৃষ্ট রোমাণ্টিক কমেডি। বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে সুরুচিসঙ্গত স্বাভাবিক কমেডির একান্ত অভাব। সে দিক দিয়া নাটকটি অতীব প্রশংসনীয়, স্নিগ্ধ এবং নির্মল হাস্যরসে আকণ্ঠমগ্ন। দুঃখের বিষয় এত গুণপণা সত্ত্বেও এই নাটকটি পরবর্তী কালে বিশেষ অভিনীত হয় নাই।

অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজাবাহাদুর' (১২৯৮), 'খাসদখল' (১৯১২)—এগুলিও হাস্যোদ্দীপক সামাজিক কমেডি। 'খাসদখল' ও 'রাজাবাহাদুর' এক যুগে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।* অবশ্য এ যুগে ইহার কোন কোন অংশ আপত্তিকর মনে হইতে পারে।

অমৃতলাল সামাজিক অনাচার ও ব্যাধির বিরুদ্ধে বিদ্রূপের চাবুক হাতে লইয়া প্রহসনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ, বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গী সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, স্ত্রীস্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটির ভোটরঙ্গ ইত্যাদি নানা রঙ্গরসের ব্যাপার তাঁহার প্রহসনের প্রধান অবলম্বন। 'একাকার' (১৩০১) 'কালাপানি' (১২৯৯), 'অবতার' (১৩০৮), 'বাবু' (১৩০০), 'বাহবা বাতিক' ইত্যাদি প্রহসনে তিনি বাঙালী-সমাজের অসঙ্গতির দিকটি তীক্ষ্ন বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করিয়াছেন। অমৃতলাল সমাজসংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ঈষৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন। ফলে অধিকাংশ স্থলে প্রগতিশীল আন্দোলনের বাড়াবাড়ির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রক্ষণশীলতার মধ্যেও যে হাস্যকর অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ততটা নজরে পড়ে নাই; ফলে এই সমস্ত প্রহসনে তিনি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদ্‌গামী মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ তীক্ষ্ন তীব্র বিদ্যুৎকশাঘাত, বাগ্‌ভঙ্গির এরূপ অট্টরোল, মাঝে মাঝে নাটকীয় সংস্থানের এরূপ নিপুণ কৌশল আর কোন বাংলা প্রহসনে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৪), 'কৃপণের ধন' (১৯০০) প্রহসন দুইখানির মধ্যে আক্রমণের উগ্রতা নাই; তাই অনেক বেশি উপভোগ্য হইয়াছে। অবশ্য দুইখানি প্রহসনই পাশ্চাত্ত্য

* অমৃতলালের কোন কোন রঙ্গনাট্য এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নাই। তাঁহার 'ব্যাপিকা বিদায়' এবং 'বাবু' সম্প্রতি অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতেছে।

নাটকের অনুকরণে রচিত ; তবে এরূপ সার্থক অনুকরণ কদাচিৎ দেখা গিয়াছে।

অমৃতলালের প্রহসন রচনায় অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। সংলাপ, ঘটনাসংস্থাপন, অসঙ্গতিজনিত হাস্যপরিহাস, আক্রমণমূলক ব্যঙ্গবিদ্রূপ—প্রহসনের অনেক উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনিতে পান নাই। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে বাঙালী সমাজজীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে অশোভন সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্য রচয়িতা হইয়াও পরবর্তীকালে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে নির্বাসিত হইয়াছেন। কিন্তু একালে আবার তাঁহার পুনর্মূল্যায়ন হইতেছে, তাঁহার কোন কোন প্রহসনে একালের দর্শক নির্মল আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছেন। কারণ আমরা সেকালের পটভূমিকা হইতে সরিয়া আসিয়াছি বলিয়া তাঁহার তীব্র ব্যঙ্গের আক্রমণে আমরা আর বিরক্ত বা বিব্রত হই না, বরং পরমানন্দে উপভোগ করিয়া থাকি।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা কাব্যে নবযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যে বাঙালী-মানসের যথার্থ মুক্তি হইল। তৎপূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গব্যঙ্গ ও লঘুচপল কবিতার দ্বারা বাঙালী সমাজে অপ্রতিহত প্রভাব অর্জন করিয়াছিলেন। অনেক কৃতবিদ্য যুবক (বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মনোমোহন প্রভৃতি) তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন; পরবর্তী কালের সাহিত্য-মহারথিগণের অনেকেই তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের একচ্ছত্র মহিমা হ্রাস পাইতে লাগিল। যদিও গুপ্তকবি প্রাত্যাহিক জীবনে হাস্যপরিহাস, রঙ্গব্যঙ্গ এবং স্বাদেশিক অনুভূতির উত্তাপ সঞ্চার করিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তবু আধুনিক বাঙালীর মন ও প্রাণ গুপ্তকবির লঘুচপল কবিতা লইয়া আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। পাশ্চাত্ত্য জগতের বিপুল জীবনবেগ ও কলোচ্ছ্বাস তখন বাঙালীর সদাসন্তুষ্ট রঙ্গব্যঙ্গমুখর স্থূল চেতনাকে বৃহত্তর আদর্শ ও মহত্তর প্রাণশক্তির অভিমুখে প্রেরণ করিবার প্রয়াস করিতে লাগিল। মহাকাব্য ও বীররসাত্মক ঐতিহাসিক কাব্যের রণরঙ্গপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে এই যুগের বাঙালী-মানসের ব্যাপ্তিবোধ সমন্বয় লাভ করিল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ এই আধুনিকতার উদ্বোধন করিলেন—বাঙালীর সমগ্র সত্তার পুনর্জাগরণ হইল। খিদিরপুরের জাহাজ-ঘাটায় বহু বিদেশী জাহাজের আনাগোনা হইতেই কি ইঁহাদের কবিচিত্তে সাগরপারের ঝড়ো হাওয়া প্রবেশ করিয়াছিল? ১৩৩০ সালে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সভাপতি অমৃতলাল বসু একটি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছিলেন, "জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময় বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোটবড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) ॥

প্রথম যৌবনে রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও সর্বপ্রথম তিনিই বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত রঙ্গলাল বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর গুপ্তের যুগও

বিদায় লইতে চলিয়াছে—আসিতেছে বাংলা কাব্যের নূতন অভ্যুদয়। ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত উচ্চ রাজকর্মচারী রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। তাহার পরে 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করিয়া তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার নিপুণ অধিকার ছিল। মধুসূদনও তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন; উভয়ের আলাপাদি থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেই যুগে ইংরাজীশিক্ষিত তরুণসম্প্রদায় ফ্যাশানের খাতিরে বাংলা সাহিত্যের অযথা নিন্দা করিত। তাহারই প্রতিবাদ করিতে গিয়া রঙ্গলাল ১৮৫২ সালে বীঠন সোসাইটির এক অধিবেশনে 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক একটি বক্তৃতায় ইংরাজী ও বাংলা কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বাংলা কাব্যের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত নিন্দা হইতে বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করেন। তখনই তাঁহার চিত্তে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস এবং ঈশ্বর গুপ্তীয় লঘু তরলতা ছাড়িয়া ইতিহাস ও স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ পটভূমিকায় কাব্যরচনার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহার চারখানি কাব্যের সৃষ্টিঃ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)। ইহা ছাড়াও তিনি 'কুমারসম্ভবে'র কিয়দংশ অনুবাদ (১৮৭২) করেন এবং 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) রচনা করিয়াছিলেন। শেষের কাব্যখানিও ইংরাজীর অনুবাদ। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে।

রঙ্গলাল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যকবিতার ছাঁদে এবং ম্যুর, বায়রন, স্কটের আদর্শে স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া আখ্যানকাব্য রচনা করেন এবং ইহাতেই মাইকেলের আগমনী সূচিত হয়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ (১৮৫৮) টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* হইতে আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর অবরোধ এবং সতীত্বরক্ষার জন্য পদ্মিনীর চিতানলে প্রাণবিসর্জনের আত্মত্যাগপূত শৌর্যবীর্যপ্রতিপাদক কাহিনীটি ঐতিহাসিক পরিবেশে স্থাপিত হইয়াছে। রঙ্গলাল প্রধানতঃ কাব্যের বিষয়বস্তুতে নূতন আবির্ভাবের মাঙ্গলিক গাহিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনের জয়ধ্বনি অনুরণিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্তের যুগে অভিনব ব্যাপার। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহবাণী বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম নব উদ্দীপনায় সুকঠিন চরিত্র-মাহাত্ম্যের জয় ঘোষণা করিয়াছেঃ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায়।

একদা বাংলার স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রথম উদ্বোধনে এই কবিতা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য ইহা রঙ্গলালের মৌলিক রচনা নহে, টমাস মুরের কবিতার ছায়ানুসারে রচিত। তাহা হইলেও ইহার মধ্যেই বাঙালী সর্বপ্রথম জাতি ও জীবনের প্রথম জাগরণ-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, তখনও সাহিত্য-ক্ষেত্রে মধুসূদনের আবির্ভাব হয় নাই, এবং গুপ্তকবির আধিপত্যও হ্রাস পায় নাই। সুতরাং রঙ্গলালের কৃতিত্ব সহজেই স্মরণীয়। তাঁহার পরবর্তী কাব্যগুলি রচনার পূর্বেই মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮৬২ সালে 'কর্মদেবী' প্রকাশিত হয়। তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছে। 'কর্মদেবী'র আখ্যানও রাজপুত ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে বীররস ও রোমান্সের বাহুল্য স্কট-বায়রনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'শূরসুন্দরী'তে রাণা প্রতাপসিংহের সমসাময়িক যুগের নারীর সতীত্ব ও মর্যাদা বিঘোষিত হইয়াছে। পরিশেষে ১৮ ৯ সালে রঙ্গলাল উড়িষ্যার একটি জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বনে 'কাঞ্চীকাবেরী' রচনা করেন। তিনি উড়িষ্যায় কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং উত্তমরূপে ওড়িয়াভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবর্তনায় ওড়িয়াভাষায় সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'কাঞ্চীকাবেরী'তে বীররস অপেক্ষা প্রণয়লীলা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র আখ্যানগৌরব ও রুচিপরিবর্তনের দায়িত্ব প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার আখ্যানকাব্যগুলির রচনার পূর্বেই মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরের নবীন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল; রঙ্গলালের এই শেষোক্ত কাব্যখানিতে তাহার প্রভাব যৎসামান্য। আধুনিকতার প্রথম উন্মেষ রঙ্গলালের কাব্যে হইয়াছিল, তাহা সত্য বটে। আধুনিক জীবনের বিপ্লবী তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল; কিন্তু উন্মূলিত করিতে পারে নাই। তিনি নবজীবনের তীব্র গতিবেগকে পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপের খাল কাটিয়া মন্থরগতিতে প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। নব জীবনোপলব্ধির স্থূল দিকটা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আত্মার গভীরে কোন বিপুল আবেগের প্রবল উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাগ্‌বন্ধ, শব্দপ্রয়োগ, মণ্ডনকলা—কোন দিক দিয়াই তিনি আগন্তুক জীবনের পুরা বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাস, স্বদেশপ্রেম ও রোমান্সকে মিশাইয়া পুরাতন পয়ারত্রিপদীতে ইনাইয়া বিনাইয়া তিনি দীর্ঘ ছড়া ফাঁদিয়াছিলেন। বীররসাত্মক মহাকাব্য দূরের কথা, রঙ্গলাল প্রথম শ্রেণীর

আখ্যানকাব্যও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, মাইকেলের নিকটেই বাস করিতেন। তাই মনে হয়, রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে আধুনিকতা বলিতে শুধু বহিরঙ্গগত বিষয়পরিবর্তনই বুঝিয়াছিলেন, নূতন আদর্শের গূঢ় রহস্য ধরিতে পারেন নাই। এককথায় মধুসূদনের মতো তাঁহার সমস্ত সত্তা নূতনের প্রেরণায় উন্মুখ হইয়া উঠে নাই। তবু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে স্বল্পশক্তি লইয়া রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে আধুনিকতা সঞ্চারে যেটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা কাব্যকে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস, কবিওয়ালাদের কুরুচি ও ঈশ্বর গুপ্তের তুচ্ছ ছড়া-পদ্যের অগৌরব হইতে রক্ষা করিয়া নূতন, সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাদেশিক বলিষ্ঠতা সৃষ্টিতে সারস্বত প্রতিভাকে নিযুক্ত করিয়া রঙ্গলাল মহত্তর কবিধর্মই পালন করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ॥

রঙ্গলাল বাহিরের দিক হইতে আধুনিক জীবনের আংশিক পরিচয় পাইয়াছিলেন, মধুসূদন সমগ্র সত্তায় নব জীবনরসের ফেনোচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিয়া বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতা সূচিত করিলেন। কাব্য, নাট্য ও প্রহসনে এত অধিক মৌলিকতা এবং তাহারই সঙ্গে রসনিষ্পত্তির এমন প্রাচুর্য আধুনিককালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একপ্রান্তে মধুসূদন, আর একপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ। ভাবে, ভাষায়, অলঙ্করণে, আত্মার সুগভীর নিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশের সুতীব্র বেদনা—যাহা একদা রেনেসাঁসের য়ুরোপকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল, তাহাই ঈষৎ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ও সঙ্কুচিত পরিবেশে মধুসূদনের সাহিত্যে আবির্ভূত হইল। মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবজাগ্রত প্রতীক; যাহাকে আমরা 'ঊনিশ-শতকী রেনেসাঁস' বলিয়া থাকি, মধুসূদনের বিচিত্র প্রতিভা তাহাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। এতদিন ধরিয়া কাব্যাদর্শ, ছন্দ-প্রকরণ, বিষয়বস্তু ও রচনারীতির যে বনস্পতি কবিকুলকে ছায়া দিয়া, ফল দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছিল, মধুসূদনের বিপ্লবী যুগন্ধর প্রতিভা তাহাতে যেন বজ্র হানিয়া নবজীবনের অগ্নিপিণ্ডটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে। মধুসূদন নবীন বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার বিবর্ণ পরিবেশ হইতে উদ্ধার করিয়া মহৎ জীবন ও বৃহৎ আকাঙ্ক্ষার দিব্যরাগে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন।

মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের নাটকীয় আকস্মিকতা, দুরন্ত ট্র্যাজেডির অবশ্যম্ভাবী শোকাবহ পরিণতি, অনন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মন্তুদ সমাধির কাহিনী বাঙালীর সুপরিচিত। তিনি যেন নিজ বক্ষঃপঞ্জরে আগুন জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের মতো দুঃখবেদনা হতাশার বিষাক্ত পানীয় সেবন করিয়া শ্রীমধুসূদন গৌড়জনের জন্য যে অমৃত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার অমেয় মূল্য তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বাল্যকালে মধুসূদন ইংরাজী কবিতায় হাত পাকাইয়াছিলেন। সে যুগের কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ইংরাজী সাময়িকপত্রে এই সমস্ত কবিতার কিছু কিছু মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪৮-৪৯ সালে *Madras Circulator* পত্রে তাঁহার *A Vision—Captive Ladie* প্রভৃতি কবিতা "Timothy Penpoem" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী কবিতার অধিকাংশ স্থলে তিনি এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত কাব্য-কবিতা প্রকাশিত হইলে অচিরে তাঁহার কবিযশে ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ মহলে সাড়া পড়িয়া যাইবে। ১৮৪৯ সালে মান্দ্রাজ হইতে *The Captive Ladie* প্রকাশিত হইল, কিন্তু আশানুরূপ যশ জুটিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধুসূদন বুঝিলেন যে, ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজী কাব্যে পাড়ি জমান অসম্ভব। তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষাপরিষদের সভাপতি জে.ই.ডি. বীঠন মধুসূদনের ইংরাজী কাব্য পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কবির এই প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি মাতৃভাষায় প্রয়োগ করিলে তিনি অধিকতর গৌরব লাভ করিবেন। তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাকও সেই মর্মে তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। মধুসূদন ইংরাজী কাব্যরচনার ব্যর্থ সাধনা হইতে মুক্তি পাইলেন,—মান্দ্রাজে থাকিতেই বাংলাভাষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য হিব্রু, লাতিন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধু গৌরদাসকে কবি লিখিলেন, "Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?" মধুসূদন খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, ইংরাজ ও ফরাসী মহিলা[১] বিবাহ করিয়াছিলেন—ভালই হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টান না হইলে বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়িতে পাইতেন না, এবং গ্রীক-লাতিন শিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। মধুসূদন প্রথাসিদ্ধ পথে যাত্রা করিয়া হিন্দুসমাজে বাস করিলে বড় জোর রঙ্গলাল, না হয় হেমচন্দ্র হইতেন, 'শ্রীমধুসূদন' হইতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। মাইকেলের খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। মধুসূদন কলিকাতায় ফিরিয়া পুলিশ কোর্টের দোভাষীর কর্ম করিতে করিতে এই নগরীর অভিজাতসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং অনুকূল পরিবেশে বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। ইতিপূর্বে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি কীভাবে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১ সালে যখন 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করিতেছিলেন, তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। পরবর্তী কাব্যসমূহে ছন্দের অভিনবত্ব দেখাইবার জন্য আগ্রহী হইলেও তাঁহার অন্তর্লোকে তখন নূতন সৃষ্টির আবেগ জমিয়া উঠিতেছিল।

---

১. তাঁহার প্রথমা পত্নী রেবেকা অক্টাভিস একজন নীলকর ইংরাজের কন্যা। কিছুকাল দাম্পত্যজীবন যাপন করিবার পর উভয়ের বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী অঁারিয়েত্তা (Henriatta) এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা। অঁারিয়েত্তাই তাঁহার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী। এই সাধ্বীরমণী স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে লোকান্তরিত হন।

আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। হেলনীয়, হিব্রু ও খ্রীষ্টান সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সর্বভার-বহনক্ষম যৌগিক প্রতিভার সাহায্যে মধুসূদন তাঁহার নানা কাব্যে বিচিত্র কবিচেতনার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' ১৮৬০ সালে এবং সর্বশেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ১৮৬৬ সালে—মোট ছয় বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মোট কাব্যের সংখ্যা পাঁচ—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১ম খণ্ড—জানুয়ারী, ১৮৬১, দ্বিতীয় খণ্ড—জুন ? ১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (জুলাই, ১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। এত অল্প সময়ের মধ্যে যিনি এরূপ বিস্ময়কর রচনাশক্তির কৃতিত্ব দেখাইয়া, একহাতে ভাঙিয়া, আর একহাতে গড়িয়া এমন অভূতপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্লভ অনন্যতা লক্ষ্য করা যাইবে। বাংলাদেশের অন্য কোন কবি এত অল্প সময়ে এরূপ বিপুলায়তন সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই ; অবশ্য অল্পকালের মধ্যে সমস্ত কিছু সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর দ্রুতবেগ আছে, যাহার ফলে অনেক সময় শিল্পসৃষ্টি পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই কবির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর একটু অবকাশ পাইলে, তাঁহার প্রতিভার পরিণতির পথে যে বাধাগুলি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হয়তো বিদূরিত হইতে পারিত। নিম্নে তাঁহার কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ১৮৬০ সালে মে মাসে প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' (জানুয়ারী, ১৮৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিনি তখনই বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। নাটক রচনা করিতে গিয়া মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে 'পদ্মাবতী' নাটকে কলির সংলাপে কয়েক ছত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ যোজনা করিয়া কবি দেখিলেন যে, তাহা নিন্দনীয় হয় নাই। তখনই এই ছন্দে আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য রচনার চিন্তা তাঁহার মনে জাগ্রত হইল। ইতিপূর্বে ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। যতীন্দ্রমোহন বাংলা ছন্দে Blank verse প্রকরণ প্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলে মধুসূদন দৃঢ়ভাবে বাংলাভাষায় Blank verse অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন সমর্থন করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম সর্গটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন।

ইতিমধ্যে তিনি রামকুমার বিদ্যারত্ন নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছিলেন। আর তা' ছাড়া পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ সে যুগে আর কে-ই বা ছিল। সুতরাং পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ-তিলোত্তমা-কাহিনী অবলম্বনে চারি সর্গে রোমাণ্টিক আখ্যান-কাব্য প্রণয়নে তিনি বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন নাই। দেবদ্রোহী সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা পার্থিব ও অপার্থিব সৌন্দর্যের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা নাম্নী অলোকসম্ভবা রমণী মূর্তি নির্মাণ করিলেন। অসুর ভ্রাতৃদ্বয় সর্বাবস্থায় পরস্পর অনুরক্ত ছিল, এবং এই জন্যই দেবতারা তাহাদের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহাদের প্রতি অলক্ষ্য স্থান হইতে প্রাণঘাতী বাণ বর্ষিত হইল। এই অপূর্ব রমণীকে দেখিয়া দুই ভাই-ই মোহমদে মাতাল হইয়া পরস্পরের উপর বিদ্বিষ্ট হইল এবং একে অপরের দ্বারা নিহত হইল—স্বর্গ রক্ষা পাইল। মোটামুটি ইহাই 'তিলোত্তমা'র ঘটনা। মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ইহাতে বিকশিত হইতে পারে নাই। কাহিনী পরিকল্পনায়ও তিনি প্রশংসনীয় মৌলিকতা ও বিচিত্র গ্রন্থননৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। শুধু দেবরাজের চরিত্র কিয়দংশে মহিমান্বিত হইয়াছে এবং তিলোত্তমার লাজভীরু পদচারণা অপূর্ব রোমাণ্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম রচনা বলিয়া ইহার ভাষা-ভঙ্গী, অলঙ্করণ ও ছন্দের মধ্যে পদে পদে অনভ্যস্ত সঙ্কোচ পরিলক্ষিত হইবে। সর্বোপরি মধুসূদন ইহাতে স্বকীয় জীবনদর্শনগত কোন অভিনব আদর্শ ফুটাইতে পারেন নাই। ইহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রথম কাব্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে—এইটুকুই ইহার মূল্য। ইহার পূর্বে মিত্রাক্ষর পয়ার বাংলা কাব্যে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতেছিল। প্রতি চরণে ৮+৬ অক্ষর এবং প্রতি চরণের অন্তে বিরতি—মোট আটাশ অক্ষরে দুই চরণে সম্পূর্ণ পয়ার ছন্দ অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পদে পদে অক্ষরবিরতির (অর্থাৎ ৮ অক্ষরের পর অল্প বিরতি, চরণের শেষে ১৪ অক্ষরের পরে দীর্ঘতর বিরতি এবং পরবর্তী চরণেও ঐ ৮ অক্ষরের পর অল্প এবং ১৪ অক্ষরের পরে পূর্ণ বিরতি) বাঁধা ছক অনুকরণ করিতে হয় বলিয়া ইহাতে ছন্দের প্রবহমানতা বজায় রাখা যায় না। সুতরাং পয়ার ছন্দে পাঁচালী ধরনের বিবৃতিমূলক কবিতা রচনা সম্ভব হইলেও আধুনিক কাব্যে ইহার প্রয়োগ চলে না। মধুসূদন-পরিকল্পিত অমিত্রাক্ষর নামটির মধ্যে ত্রুটি আছে। বাহিরের দিক হইতে মনে হইবে, পয়ারের অন্ত্যমিল তুলিয়া দেওয়াই বুঝি অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ; তাহা কিন্তু ঠিক নহে। অর্থানুসারে যতিপাত অমিত্রাক্ষরের একমাত্র লক্ষ্য; মিল থাকা বা না থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ নহে।*

* তাই কেহ কেহ এই ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর' না বলিয়া 'অমিতাক্ষর' ছন্দ বলিতে চাহেন। সে যাহা হউক, মধুসূদন-প্রদত্ত 'অমিত্রাক্ষর' শব্দটি যেভাবে চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাকে আর বদল করা যাইবে না।

কাশীরামের—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥

এবং মধুসূদনের —

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী দেবতাত্মা, ভীষণ দর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল
যেন উর্ধ্ববাহু সদা শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী
যোগিকুলধ্যেয় যোগী।

এ ছত্রগুলি একধরনের রচনা নহে, তাহা সেদিনের সাধারণ পাঠকও বুঝিতে পারিয়াছিল। এই ছন্দের মৌলিকতা মধুসূদনের সর্ববৃহৎ দান ; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবন ও বাণীকে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ দান করিতে হইলে পয়ারের নিগড়মুক্ত এই ছন্দের প্রয়োজন ছিল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে মধুসূদনের মতো তীক্ষ্ণ ছান্দসিক প্রতিভা বাংলার অন্য কোন কবির কাব্যে এত বড় একটা মৌলিকতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবৈচিত্র্য সার্থক হইয়াছিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ফলেই। সে যাহা হউক, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' ছন্দ ব্যতীত ঘটনা, চরিত্র ও রচনা কৌশল মধুসূদনের প্রতিভার উপযুক্ত সৃষ্টি নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কবিও তাহা জানিতেন। তাই তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার আমূল সংশোধন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'[২] পত্রিকায় (১৮৭১ শকাব্দের ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে), 'তিলোত্তমা-সম্ভবে'র দুই সর্গ প্রকাশিত হইলে ইহার প্রতি বাঙালী পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নূতন মৌলিক সৃষ্টির গৌরব অপেক্ষা নূতন পথের সন্ধানীরূপেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র গৌরব।

ইহার অল্পদিনপরে মধুসূদনের যুগান্তকারী মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশিত হইল। ইহা শুধু একখানি উৎকৃষ্ট আলঙ্কারিক মহাকাব্য (Epic of Art) নহে, ইহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মানসের জীবনবেদ বলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা, বিরাট জীবনের সমুদ্রসঙ্গীত গান করিবার দুরন্ত অভীপ্সা এবং ঘনায়মান বাধাবিপত্তি ও বিনাশের মধ্যেও অপরাজেয়

২. ১৭৮২ শকের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' 'তিলোত্তমা-সম্ভব' আলোচনাকালে মনীষী রাজেন্দ্রলাল কবিকে সম্মানিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।'

প্রাণশক্তির দুর্জয় ঐশ্বর্য তদানীন্তন বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতিকেই যেন প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করিয়াছে।

মধুসূদন বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন, মান্দ্রাজে বাসকালে সম্ভবতঃ তিনি হেমচন্দ্রের জৈনরামায়ণও পাঠ করিয়া থাকিবেন। জৈনরামায়ণে রাবণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে; মধুসূদন ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? 'ইলিয়াড'-এর ঘটনার সঙ্গে পুরাপুরি মিল না থাকিলেও কোন কোন দিক দিয়া রামায়ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে। মধুসূদন রামায়ণ-কাহিনীর লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত মেঘনাদের নিধন অবলম্বনে নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে এই কাব্যের প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) এবং এই বৎসরের জুন মাসের কাছাকাছি দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হইল। ১৮৬২ সালে হেমচন্দ্রের সম্পাদনায় দুইখণ্ড একত্রে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত এবং অল্প-শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। 'মেঘনাদবধে'র প্রথম খণ্ড পাঠেই সকলে তাঁহার বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় পাইলেন। কাব্যটি প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যেই কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ হইতে কবিকে সংবর্ধিত করেন (১৮৬১, ১২ ফেব্রুয়ারী)। ইহাই বাংলাদেশে আধুনিককালে প্রথম কবিসংবর্ধনা। অচিরে মধুসূদন মহাকবির[৩] গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিলেন। ক্রমেই তাঁহার প্রতিভা লইয়া নিন্দা ও প্রশংসা আরম্ভ হইল। সে যুগে তাঁহার সম্বন্ধে যত আলোচনা, প্রশংসা ও নিন্দাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, অন্য কাহারও সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় নাই।[৪] রামমোহন সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া সারা বাংলাদেশেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছিলেন, মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসে অধিকতর উত্তেজনা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল।

নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীরবাহুর নিধন-সংবাদ হইতে মেঘনাদের হত্যা ও প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত—ইহাতে মোট তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্বল্পপরিসর কাহিনীতে অত্যন্ত দ্রুত গতিবেগের সাহায্যে ঘটনার জটিলতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কাহিনীর সময়গত সঙ্কীর্ণতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। নয়টি সর্গের মধ্যে চতুর্থ ও অষ্টম সর্গ একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। অবশ্য লীরিক মাধুর্য ও পূর্বাপর কাহিনীর সঙ্গতি রক্ষার জন্য চতুর্থ সর্গটির (সীতা ও সরমার কথোপকথন) গভীর তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে।

৩. মধুসূদন 'মেঘনাদবধ'কে মহাকাব্য না বলিয়া 'epicling' বা ক্ষুদ্রতর মহাকাব্য বলিয়াছেন।

৪. চীনাবাজারের সামান্যশিক্ষিত দোকানদারও 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়িয়া আনন্দ পাইত। 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম

মধুসূদন বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কাহিনীকে গ্রহণ করিয়া নিজ প্রতিভা ও প্রয়োজনানুসারে এই মহাকাব্যের আখ্যান পরিকল্পনা করিয়াছেন। চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়া তিনি পুরাপুরি ভারতীয় ঐতিহ্য স্বীকার করেন নাই। হোমার, ভার্জিল তাসো, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই ট্র্যাজিকধর্মী মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনার বহুস্থলে পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যাইবে। রাবণ ও মেঘনাদ এবং সীতা ও প্রমীলা চরিত্রাঙ্কনে তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রাবণ-বংশের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভক্ত হইলেও পুরাণের 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' নীতি নিজ জীবনেও মানিয়া চলেন নাই, সাহিত্যেও 'ভরতবাক্য' উচ্চারণ করিয়া 'Poetic Justice'-এর জয় ঘোষণার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রামচন্দ্র দেবতাদের সহায়তায় জয়ী হইয়াছেন, লক্ষ্মণ চণ্ডীর বরে অন্যায়ভাবে মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন,—ইহার জন্যই রাবণের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রকে ভীরু কাপুরুষ করিয়া না আঁকিলেও তাঁহার প্রতি মধুসূদনের আবেগ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয় নাই। ন্যায় নীতির অনুসরণে পাঁজিপুথি মিলাইয়া দৈবাদেশ শিরোধার্য করিয়া মধ্যযুগীয় সংস্কারের যে আদর্শ আমাদের দেশে এতদিন ধরিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, মধুসূদন সর্বপ্রথম তাহাতে সাহিত্যের পক্ষ হইতে প্রকাণ্ড ফাটল সৃষ্টি করিলেন। বিরাট চরিত্র, অনমনীয় পৌরুষ, দাম্ভিক বীর্য এবং নিয়তির উপর জয়ী হইবার ব্যর্থ সাধনা রাবণ-চরিত্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মানসের প্রতিনিধিতে পরিণত করিয়াছে। তাই 'মেঘনাদবধে'র নায়কত্ব বাহ্যতঃ মেঘনাদকে প্রদত্ত হইলেও রাবণের মর্মন্তুদ পরাজয়ই ইহার মুখ্য কথা। প্রাচীন মহাকাব্যের নায়ক চরিত্রের জয়েই মহাকাব্য সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানসিক পরিবেশ ও সামাজিক আদর্শ মহাকাব্যের পূর্বতন বস্তুগত রূপকে (objectivity) খর্ব করিয়া কবিদের ব্যক্তি-হৃদয়-মন্থনজাত বেদনারসে কাহিনী ও চরিত্রকে অভিষিক্ত করিয়াছে। মধুসূদন বীররসের কাব্য লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মেঘনাদের আদ্যন্ত করুণরসের প্রাধান্য। প্রথম সর্গে বীরবাহুর নিধন-সংবাদে রাবণের বিলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম সর্গের অন্তিমে নিহত পুত্রের চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান বিরাট ব্যক্তিত্বের অসহ আর্তনাদ—রাবণ-চরিত্রকে বজ্রাহত বনস্পতির মতো নিরাভরণ বৈরাগ্য দান করিয়াছে। পূর্বতন মহাকাব্যের নায়ক যদি এইরূপ বিলাপ করিত, তাহা হইলে সেই কাব্য 'Heroic Tale' হিসাবে ব্যর্থ হইত। কিন্তু আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরাভূত মানবের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস কাব্যসমাপ্তিকে মর্মন্তুদ বেদনা-মাধুরীতে ভরিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সুলভ করুণরসের (pathos) কাব্য বলা যায় না। গ্রীক সাহিত্যের ভাবরসিক মধুসূদন রাবণ-চরিত্রে

গ্রীক Nemesis বা অদৃষ্টতাড়নার নির্মম ট্র্যাজেডিকেই অঙ্কিত করিয়াছেন। পুত্রের চিতাপার্শ্বে পুত্রবধূ রক্ষকুললক্ষ্মী প্রমীলাকে দেখিয়া রাবণ যখন আর্তনাদে ভাঙিয়া পড়েন—

'হা পুত্র! বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?'

তখন এই বিলাপ, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভস্মাবশেষ অপূর্ব মানবরসে মিশ্রিত হইয়া এই মহাকাব্যকে একাধারে মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি ও গীতিরসের সমন্বয়ী রূপ দান করে। 'মেঘনাদবধে'র বহু সমালোচনা[৫] হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে এই কাব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইলেও পরিণত বয়সে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা:

'কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছু মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহার গলায় পরাইয়া দিল।'

অদ্ভুত প্রতিভাধর মধুসূদন প্রায় একই সময়ে 'মেঘনাদবধ' এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন। মেঘনাদের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইবার সামান্য পরে ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইলে লোকে বুঝিতে

---

৫. এই কাব্য প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ উহার বিদ্রূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্র ১২৭৫ সালের বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আশ্বিন সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ব্যঙ্গ করিয়া 'ছুছুন্দরীবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ প্রকাশ করেন। মধুসূদনের ভাষা-ভঙ্গিমা নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়া কবিকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই এই ব্যঙ্গকাব্যের কিয়দংশ রচিত হয়। একটু দৃষ্টান্ত:—

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে। দাও—চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত-দুর্জয়—
পললাশী বজ্রনখ—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিলা ধনী নখর প্রহারে
যাদঃপাতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।

স্বামী বিবেকানন্দ 'ছুচ্ছুন্দরী বধ' কাব্যের রচয়িতাকে প্রশংসা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করিতে কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হল। তা যত পারিস্ লেখ্ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' ('স্বামিশিষ্য-সংবাদে')

পারিল, মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের তূর্যধ্বনি ও সনাতন প্রচলিত ছন্দের স্নিগ্ধ মাধুরী—উভয় ধরনের রচনাতেই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেকেই, বিশেষত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু প্রথম জীবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অশুচি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন না। কিন্তু মধুসূদন খ্রীষ্টান হইলেও রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রতি কবিজনোচিত কৌতূহল ও উদারতা দেখাইয়াছেন। মহাকাব্যের নানাস্থানে তিনি কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ করিয়াছেন। তখনই বোধ হয় রাধাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি একখানি 'ওড' জাতীয় (Ode) গীতিকাব্য রচনার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে তিনি মনোযোগ দিয়া 'গীতগোবিন্দম্' ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিতেছিলেন। শুনা যায় তাঁহার সতীর্থ ও প্রিয় সুহৃৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বৈষ্ণব কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, 'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে পার?' যদিও রাধাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা রাজনারায়ণের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, তবু মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিলেন। ইহার সূচনা 'মেঘনাদবধের' পূর্বেই হইয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রাধার বিরহ অবলম্বনে রচিত ইংরাজী Ode* শ্রেণীর গীতিকবিতার সঙ্কলন। প্রথমে তিনি প্রথম সর্গ নাম দিয়া এই কবিতাগুলিকে একত্রে প্রকাশ করেন। ইহাতে রাধা-বিরহের বিচিত্র দশা বর্ণিত হইয়াছে। কবি বোধ হয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে কয়েক সর্গ ('মিলন') রচনার অভিলাষ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করিবার অবকাশ পান নাই। কবি যে বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন সুরসিক পাঠক ছিলেন, তাহা 'ব্রজাঙ্গনা'র প্রথমেই 'পদাঙ্কদূত' হইতে 'গোপীভর্তুর্বিরহবিধুরা উন্মত্তেব'—এই শ্লোকের উল্লেখ হইতেই বুঝা যাইবে। কৃষ্ণ-সাহচর্যবঞ্চিতা রাধার বিরহব্যাকুল দিব্যোন্মত্ত অবস্থা বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি। মধুসূদন সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া এই সুমধুর কাব্য রচনা করেন। বৈষ্ণব কবিদের ভণিতার মতো কবি কিছু কিছু ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন—

কি কহিলি কহ, সই, শুনি, লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

এই ভণিতাটি বৈষ্ণব পদকর্তাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এত করিয়াও মধুসূদন বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের কবি-মন বৈষ্ণব

* ব্যক্তি বিশেষকে সম্বোধন করিয়া রচিত গীতিকবিতাকে ইংরাজীতে 'Ode' বলে।

পদাবলীর মানবরসের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাই 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবমূর্তি না হইয়া মানবীতে পরিণত হইয়াছে। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, গৌড়ীয় ভক্তিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে মধুসূদনের কিরূপ অধিকার ছিল জানা যাইতেছে না; কিন্তু অধ্যাত্মলোক-বাসিনী শ্রীরাধাকে তিনি মানবজীবনের তৃষাতপ্ত প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও জীবনে মানবরসই প্রাধান্য অর্জন করিতেছিল। মধুসূদন সেই মানবরসকেই স্বীকৃতি দিয়া রাধার বেদনাবিধুর বিরহবিলাপ রচনা করিয়াছেন। সে যুগে তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা, ছন্দ ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব অনেক পাঠক সহিতে পারিতেন না; তাঁহারা কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'কে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। মধুসূদনও এই গীতিকবিতাগুলিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রাধার উক্তিতে কবির ব্যক্তিমানসটি প্রতিফলিত হইয়াছে; তাই বোধ হয় ইহার মধ্যে কবি মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা অতি নিপুণভাবে অনুকরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের এই কাব্যের ভাষা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ নহে; বরং তিনি এবিষয়ে ভারতচন্দ্র ও নিধুবাবুর টপ্পার ঢং অধিকমাত্রায় অনুকরণ করিয়াছিলেন। শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নহে, 'ব্রজাঙ্গনা'র স্নিগ্ধ-মধুর মিত্রাক্ষরযুক্ত স্তবকবন্ধন পরবর্তী কালের গীতিকবিতাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শুনা যায়, নবদ্বীপের কোন-এক বৈষ্ণবভক্ত মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' পড়িয়া "পরম ভক্ত বৈষ্ণব-শেখর পুণ্যবান মধুকে" দেখিবেন বলিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের বিদেশী বেশভূষা দেখিয়া তিনি বিমূঢ় মুগ্ধতার বশে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট!"[৬] এ ভুল অনেকেই করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রজাঙ্গনার উপরের দিকটা দেখিয়াছেন, ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা দেখিতেন, বৈষ্ণবপদাবলীর মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা এবং মধুসূদন-পরিকল্পিত "Poor Lady of Vraja" কখনই এক জাতীয়া নহেন। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, এই ধারণা স্পষ্ট হইলে 'ব্রজাঙ্গনা'র রসমাধুরী আরও উপভোগ্য হইবে।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬১ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, রচনারীতির অভিনবত্ব এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ-বিকাশের জন্য এই কাব্য মধুসূদনের কবি-খ্যাতিকে বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাবলিয়াস ওভিডিয়াস ন্যাসো (খ্রীঃ পূঃ ৪৩—খ্রীঃ ১৭ অব্দ) *Heroides* ('Heroic Epistles') নামক কাব্যে পত্রের সাহায্যে গ্রীক পুরাণ ও মহাকাব্যের নারীচরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও পাতিব্রত্য, প্রেম ও কামনার রক্তরাগের শিল্পরূপ অঙ্কন করিয়াছিলেন। মধুসূদন এই পত্রলিখনের নাটকীয়

৬. নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি

রীতিটি অবলম্বন করিয়া এগারখানি পত্রের সাহায্যে প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারত এবং নানা পুরাণের নারীচরিত্রগুলিকে নূতনরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। ওভিডিয়াস একুশখানি পত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষা ও নিষিদ্ধ বাসনার গাঢ় চিত্র অংকন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বোধ হয় একুশখানি পত্র লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তখন তাঁহার পারিবারিক জীবনে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছে; তাই মাত্র এগারখানি পত্র রচনা করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আরও পাঁচখানি পত্র রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলিতে পরিপক্কতার অভাব আছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রধান পত্রগুলির মধ্যে সোমের প্রতি তারা, অর্জুনের প্রতি উর্বশী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য পত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় নারীধর্মের আদর্শই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী। ইহাতে তিনি নারীচরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য-গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে মৌলিক সৃষ্টির বিশেষ প্রেরণা নাই। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পত্রগুলির নায়িকারা—কেহ নিষিদ্ধ প্রেমে উন্মাদিনী, কেহ কামের বশে প্রিয়সঙ্গ-প্রার্থিনী, কেহ-বা স্বামীর অপরাধ বা অবিচারের জন্য তাঁহার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহে। এই চরিত্রগুলি ঠিক প্রাচীন পৌরাণিক সংস্কার হইতে জন্মলাভ করে নাই। ইহারা একেবারে আধুনিক জীবনের মর্মস্থলে নামিয়া আসিয়াছে। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রগত পৃথক সত্তা, জীবন সম্বন্ধে সুকঠোর বাস্তবদৃষ্টি, কখনও বা নীতি-দুর্নীতির উপদেশতত্ত্ব ছাড়িয়া স্বহস্ত-জ্বালিত বহ্নিশিখায় আত্মদানের ঔৎসুক্য এই চরিত্রগুলিকে বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা দিয়াছে। এই সমস্ত চরিত্রের বাহিরের আধার কিয়দংশে পৌরাণিক জীবনের অনুকূল, কিন্তু মধুসূদন পৌরাণিক আধারে আধুনিক জীবনের ফেনোচ্ছ্বসিত বিষামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রথম উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। মধুসূদনের এই কাব্যও নারীর পারিবারিক চরিত্র অপেক্ষা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

'বীরাঙ্গনা'র বিষয়বস্তু যেমন অভিনব, তেমনি, ইহার ছন্দও সুপরিপক্ব। ইহাতে মাইকেলী উদ্ভট শব্দপ্রয়োগ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের জড়তা ঘুচে নাই; কিন্তু আলোচ্য কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অতি সুললিত; পদবন্ধন ও যতিপাতে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। সর্বোপরি পত্রগুলির উক্তিতে একটা বেগবান স্বাদুতার সহজ স্পর্শ পাওয়া যায়। এই কাব্যেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ 'বীরাঙ্গনা' নামটি লইয়া গোলে পড়িয়াছেন। এই কাব্যের অঙ্গনারা বীর্যবতী নহে—অন্ততঃ বীর্যেই তাহাদের স্বরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে

'বীরাঙ্গনা' শব্দটি নায়িকা বা heroine অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বীরপুরুষের প্রণয়ভাগিনী—এইরূপ অর্থও করা যায়। কিন্তু এই কাব্যে উল্লিখিত সকল পুরুষ-চরিত্রই বীরচরিত্র নহে। সোম রোমাণ্টিক কবিতার নায়ক—বীরপুরুষ নহেন। নীলধ্বজের বীরত্বের অভাব হইয়াছিল বলিয়াই জনা তাঁহাকে এত কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং *Heroides* নামটি যে অর্থে (অর্থাৎ নায়িকা) প্রযুক্ত হইয়াছে 'বীরাঙ্গনা' নামটিতে অনুরূপ অর্থই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।[৭]

১৮৬৫ সালে মধুসূদনের শেষকাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাশ্চাত্ত্য সনেটের আদর্শে রচিত হয়। তখন তিনি ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। প্রায় একশত সনেট রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট তারিখে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে বাস করিবার সময় তিনি বাংলাভাষায় সনেট লিখিবার চেষ্টা করেন। যখন তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখনই সনেট রচনার ইচ্ছা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি 'কবি-মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট লিখিয়া বন্ধু রাজনারায়ণকে উপহার দিয়া লিখিলেন, "In my humble opinion if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian." ইতালিতে পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪) নামক কবি সনেটকে সম্পূর্ণতা দান করিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন।* তাঁহার পরে সমগ্র য়ুরোপে সনেট অনুশীলিত হইয়াছে। চতুর্দশ পংক্তিতে রচিত ও বিশিষ্ট মিলবিন্যাসে সজ্জিত গীতিধর্মী কবিতাকে সনেট বলে। চৌদ্দ-পংক্তির আট পংক্তিকে অক্টেভ (অষ্টক) এবং শেষ ছয় পংক্তিকে সেসটেট (ষট্‌ক) বলা হয়। প্রথম আট পংক্তিতে বক্তব্যের উপস্থাপনা ও শেষ ছয় পংক্তিতে বক্তব্যের উপসংহার থাকে। উপরন্তু ইহার মিলবিন্যাসের (rhyme) নানারূপ জটিল রীতি আছে।

পেত্রার্কা যে বিশুদ্ধ রীতিটি সনেটে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পেত্রার্কা সনেট নামে পরিচিত। ইহার অষ্টক ষট্‌কের বন্ধন এবং মিলবিন্যাসের বাঁধাবাঁধি রীতি প্রত্যেক কবিকে নিপুণতার সঙ্গে অনুসরণ করিতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটের রীতিনীতি একটু শিথিল। য়ুরোপে পেত্রার্কা সনেট ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেট—এই দুই প্রকার

---

৭. মধুসূদন বোধ হয় 'বীরনারী' বা 'বীরজায়া' অর্থে 'বীরাঙ্গনা' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' "উপক্রম" কবিতায় নিজ কাব্যপরিচয় দিতে গিয়া "বীরাঙ্গনা কাব্য" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"বিরহ লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার বীরজায়া পক্ষে বীরপতিগ্রামে।"

অবশ্য কোন কোন নারীচরিত্রে পুরুষচরিত্রের ন্যায় কঠোরতা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন জনা ও কৈকেয়ী। জনা স্বামীর ভীরুতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কৈকেয়া দশরথকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাপরাধে রীতিমত বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

* পেত্রার্কার পূর্বেও সনেট রচিত হইয়াছিল।

সনেট জনপ্রিয় হইয়াছে। মধুসূদন বিশুদ্ধ পেত্রার্কা রীতিতে অল্প কিছু সনেট লিখিলেও শেক্‌স্‌পীয়রীয় স্বাধীন রীতি তাঁহার অধিকতর মনোরঞ্জন করিয়াছিল। মধুসূদনের পর বাংলাদেশে দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং আধুনিক কালে কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি অজিত দত্ত অনেক উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করিয়াছেন। সনেটের ঘনপিনদ্ধ গঠন, মিলনবিন্যাসের নিয়মশৃঙ্খলা, ভাবসংহতি প্রভৃতি বিচার করিলে মধুসূদনকে শুধু বাংলা সনেটের প্রবর্তকরূপে গণ্য না করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সনেটলেখক বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভায় মধুসূদন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাঁহার সনেটে সনেটের নিয়মরীতি অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে।

মধুসূদন যখন নানা বিড়ম্বনার মধ্যে বিদেশে বাস করিতেছিলেন, তখন স্বদেশের জন্য তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কবির গ্রাম্যস্মৃতি, উৎসবানুষ্ঠান, কবির বন্ধু, তৎকালীন বাঙালী সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি—এই সমস্তই তাঁহার 'চতুর্দশপদী'তে স্থান পাইয়াছে। মধুসূদনের গীতিরসসিক্ত মন এই কাব্যের অনেকগুলি সনেটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত কবিতায় কবির স্বাদেশিক মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাব স্নিগ্ধ মাধুরী ও কবির আন্তরিক নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে হইবে। সর্বশেষ কবিতা 'সমাপ্তে'-র শেষ কয় পংক্তিতে কবির মনোগত বাসনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে। কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে; তাই নিজ ব্যক্তিগত নৈরাশ্য এবং বাংলাদেশকে গৌরবে সমাসীন দেখিবার ইচ্ছা কবিতাটিকে একটা উৎকৃষ্ট সনেটে পরিণত করিয়াছে। বঙ্গভারতীকে সম্বোধন করিয়া কবি শেষকথা নিবেদন করিতেছেন ঃ

> নারিনু মা চিনিতে তোমারে
> শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
> (যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
> এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে।
> এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে।
> জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ, ভারত-রতনে।

মধুসূদনকে আমরা মহাকবি বলিয়া জানি, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে গীতি-কবির ভাবধারা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-বা প্রচ্ছন্নভাবে বহমান ছিল।[৮] এই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাহার প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত তিনি দুইটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা লিখিয়াছিলেন—'আত্মবিলাপ' (১৮৬২ সালে প্রকাশিত) এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২)। 'আত্মবিলাপে' কবির ব্যর্থ জীবনের প্রতি হতাশা ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

> আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
> তাই ভাবি মনে।
> জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
> ফিরাব কেমনে?

৮. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'গীতকবি শ্রীমধুসূদন' দ্রষ্টব্য।

কিংবা য়ুরোপ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 'শ্যামা জন্মদা' বঙ্গজননীকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইয়াছিলেন ঃ

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

ইহাতেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম সূচনা হইয়াছে।

মধুসূদন শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও গ্রন্থ রচনা হইতে বিরত হন নাই। ১৮৭১ সালে তাঁহার গদ্য আখ্যান 'হেক্টর বধ' প্রকাশিত হইলে তাঁহার আর একপ্রকার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। ইলিয়াড মহাকাব্যের হেক্টরের বীরত্ব ও মৃত্যুকাহিনী অবলম্বনে মধুসূদন একটু অদ্ভুত গদ্যে এই কাহিনী রচনা করেন। এই রচনা নিতান্তই পরীক্ষামূলক রচনা, তদুপরি তখন তাঁহার চারিদিকে অশান্তি ও নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাই এই গ্রন্থের রচনার মধ্যে একটা অব্যবস্থিত-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। 'হেক্টর বধে' ব্যবহৃত তাঁহার পরিকল্পিত নামধাতুবহুল গুরুগম্ভীর কৃত্রিম গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই।

মধুসূদন মাত্র সাত বৎসর (১৮৫৯—১৮৬৬) বাংলা সাহিত্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে বাংলাভাষায় তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। অনেকে তাঁহার কৈশোর-যৌবনকালের ইংরাজী কবিতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেরূপ রচনা বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘনীয় হইলেও কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট নহে। মধুসূদনের বিচিত্র বিপ্লবী প্রতিভা এই সাত বৎসরেই আশ্চর্যভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মাইকেলকে স্বল্পতম অবকাশে নিজের কাব্যশক্তি বিকশিত করিতে হইয়াছিল। অতিশয় দ্রুততা, পারিবারিক দুশ্চিন্তা এবং নানা বিপর্যয়ে তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তিনি মানসিক শান্তি পাইলে এবং আরও একটু নিশ্চিন্ত হইলে হয়তো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে চিরদিন পূজিত হইতেন। অথবা এই দুঃখ-লাঞ্ছনা অশান্তির মধ্য দিয়াই হয়তো তাঁহার কাব্যশক্তি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। মধুসূদন মৃত্যুর পূর্বে সমাধিস্তম্ভের জন্য স্মারকলিপি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমধুসূদনের শান্ত বিষণ্ণ বিদায়মুহূর্তটি বেদনারসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের স্মৃতিফলক এখনও পথের পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে ঃ

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ॥

মাইকেল মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হেমচন্দ্র মহাকবিরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনার ভার পড়ে সে যুগের হিন্দু-কলেজের কৃতী ছাত্র হেমচন্দ্রের উপর। উক্ত কাব্যের ভূমিকা লিখিতে গিয়া হেমচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন ; সম্ভবতঃ তখনই তাঁহার মনে মহাকাব্য রচনার বাসনা উদিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই তাঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তখনই তিনি উদীয়মান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কাব্য। এই কাব্যের পশ্চাদ্-পটে একটা সত্য ঘটনা নিহিত আছে। সে যুগের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য এবং হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা কবির মনে গভীর রেখাপাত করে, যাহার ফলে এই কাব্যের উৎপত্তি। কাব্যটি অত্যন্ত অপরিপক্ব—কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। ইহা অনেকদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। তাই কাব্যটির শিল্পগুণ না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আমাদের কবি শিক্ষিত পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র কয়েকখানি আখ্যানকাব্য এবং দুইখানি রূপককাব্য প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত দেশপ্রেমমূলক কাব্য। একমাত্র স্বাদেশিক আবেগ ব্যতীত এ কাব্যের প্রায় কোন অংশই সুখপাঠ্য নহে। 'ছায়াময়ী' (১৮৮০) দান্তের 'দিভিনা কোমেদিয়া' অবলম্বনে রচিত রূপককাব্য। ইহাতে কাব্যধর্ম ও রূপকধর্মের সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষ সার্থক হয় নাই। 'আশাকানন' (১৮৭৬) আর একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। নীতিতত্ত্বের চাপে ইহাও সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইহাতে প্রাচীন পুরাণকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের রূপকের দ্বারা ব্যাখ্যার প্রয়াস লক্ষণীয়। হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরে রচিত এই কাব্যের "রে সতী, রে সতী, কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ" কবিতাটি বাঙালী পাঠকের সুপরিচিত। প্রাচীণ পুরাণকথা ও দশমহা-বিদ্যাকে বিবর্তন তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারাই জয়যুক্ত হইয়াছে। এই শতাব্দীতে প্রাচীণ পুরাণ ও ঐতিহ্যকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা শোধন করিয়া গ্রহণ করা হইতেছিল। দশমহাবিদ্যার রূপক কতকটা সেই জাতীয়। এই কাব্যে পত্নীকে হারাইয়া মহাদেব বিলাপ ও বেদনার মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। অবশ্য আধুনিক রূপকের সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার

পুরাপুরি সামঞ্জস্য দেখান সম্ভবপর হয় নাই। এই খণ্ডকাব্যগুলি ছাড়াও তিনি শেক্স্পীয়রের দুইখানি নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন—'নলিনীবসন্ত' (১৮৭০) অর্থাৎ *Tempest*-এর অনুবাদ এবং 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৯৫)। এই অনুবাদ মূলতঃ ভাবানুবাদ হইলেও আদৌ সুখপাঠ্য নহে; ইহার অভিনয়ও যে হাস্যকর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমচন্দ্র সাধারণ স্তরের চরিত্রগুলির সংলাপ ও আচার-আচরণে স্থূল বাস্তবতার হুবহু অনুকরণ করিয়াছিলেন, যাহা শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য নহে।

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড—১৮৭৫, ২য় খণ্ড—১৮৭৭) তাঁহাকে কবিমর্যাদায় মাইকেলের পরেই স্থান দিয়াছে। এদেশে তিনি মহাকবিরূপেই অধিকতর পরিচিত এবং তাঁহার যশোভাগের প্রায় সমস্তটাই 'বৃত্রসংহারে'র উপর নির্ভর করিতেছে। বৈদিক কাহিনী ও পুরাণে আছে, দেবদ্রোহী পরম শৈব বৃত্র কর্তৃক স্বর্গ হইতে দেবতাদের বিতাড়ন, দধীচি মুনির আত্মত্যাগের ফলে তাঁহার অস্থি হইতে বজ্রনির্মাণ এবং সেই বজ্রের আঘাতে দুরন্ত অসুর নিহত হইলে স্বর্গরাজ্য আবার দেবতাদের অধিকারে গিয়াছিল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া কবি হেমচন্দ্র বিশাল পটভূমিকায় চতুর্বিংশ সর্গে দেবাসুরের বিরাট সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রামরূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যের যথার্থ স্বরূপটিকে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। মহাদেবের বরে উদ্ধত বৃত্রাসুর ন্যায়নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পত্নী ঐন্দ্রিলার নীচ উত্তেজনায় ইন্দ্রাণী শচীকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিতে দ্বিধা বোধ করিল না এবং ইহাতেই শোচনীয় অধঃপতন আরম্ভ হইল। বৃত্র বজ্রাঘাতে নিহত হইল, তাহার বংশ ধ্বংস হইল। দাম্ভিকতা ও নীচ ঈর্ষার প্রতীক ঐন্দ্রিলা পাগলিনী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। কাজেই এই মহাকাব্যে পুরাপুরি poetic justice বা ধর্মের জয় ও অধর্মের পতন বর্ণিত হইয়াছে। কবি যখন মধুসূদনের কাব্য সমালোচনা ও ভূমিকা লিখিতেছিলেন, তখন তিনি মাইকেলের কাব্যের শব্দ, ছন্দ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি, বৈষম্য ও পরস্পর-বিরোধী ভাব লক্ষ্য করেন; এই সমস্ত ত্রুটি দূর করিয়া এবং পৌরাণিক কাহিনীকে স্বদেশপ্রেমের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া তিনি জাতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে এই বিরাট মহাকাব্য রচনা করেন। সত্যকথা বলিতে কি, 'বৃত্রসংহারে'র আখ্যানভাগ নির্বাচন এবং ইহাকে কাব্যে প্রয়োগ করিবার জন্য হেমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কবির পরিমাণ-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। তদানীন্তন কালে মহাকাব্যের পটভূমিকায় জাতীয় ভাবের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য 'বৃত্রসংহারে'র কাহিনীগত বিশালতা ও বর্ণনাগত সংহতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আধুনিক কালের কোন আখ্যানকাব্য 'বৃত্রসংহারে'র সমকক্ষ নহে। মাইকেলের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বৃত্রসংহারে'র কবিকে যে সেই শূন্য সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ বোধ হয় 'বৃত্রসংহারে'র মহাকাব্যোচিত কাহিনীর বিশালতা। একদা তরুণবয়সে রবীন্দ্রনাথও কিঞ্চিৎ অশোভন উগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের

মহাকাব্যকে আক্রমণ করিয়া হেমচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, "স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থি দান, এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।" কিন্তু ঐ পর্যন্তই। একমাত্র কাহিনী বাদ দিলে 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যরূপে আধুনিক পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে না। হেমচন্দ্র মধুসূদনের ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়াছেন বটে ; কিন্তু রচনা, চরিত্র ও ঘটনা নির্মাণে তিনি মধুসূদনের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি, তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে প্রকাশ্যেই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আদর্শ অনুকরণ করিয়াছেন। বৃত্রের সহিত রাবণ, ইন্দ্রের সহিত রামচন্দ্র, রুদ্রপীড়ের সহিত মেঘনাদ, জয়ন্তের সহিত লক্ষ্মণ, ইন্দ্রাণীর সহিত সীতা, ইন্দুবালার সহিত সীতা ও প্রমীলার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কেবল ঐন্দ্রিলা চরিত্রটি কিয়দংশ মৌলিক ও সজীব —যদিও সে মহাকাব্যের চরিত্র না হইয়া নাটকের চরিত্রে পরিণত হইয়াছে।[৯] শেষ সর্গে তাহার উন্মাদ হইয়া যাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত অতিনাটকীয় হইয়াছে। তবু তাহার মধ্যে চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু অন্য চরিত্র পরিকল্পনায় হেমচন্দ্র কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সর্বোপরি ইহার ছন্দ, রচনারীতি, শব্দযোজনা আদৌ মহাকাব্যের উপযুক্ত নহে। মহাকাব্যে নানা ছন্দ ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি মহাকাব্যের গম্ভীর পরিবেশ লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিনির্ঘোষ ও বৈশিষ্ট্য তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পয়ারের মিল তুলিয়া দিলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয়। কবি-সমালোচক মোহিতলাল হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পরিহাস করিয়া 'মালগাড়ীর ছন্দ' বলিয়াছেন। মন্তব্যটা একটু কঠোর হইলেও অযৌক্তিক নহে। শব্দযোজনায় মহাকাব্যের গম্ভীর ও মহত্ত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি করিতেও কবি সমর্থ হন নাই। মাঝে মাঝে আবার মাইকেলী ধরনের শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গিমা ও অলংকার প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি ভাষারীতিকে আরও দুর্বল ও হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। মহাকাব্যের বিশালতা সৃষ্টিতে হেমচন্দ্র আদৌ সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহার প্রতিভার সেরূপ দিগন্তপ্রসারী সৃষ্টিক্ষমতাই ছিল না। তিনি যদি বাধ্য ছাত্রের মতো মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া নিজের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে আখ্যান কাব্য লিখিতেন, তাহা হইলে 'বৃত্রসংহার' হয়তো 'বীরবাহু কাব্যের মতো একখানা গতানুগতিক কাব্য হইতে পারিত এবং তাহাতে কবির স্বধর্ম রক্ষিত হইত। মহাকাব্যের বিশালতা (Epic grandeur) তাঁহার স্থূল চেতনাকে বিদ্যুৎস্পর্শে চমকিত করিতে পারে নাই। নিতান্তই রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের মতো ইহাতে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। ফলে নীতিবোধ শান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহাকাব্যের সমাধি হইয়াছে।

৯. কোন-এক সমালোচক মনে করেন, "কাব্যের নাম যদি 'ঐন্দ্রিলা পরাভব' রাখা হইত তবে হয়ত অন্যায় হইত না"। সমালোচকের এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ঐন্দ্রিলা বৃত্রের দুষ্ক্রিয়ায় ইন্ধন নিক্ষেপ করিলেও সে ঘটনাসূত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই, বা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রধান ঘটনা আবর্তিত হয় নাই।

মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এই কাব্যের বিশালতা ও মানবজীবনের মর্মন্তুদ নিয়তি আমাদিগকে স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্বাক করিয়া দেয়। হেমচন্দ্রের কল্পনার সে ভূলোকদ্যুলোকসঞ্চারী দিব্যশক্তি ছিল না। সেযুগে অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি মাইকেলকে ছাড়িয়া হেমচন্দ্রের অধিকতর গুণগান করিতেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তরুণবয়সে সেই একই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন। ইহার কারণ অনুধাবন করা দুরূহ নহে। মধুসূদন চিরাচরিত হিন্দুসংস্কারকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করেন নাই; জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি যে অভিনব মৌলিক কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সে যুগের অনেকেই তাহা মনে-প্রাণে মানিয়া লইতে পারেন নাই। উপরন্তু মধুসূদনের ভাষাভঙ্গী, শব্দযোজনা, বাক্‌নির্মিতিকৌশল প্রভৃতি অভিনব ব্যাপারকে অনেকে যেন দায়ে পড়িয়া প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা বরং হেমচন্দ্রের মোটাহাতের রচনা 'বৃত্রসংহারে'র বীররসাত্মক যাত্রার সুরের মধ্যে অনেক বেশি মানসিক স্বস্তি বোধ করিতেন। 'বৃত্রসংহার' সাধারণ স্তরের একটি heroic tale হইয়াছে মাত্র; অনেক মহৎ নীতিকথা, বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ, অদ্ভুত বর্ণনা থাকিলেও এই বৃহৎ কাব্য পাঠকমনে উচ্চতর ভাবকল্পনা সঞ্চারে বিশেষ সমর্থ হয় নাই। একমাত্র দধীচির তনুত্যাগ এবং বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনায় কবি কথঞ্চিৎ মুন্সিয়ানা দেখাইতে পারিয়াছেন। সে যাহা হউক, 'মেঘনাদবধে'র তুলনায় 'বৃত্রসংহার' দুর্বল রচনা হইলেও হেমচন্দ্র মহাকাব্যের বাহিরের কলাকৌশল ভালই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; শুধু রচনাশক্তির দুর্বলতা, গভীর অনুভূতির স্বল্পতা এবং বৃহৎ জীবনবোধের অভাব ছিল বলিয়া হেমচন্দ্র এই বিশালকায়, মহাকাব্যের মর্মগূঢ় স্বরূপ ফুটাইতে পারেন নাই। অবশ্য মধুসূদনের পরেই যদি কাহাকেও মহাকবির আসনে বসাইতে হয়, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

মহাকাব্য হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বিশেষ সার্থক না হইলেও হেমচন্দ্রের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা এবং লঘুচালের বৈঠকী কবিতার ('Vers de Societe') জন্য তিনি প্রচুর প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাব্য রচনার চেষ্টা চলিলেও এই যুগ মূলতঃ গীতিকাব্যের যুগ, এবং যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে মহাকবি বলিয়া যশঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আসলে ছদ্মবেশী গীতিকবি। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। তাঁহার তিনখানি গীতি-কবিতা-সংগ্রহ—'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড (১৮৭০), ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮০) এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) সার্থক গীতিকবিতা-সংকলন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্র ইংলণ্ডের 'রোমান্টিক রিভাইভাল' যুগের গীতি-কাব্যধারার সুরসিক পাঠক ছিলেন এবং লঙ্‌ফেলো, শেলী, কীটস্‌-এর অনেক কবিতা[১০] অনুবাদ করিয়াছিলেন। পোপ, ড্রাইডেনও তাঁহার বিশেষ প্রিয়কবি ছিলেন।

১০. লঙ্‌ফেলোর *Psalm of Life* অবলম্বনে 'জীবনসঙ্গীত', শেলীর *Sensitive Plant* অবলম্বনে 'লজ্জাবতী লতা', *Skylark* অবলম্বনে 'চাতক পক্ষীর প্রতি' এবং টেনিসনের *the Lotos-Eaters* অবলম্বনে 'কমলবিলাসী কবিতা' রচিত হয়। এ বিষয়ে ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গীতিকাব্য' দ্রষ্টব্য।

অবশ্য অনুবাদগুলির অধিকাংশই শুধু আক্ষরিক অনুবাদ হইয়াছে ; হেমচন্দ্র বিদেশী কবিদের মনঃপ্রকৃতিকে যথার্থতঃ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। পাঠ্য-পুস্তকের কল্যাণে লঙ্ফেলোর *Psalm of Life*-এর অনুবাদ "জীবনসঙ্গীত" কবিতাটি ("বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে, এ জীবন নিশার স্বপন") বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। অন্যত্র তিনি অনুবাদে কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। শেলীর *To a Skylark* কবিতা "Hail to thee, Blithe, spirit, Bird thou never wert"-এর অনুবাদ হইয়াছে ঃ

কে তুমি বলরে পাখী,
সোনার বরণ মাখি
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে
এতসুখে মধুমাখা সঙ্গীত শুনাও।

অনুবাদে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা না থাকিলেও পাশ্চাত্ত্য ধরনের ব্যক্তিগত গীতিকবিতায় তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত গীতিকবিতা একদা বাংলাদেশের শিক্ষিত জনের প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল।
যেমন—

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে ;
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে !
('হতাশের আক্ষেপ')

বিখ্যাত 'ভারতসংগীত' কবিতায় পরাধীন ভারতবাসীর দাসমনোবৃত্তির প্রতি কবির সুকঠোর ধিক্কার অতি উপাদেয় হইয়াছে—

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি।
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে ?

অথবা শেষ জীবনে পীড়িত অন্ধ কবির খেদোক্তি—

বিভু কি দশা হবে আমার।
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
পুলকিত করিবে সকলে।
আমারি রজনী শেষ হবে নাকি হে ভবেশ,
জানিব না, দিবা কারে বলে ?

পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। যদিও কবির লীরিক অনুভূতি, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্রকল্প শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ, তবু তাঁহার ব্যক্তিগত মনের বাসনা-কামনা কোন কোন কবিতায় অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার গীতিকবিতাগুলির কিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

সর্বশেষে হেমচন্দ্রের সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা উল্লেখ করা যাইতেছে। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন তাঁহার সমকালীন কলিকাতার নাগরিক জীবন অবলম্বনে ব্যঙ্গ-পরিহাসের

সাহায্যে কিছু কিছু লঘুধরনের উৎকৃষ্ট সামাজিক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি হেমচন্দ্রও গুপ্তকবির আদর্শ অনুসরণ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নাগরিক কলিকাতার দলাদলি, কর্পোরেশন লইয়া ঘোঁট, ভোটাভুটির হাস্যকর বাড়াবাড়ি, স্ত্রীশিক্ষায় পাশ্চাত্ত্য রীতির আতিশয্য প্রভৃতি বিষয়ে অম্লমধুর বিদ্রুপের ছিটা দিয়া স্বরাঘাত-প্রধান চটুল ছন্দে উপভোগ্য ছড়া বাঁধিয়াছিলেন। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

১. হায় কি হলো দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারতবাসীর পরে।
সবাই 'লীডা'র—কর্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,
কত দিকে তুলচে কতো কতই তর সুর।

২. সফেদ-কালা মিশ খাবে না—সমান হওয়া পরে,
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু করে ?

৩. পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা,
তাদের আবার 'এজিটেশন' নরুণ উঁচু করা !

এই সমস্ত কবিতায় একদিকে যেমন রঙ্গব্যঙ্গের তির্যকতা রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি স্বাদেশিক ও সামাজিক হেমচন্দ্রের মনের গঠনটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তকে ছাড়িয়া দিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রঙ্গব্যঙ্গ কবিতায় হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের মতোই স্মরণীয়। যদিও তিনি হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তবু বাংলা কাব্যে তাঁহার খ্যাতি হেমচন্দ্রের সমতুল্য বলিতে হইবে। সুদূর চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় কলেজী শিক্ষা লইতে আসিয়া নবীনচন্দ্র কলিকাতার অভিজাত সমাজ ও সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল এবং নিতান্ত তরুণ বয়সে কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় তাঁহার কিছু কিছু কবিতা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবি বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া বাংলা ও বাংলার বাহিরে ঘুরিয়াছেন ; এই অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্যজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। নবীনচন্দ্রকে আমরা মহাকবি বলিয়া জানি বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতায়।

কবি নবীনচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল গীতিকবিরূপে। 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে (১ম খণ্ড—১৮৭১, ২য় খণ্ড—১৮৭৮) তাঁহার প্রথম যৌবন ও উত্তর-যৌবনের গীতিকবিতাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। গীতিকবিতার আদর্শ ধরিয়া বিচার করিলে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় সার্থক গীতিসুরমূর্ছনার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। গীতিকবিতায় কবিচেতনার অন্তর্গূঢ় বাণী ফুটিয়া ওঠে ; "intense

personal emotion" বা সুতীব্র ব্যক্তিগত অনুভূতিই গীতিকবিতার প্রাণ। নবীনচন্দ্রের সমগ্র কবিজীবন ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি ও সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হেমচন্দ্র প্রথমে ততটা আত্মসচেতন গীতিকবি ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রভাবে গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের গীতিরসসিক্ত কবিচেতনা তাঁহার নিজস্ব স্বভাবের অনুকূল—বাহির হইতে আমদানি করা হয় নাই। এই গীতিকবিতাসংগ্রহে প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম ও গার্হস্থ্য জীবন —মোট এই কয়টি রোমান্সধর্মী বিষয় লইয়া তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা লিখিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু, পারিবারিক দুশ্চিন্তা, আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা প্রভৃতি তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর কবি-মানসটিকে পীড়িত করিয়াছিল, এবং এই পীড়িত মনের বেদনা লঘু করিবার জন্য তিনি কয়েকটি ব্যক্তিগত কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাই এগুলির আন্তরিকতা স্মরণীয়। যেমন 'পিতৃহীন যুবক', 'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙালী যুবক'।

গীতকবির ব্যক্তিগত অনুভূতি গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষ্য হইলেও ব্যক্তিগত মনোভাব বাস্তব ভূমি ছাড়াইয়া বিশ্বগত না হইলে গীতিকবিতার ব্যক্তিগত 'অহং (Ego) প্রবেশ করে। নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতায় এই ত্রুটি লক্ষণীয়। তাঁহার কোন কোন কবিতা এতই ব্যক্তিগত যে, তাহা কদাচিৎ গীতিরসের উদারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। তবে প্রকৃতি ও প্রেমকে অবলম্বন করিয়া রচিত তাঁহার কয়েকটি কবিতা বাস্তবিক প্রশংসা দাবি করিতে পারে। যেমন—

নিবুক নিবুক প্রিয়ে, দাও তারে নিবিবারে
আশার প্রদীপ।
এই তো নিবিতেছিল, কেন তারে উজলিলে—
নিবুক সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে। (উত্তর)

এখানে রোমাণ্টিক প্রেমের নৈরাশ্যযন্ত্রণা চমৎকার ফুটিয়াছে। তাঁহার স্বাদেশিক অনুভূতিও কয়েকটি গীতিকবিতায় স্থান পাইয়াছে। আমাদের মনে হয়, নবীনচন্দ্র মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য না লিখিয়া যদি গীতিকবিতায় অধিকতর নিষ্ঠা দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই আমরা তাঁহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আভাস পাইতাম। অবেগের ঋজুতা, প্রকাশসৌষ্ঠব, ভাষা ও ছন্দের উপর অধিকার—গীতি-কবিতার প্রধান লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহার কয়েকটি কবিতাকে পরিপূর্ণ গীতিধর্মী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যুগের প্রভাবে নবীনচন্দ্র মহাকবি হইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মূলতঃ তাঁহার প্রতিভা গীতিকবির প্রতিভা, মহাকবির প্রতিভা নহে। তাঁহার রচনার মধ্যে যেটুকু গীতিপ্রবর্তনাসম্ভূত, শুধু সেইটুকুই কালের নিকষপাথরে স্বর্ণরেখার মতো বিরাজ করিবে।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে যেমন কীটস্‌সুলভ সৌন্দর্যপিয়াসী গীতি-রসোচ্ছ্বাস রহিয়াছে, তেমনি আবার 'ডনজুয়ান' ও 'চাইল্‌ড্‌ হেরল্‌ড্‌'-এর কবি বায়রনের সঙ্গেও

তাঁহার প্রতিভার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য তাঁহার তিনখানি কাব্যে লক্ষ্য করা যাইবে—'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) এবং 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। বায়রনের কাব্যের সেই জ্বলন্ত আবেগ, স্বদেশপ্রেম, অসংযত উচ্ছ্বাস এবং তীব্রতা নবীনচন্দ্রের রচনার বহুস্থানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়া খ্যাতির তুঙ্গ শীর্ষে আসন লাভ করিয়াছেন। সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফর-জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র হইতে কাব্যের আরম্ভ এবং সিরাজের পলাশীর প্রান্তরে পরাজয়, পলায়ন, পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন, সেখানে মীরনের নির্দেশে তাঁহার নিধন—মোটামুটি এইটুকু কাহিনী 'পলাশীর যুদ্ধে'র মূল বক্তব্য। তাহার মধ্যে ক্লাইভের ভূমিকা, দৃঢ়নিষ্ঠা, আসন্ন বিপদে অসংশয়ী মনোভাব এবং তাহারই সহিত অন্তরের নানা বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির চিত্রণ সুপরিকল্পিত হইয়াছে। একমাত্র ক্লাইভ ভিন্ন কোন চরিত্রই বিকশিত হইতে পারে নাই। যুদ্ধের বর্ণনার অনেক স্থানে বায়রণের অনুকরণ লক্ষ্য করা যাইবে, কিন্তু তাহাতে কবির কোন মুন্সিয়ানা ফুটে নাই। তবে ইহাতে স্বাদেশিক মনোভাবটি মহৎ বীর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মোহনলালের "কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ" উক্তি কবির স্বাদেশিক মনোভাবকেই বিষণ্নতার বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কবি এই কাব্যে বহু স্থলে প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান না করিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক রচিত পক্ষপাতদুষ্ট কাহিনীকেই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কাব্যটির ঐতিহাসিক মর্যাদা অনেকটা খর্ব হইয়াছে। কোথাও কোথাও তিনি ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের বল্গাহীন কল্পনার দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইয়াছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম কাব্যের গুণবর্ধক না হইয়া হানিকর হইয়াছে। তরুণ নবীনচন্দ্রের উত্তপ্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং তাহারই সহিত চরিত্রচিত্রণে শিথিলতা ও রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি 'পলাশীর যুদ্ধ'কে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাব্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

'ক্লিওপেট্রা' পূর্ণাঙ্গ কাব্য নহে, একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা মাত্র। ইহাতে ক্লিওপেট্রা, জুলিয়াস সিজার ও এ্যান্টনি-সংক্রান্ত কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু কাব্যটি কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। শুধু এক বিষয়ে কবি অসাধারণ উদার মনোবলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নীতিশাস্ত্র ঘাঁটিয়া স্বৈরিণী ক্লিওপেট্রাকে অসতী বলিয়া শাস্তি না দিয়া তাহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন। 'রঙ্গমতী' চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চলের একটি অসম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। কবি ইহাতে শিবাজীর প্রসঙ্গ আনিয়া কাব্যটিকে স্বাদেশিক গৌরব দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কাহিনী, চরিত্র ও বিবৃতিশক্তি—কোন দিক দিয়া ইহা বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে না।

নবীচন্দ্র মধ্যজীবনে হিন্দুর ধর্মকর্ম ও পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষ-জীবনীবিষয়ক কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। সেণ্ট ম্যাথুর গসপেল অবলম্বনে 'খৃষ্ট' (১৮৯১), বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে 'অমিতাভ'

(১৮৯৫) এবং চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে 'অমৃতাভ' (১৯০৯) রচিত হয়। 'অমৃতাভ' অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া কবি লোকান্তরিত হন। এই কাব্যগুলিতে মহাপুরুষদের পার্থিব জীবনকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে ; মনুষ্যত্বের গৌরব এই সমস্ত কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহাতে কবির কাব্যশক্তি খর্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাপুরুষের জীবনের উচ্চতর ভাবাদর্শের জন্যই কাব্য আদরণীয় হয় না, সমগ্র রচনাটি শিল্পরূপ লাভ করিতে না পারিলে মহত্তর আদর্শ সত্ত্বেও কাব্য অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। নবীনচন্দ্রের এই জীবনীকাব্যগুলি তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

নবীনচন্দ্র 'চণ্ডী' (১৮৮৯) এবং 'গীতা'র পদ্যানুবাদ (১৮৮৯) করিয়াছিলেন ; এই অনুবাদ আক্ষরিক হইলেও আদৌ সুখপাঠ্য নহে ; ভাষা ও ছন্দে তিনি নিন্দনীয় অবহেলা দেখাইয়াছেন। সে যুগের মনীষী-ব্যক্তিরা তাঁহার চণ্ডী ও গীতা অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও এই দুইখানি অনুবাদ কোনদিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি 'ভানুমতী' (১৯০০) নামক একটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের সাইক্লোনের পটভূমিকায় ভানুমতী নাম্নী এক বাজিকরের কন্যার কাহিনী এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয়। একমাত্র স্থানীয় নিসর্গ শোভা ও সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনা ভিন্ন ইহাতে নবীনচন্দ্র কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন না। কিন্তু পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার 'আমার জীবন' (১৩১৬-১৩২০) উনিশ শতকের আত্ম-জীবনী-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার বর্ণনা গল্প-উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষী। কবির মাতৃভূমি, কলিকাতার সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহাতে বিচিত্র ঘটনা ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। তবে কবি আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া বহু স্থানে নির্জলা আত্মস্তুতি ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি বলিয়া পরিচিত তাঁহার "ত্রয়ী" মহাকাব্য ('রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস') সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া একনিষ্ঠ পরিশ্রমের দ্বারা নবীনচন্দ্র পরিণত বয়সে পরস্পর-ঘটনাসম্পৃক্ত কৃষ্ণজীবনী বিষয়ক তিনখানি কাব্য রচনা করেন—'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)। 'রৈবতক' কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। "রৈবতক কাব্যে উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ" (প্রভাসের ভূমিকা)। বাংলা দেশের পাঠক ও সমালোচকগণ এই তিনখানি কাব্যকে একত্রে 'ত্রয়ী' মহাকাব্য বলিয়া থাকেন। তিনখানি বিভিন্ন সময়ে ও পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত হইলেও ইহার মধ্যে ঘটনার বিকাশ ও পরিণতি আছে বলিয়া ইহাদিগকে একসঙ্গে বিচার করা হয়। নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মোপলক্ষে কিছুদিন পুরীধাম ও রাজগিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পুণ্যভূমির তীর্থমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মন মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং ঐ সমস্ত মহাগ্রন্থ পাঠ

করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণজীবনবিষয়ক বিরাট মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি দেখিলেন যে, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থে কৃষ্ণের ভাগবতী লীলা ও অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও তদানীন্তন সমাজ-জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কটি তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদর্শের সঙ্গে কৃষ্ণজীবনের গূঢ় ঐতিহাসিক সংযোগ আবিষ্কার করিয়া সেই তত্ত্বানুসারে মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশ্য অনেকে (বঙ্কিমচন্দ্র) তাঁহাকে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ মহাভারত-ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রকে নূতন করিয়া লিখিতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র কবির অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন যে, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণজীবনবিষয়ক যে নূতন তত্ত্বকথা সন্নিবেশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মূল গ্রন্থের অনুগত নহে। নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য দেশ, সমাজ, নীতি ও দর্শনতত্ত্বের অধিকতর প্রভাব পড়িয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে এই কাব্যত্রয়কে "The Mahabharat of the Nineteenth Century" ("ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত') বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু ভাবাবেগে-বিবশ নবীনচন্দ্র কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, চৌদ্দ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এই "ত্রয়ী মহাকাব্য" রচনা করিলেন। জীবিতকালে তিনি মহাকবিরূপে প্রচুর সম্মান পাইয়াছিলেন এবং কবি হেমচন্দ্রের যশের অর্ধাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

'রৈবতকে' সুভদ্রা ও অর্জুনের পরিণয়, 'কুরুক্ষেত্রে' তাঁহাদের পুত্র অভিমন্যুর নিধন এবং 'প্রভাসে' যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে পুরাণের রোমাণ্টিক রূপান্তর নিতান্ত মন্দ হয় নাই; কিন্তু মহাকাব্যের কাহিনী-গঠন সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। তাঁহার ত্রয়ী কাব্যের তুলনায় হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র কাহিনী অনেক বেশি সার্থক। চরিত্রের দিক দিয়া কৃষ্ণ প্রধান চরিত্র হইলেও তিনি যেরূপ নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ ও প্রেমধর্মাবলম্বী, তাহাতে সমগ্র কাব্যের প্রায় কোথাও তিনি সক্রিয় হইয়া কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বা স্বাভিপ্রায়াভিমুখে পরিচালিত করিতে পারেন নাই। কবি মূলকাহিনী অপেক্ষা জরৎকারু-শৈলজা-দুর্বাসা-বাসুকির কল্পিত কাহিনী ও চরিত্রকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ একটা বিষম জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করিয়া গীতার নিষ্কামধর্ম প্রচার করেন; সেইজন্য বৈদিক উপাসক দুর্বাসা শূদ্রদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া এবং এক শূদ্রা নাগকন্যাকে (জরৎকারু) বিবাহ করিয়া কৃষ্ণ ও ক্ষত্রিয়সমাজের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কাব্যত্রয়ে কৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজদর্শন, নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াই যেন নূতন মানবধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার উক্তির সঙ্গে মিল্-বেন্থাম-কোঁতের সামাজিক তত্ত্বের অধিকতর সংযোগ লক্ষ্য করা যাইবে। পৌরাণিক কৃষ্ণ নিউটন ও ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং ম্যাৎসিনি, গারিবল্ডি,

কাভুর, বিসমার্কের রাষ্ট্রদর্শ অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিয়াছেন। সর্বোপরি তাঁহার ভক্তিতত্ত্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের আবেগধর্মের অকৃপণ উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে এইরূপ কালানৌচিত্যদোষ (anachronism) ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকেই এই কাব্যের তত্ত্বের দিকটাকে বিশেষ সমর্থন করেন নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, মহাকবিরা ইচ্ছামতো কাহিনীকে সাজাইয়া গুছাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া লইতে পারেন, কবিপ্রতিভার এইটুকু স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে এবং 'ত্রয়ী' কাব্যের নানাস্থানে যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য কবির প্রতি খড়্গহস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, নানা মৌলিকতা সত্ত্বেও এই 'ত্রয়ী' কাব্য রসনিষ্পত্তিতে সফল হইতে পারিয়াছে কিনা। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' পৃথক বা একত্রে, কোন দিক দিয়া মাহাকাব্যের পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে নাই। মাইকেলের মতো জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রতিভা ছিল না বলিয়া নবীনচন্দ্র পৌরাণিক ব্যাপারকে আধুনিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে আনিয়া ফেলিলেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রের মতো কাহিনীটিকে বিশাল রূপ দিতে পারেন নাই। চরিত্র ও ঘটনার মৌলিকতা বহু স্থলেই উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য হইয়াছে। সর্বোপরি তাঁহার বাচনভঙ্গিমা এত উচ্ছ্বসিত ও অসংযত এবং ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগে তিনি এত অসতর্ক যে, এই তিনখানি কাব্য পৌরাণিক আখ্যানকাব্য হিসাবে কথঞ্চিৎ সার্থক হইলেও মহাকাব্য হিসাবে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে তিনি যেখানে গীতিকবির মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, শুধু সেখানেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন। মধুসূদনের পর যে কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ শুরু হইল, নবীনচন্দ্র সেই যুগেরই প্রতিনিধি। প্রতিভার দিক হইতে তিনি গীতিকবির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া এই ত্রয়ী কাব্য মহাকাব্য হিসাবে সার্থক হইতে পারে নাই।

১৮৬১ সালে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয় এবং নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্যের শেষতম 'প্রভাস' ১৮৯৬ সালে মুদ্রিত হয়। কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসরের (১৮৬১—১৮৯৬) মধ্যে আরও কিছু কিছু মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহাকাব্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য কোন কাব্যগুণ লক্ষ্য করা যাইবে না। দীননাথ ধরের 'কংসবিনাশ' (১৮৬১), মহেশচন্দ্র শর্মার 'নিবাতকবচবধ' (১৮৬৯), ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর 'পাণ্ডবচরিতকাব্য' (১৮৭৭), বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জুনকাব্য' (১৮৭৫), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শক্তিসম্ভবকাব্য' (১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলনকাব্য' (১৮৭৩), গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভার্গববিজয়' (১২৮৪ সাল), হরগোবিন্দ চৌধুরীর 'রাবণবধ' (১৩০০ সাল) এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২ সাল) ও 'শিবাজী' (১৩২৫ সাল) কাব্যের নাম উল্লেখ করা যায়। এই তথাকথিত মহাকাব্যগুলির কোন কোনটিতে মধুসূদনের অনুসরণ, কোনটিতে-বা প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র ও সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা

যায়। প্রতিভা না থাকিলে রচনাবস্তু যে কিরূপ বিকট ও হাস্যকর হইয়া ওঠে, এই স্ফীতকায় মহাকাব্যগুলি তাহার শোচনীয় প্রমাণ ; যখন ইঁহারা মহাকাব্য রচনার পণ্ডশ্রম করিতেছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে একদিকে রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে, এবং অপর-দিকে ব্যক্তিহৃদয় হইতে উত্থিত গীতিকবিতায় কবিচেতনার মুক্তি ঘটিতেছিল। এই সমস্ত 'মহাকবি'র দল গতানুগতিক পন্থা ধরিয়া, যে-মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই দুর্বল হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, এমন কি বিংশ শতকের প্রথমেও অনেক কবি মহাকাব্য রচনার জন্য সাজসজ্জা করিয়া আসরে নামিয়াছিলেন। মহাকালের সম্মার্জনী আজ ইঁহাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট রাখে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যানকাব্য ॥

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেমন নূতন কাব্যধারা আবির্ভূত হইল এবং মধুসূদন-হেম-নবীন বাংলা আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যকে নব কলেবর দান করিলেন, তেমনি এই শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে রোমান্টিক প্রেম অবলম্বনে অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট গাথাকাব্য রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই গাথাকাব্য গীতিকাব্যকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। এই সমস্ত গাথাকাব্যে প্রায়ই একটি রোমান্টিক প্রণয়-আখ্যান প্রধান হইয়াছে। সেই দিক দিয়া ইহাতে বস্তুধর্মিতা (Objectivity) লক্ষ্য করা যাইবে। আবার কবিদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনা (Subjectivity) গাথাকাব্যের বস্তুগত সত্তাটিকে গীতিকাব্যের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলে। সেইজন্য ইহাতে একাধারে মন্ময়তা ও তন্ময়তা উভয় ধর্মই লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬) নামক আখ্যানকাব্যে এই বৈশিষ্ট্য সূচিত করেন। তারপর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক কবি উৎকৃষ্ট আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া কবিপ্রতিভার অশেষ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবনের কাব্যগুলিতেও এই রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) ॥ বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক গাথাকাব্যের সৃষ্টি করিলেও অক্ষয়চন্দ্রই এই শ্রেণীর কাব্যের বিশিষ্ট শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেন। চৌধুরী মহাশয় সে যুগের ইংরাজী সাহিত্যের গুণগ্রাহী সমালোচক ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সুযোগ্য সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে উল্লেখযোগ্য রচনাচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র আপনভোলা ভাবুক প্রকৃতির কবি ছিলেন বলিয়া কোনদিন যশ কামনা করেন নাই ; কাজেই তাঁহার কাব্যসাধনা লোকচক্ষুর অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার 'ভারত-গাথা'র (১৮৯৫) মধ্যে দেশপ্রেমমূলক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। তিনি শুধু

যে একজন সুকবি ছিলেন তাহা নহে, সে যুগে তাঁহার মতো মার্জিতরুচির কাব্য-সমজদার বড়ো কেহ ছিলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই কৈশোর-কালে-রচিত কবিতার জন্য অক্ষয়চন্দ্রের নিকট প্রচুর উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' (১৮৭৪) নামক আখ্যানকাব্য একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে নানা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া সরলা নাম্নী পিতৃহারা বালিকা এবং সুরেন্দ্র নামক যুবকের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী ঈষৎ শিথিল-গঠন হইলেও উৎকট আতিশয্য নাই বলিয়া পাঠের ব্যাঘাত হয় না। অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিভা প্রধানতঃ যে গীতিকবিতাভিমুখী তাহা এই রোমাণ্টিক আখ্যানকাব্য হইতেই জানা যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্য, দর্শন, শিল্পবিদ্যা, গণিত—সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের নানা বিভাগে তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল। ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। দেশের নানা মঙ্গলকর্ম ও জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তিনি প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির বিস্ময়কর প্রাচুর্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক চেতনার সঙ্গে একটা সরস কবিমন এবং পরিহাসরসিক সামাজিক সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাঁহার 'মেঘদূতের' (১৮৬০) পদ্যানুবাদে এবং 'কাব্যমালা'য়[১১] কবিশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা আখ্যানকাব্যে অমর হইয়া থাকিবেন তাঁহার রূপককাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণের' (১৮৭৫) জন্য। স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুইন'-এর আদর্শে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনা করেন। কবির স্বপ্নরাজ্যে যাত্রা, নানা বাধাবিপত্তি পার হইয়া কল্পনাসুন্দরীর সঙ্গে কবির মিলন—রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বটি বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য রূপকধর্মের সঙ্গে রোমাণ্টিক কবিপ্রাণ ও প্রথমশ্রেণীর শিল্পপ্রতিভা দ্বিজেন্দ্রনাথকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়াছে। রূপক, রূপকথা, সৌন্দর্যসৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় রহস্য, উদ্ভট শব্দ, চিত্র ও চিত্রকল্পে কল্পনার নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রায় অননুকরণীয়। 'স্বপ্নপ্রয়াণ সেই দিক দিয়া একক এবং অনন্যসাধারণ। তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে; দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তা তাঁহার কবিসত্তাকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের প্রতি তাঁহার আসক্তির বন্ধন ছিল না, অনেকটা নিষ্কাম নিরাসক্ত রসদৃষ্টি তাঁহার কবিত্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ফলে সমস্ত রচনা ও সৃষ্টিপ্রতিভার মধ্যে যথেষ্ট পূর্ণতা, পরিপূর্ণ বিকাশ এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না। মনে হয় কবি যেন অযুত ঐশ্বর্যকে হেলায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। তাই তাঁহার

১১. ১৯২০ সালে ইহার যে সংস্করণ বাহির হয়, তাহাতে 'যৌতুক না কৌতুক' (১২৯০) 'শুক্ল আক্রমণ কাব্য' (১২৯৬) প্রভৃতিও মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিচিত্র প্রতিভা সৃষ্টিকর্ম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই ; ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের একটা মস্তবড় ক্ষতি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭)॥ হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র তরুণ বয়সে কিছু কিছু প্রেমগীত ও স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখিয়া কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গীতিকবিতা 'চিত্তমুকুর' (১৮৭৮), 'বাসন্তী' (১৮৮০) এবং 'চিন্তা' (১৮৮৭) নামক গীতিকাব্য-সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছিল ; গদ্যেও তাঁহার লেখনী অতিশয় প্রাণবান ছিল। প্রেম, রোমান্স ও স্বাদেশিকতার এক উচ্চতর আদর্শলোকে তিনি বাস করিতেন। অন্তর্লোকের স্বপ্নস্বর্গ এবং বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা—এই দুইটি মিলাইতে না পারার বেদনা তাঁহার অনেক কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই রোমাণ্টিক অন্তর্দাহ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকেও দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছিল। অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব নিরসন করিতে না পারিয়া ঈশানচন্দ্র বিষপানে আত্মহত্যা করেন। 'যোগেশ' (১৮৮০) একখানি উৎকৃষ্ট রোমান্সধর্মী কাল্পনিক আখ্যায়িকা-কাব্য। বোধ হয় আবেগপ্রবণ কবির ব্যক্তিগত কাহিনী এই কাব্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার উক্তি এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিতে পারে, "যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে ; যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস" ('যোগেশ' কাব্যের ভূমিকা)। স্বয়ং কবি ইহার নায়ক। আধুনিক জীবন ও ব্যক্তি যে রোমাণ্টিক আখ্যানকাব্যের বিষয় হইতে পারে ঈশানচন্দ্র তাহা প্রমাণ করিলেন। যোগেশ আধুনিক তরুণ যুবক ; সে নর্মদাকে বিবাহ করিয়াও মন্দাকিনী নাম্নী বিবাহিতা তরুণীর প্রতি নিজের দুদর্মনীয় কামনা গোপন করিতে পারে নাই। মন্দাকিনীকে অপ্রাপ্য জানিয়া সে গৃহত্যাগ করিল এবং মৃত্যুমুহূর্তে মন্দাকিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। মৃত্যুর পর অশুচি কামনার জন্য তাহার নরকবাস হইল। কাব্যের এই নীতিধর্মী উপসংহারটি আধুনিক পাঠকের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু ঈশানচন্দ্র ইহাতে বিবাহিতা নারীর প্রতি বিবাহিত পুরুষের কামনাকে যেরূপ সহানুভূতির সঙ্গে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে সে যুগে তাঁহার দুঃসাহসের প্রশংসা করিতে হইবে। শেষে যে তিনি অপবিত্র প্রণয়ের জন্য যোগেশকে নরকস্থ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিচেতনার সমর্থন ছিল না। সে যুগের নীতিবাগীশের দল কাব্যের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন আশঙ্কা করিয়াই কবি যোগেশের নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ফলে কাব্যরসের ভরাডুবি হইয়াছে। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে এই আবেগধর্মী আখ্যানকাব্যের সংযত রচনা বিশেষভাবে প্রসংসার যোগ্য।

এই যুগে রাজকৃষ্ণ রায় ('নিভৃতনিবাস'—১৮৭৮), শিবনাথ শাস্ত্রী ('নির্বাসিতের বিলাপ'—১৮৬৮), আনন্দচন্দ্র মিত্র ('হেলেনা' কাব্য—১৮৭৬) প্রভৃতি কবিগণ গীতিকবিতা ও আখ্যানকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আখ্যানকাব্যের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে এবং ধীরে ধীরে গীতিকবিতার প্রাধান্য স্বীকৃত হইতে

আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহাদের আখ্যানকাব্যে তাই গীতিকবির মনোভাব অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একখানি ব্যঙ্গ-আখ্যানকাব্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী লেখক ব্যঙ্গপরিহাস-রসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯১১) 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৭) একখানি প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্য। বাঙালীর বাক্‌সর্বস্ব আস্ফালন এবং বায়বীয় স্বদেশী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিয়া এরূপ তীব্র, বিদ্রূপপরিপূর্ণ উদ্ভট ধরনের কাব্য বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। ইতিপূর্বে জগদ্বন্ধু ভদ্র ১২৭৫ সনের বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় মধুসূদনকে ব্যঙ্গ করিয়া 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ লিখিয়া মহাকাব্যের ছাঁদে ব্যঙ্গকাব্যের সূচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কাব্যকে ইংরাজীতে Mock Heroic Epic বলে। ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' ব্যঙ্গবিদ্রূপে অতিশয় তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোথাও কুরুচিপূর্ণ নহে। 'ভারত সভা'র সদস্য বিপিনকৃষ্ণ ও কামিনীকুমারের ভারত হইতে ইংরাজ তাড়াইবার চেষ্টা এবং তাহার হাস্যকর পরিণতি কাব্যটিকে অতিশয় কৌতুকজনক করিয়া তুলিয়াছে। ছদ্মগাম্ভীর্যপূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিকে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ করিয়াছে। প্রথম সর্গে কবি সরস্বতীকে আহবান করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন ঃ

কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ?
হইল বয়স কত, বার্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলি কম্পিত হয়, কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরিতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সেদিন আছে? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন।
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওরে অবাধে।

কবি এইরূপ কৌতুকপূর্ণ হাস্য-পরিহাসের সাহায্যে বাঙালীর 'হুজুগে' স্বদেশী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা দেখাইয়া দিয়াছেন। কৃত্রিম মহাকাব্যের বীররসের আতিশয্যের বিরুদ্ধে এইরূপ ছদ্ম বীররসের কাব্য রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সূচনা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষের দিকে আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে। ইতিপূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা যে ছিল না তাহা নহে। বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৈষ্ণব পদ, শাক্ত পদ, বাউল গান—এই সমস্তই গীতিকবিতা। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে প্রাচীনকালের গীতিকবিতার একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। গীতিকবিতার মূলকথা—কবির "intense personal emotion"—অতি তীব্র ব্যক্তিগত অনুভূতি। যে সমস্ত খণ্ড কবিতায় কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করে, যেখানে সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি চিত্তচমৎকারী ভাষা ও শ্রুতিমধুর ছন্দের সাহায্যে রোমাণ্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই গীতিকবিতা (Lyric Poetry) বলে। একদা প্রাচীনকালে গীত হওয়ার উপরেই গীতিকবিতার প্রাণবস্তু নির্ভর করিত। কিন্তু পরবর্তী কালে গীতিকবিতা কবিতা হিসাবেই মর্যাদা পাইল, গীতাত্মক আকার ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইল। তবু গানের যে ধর্ম, তাহা এই গীতি-কবিতাতেও রহিয়া গেল। গায়ক যেমন সুরের মায়াজালে নিজ আবেগ-অনুভূতিকে শ্রোতার কানে পেঁছাইয়া দেন, তেমনি গীতিকবিও তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতায় বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কারণ প্রত্যেক কবি একটি বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে জগৎকে দেখিয়াছেন এবং সেইজন্য ব্যক্তিগত কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহাদের আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম অথবা শাক্ত তান্ত্রিকতার দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইয়াছিল। সেই ধর্মচেতন যুগে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কথা কেহ শুনিতে চাহিত না। আধুনিক কালেই গীতিকবিতার ব্যক্তিচৈতন্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের পূর্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-অবস্থায় দুটি-একটি গীতিকবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে বটে (যেমন—নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধর কথকের টপ্পা গান, ঈশ্বর গুপ্তের দু'একটি কবিতা), কিন্তু ১৮৬২ সালে মধুসূদন 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভাষার প্রতি' কবিতা দুইটিতে সর্বপ্রথম আত্মসচেতন গীতিকবিতার পত্তন করিলেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন মহাকাব্যের পুরা মরশুম চলিতেছে, তখন রোমাণ্টিক আখ্যানকাব্য ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে লাগিল। শুধু রোমাণ্টিক আখ্যান নহে, এই যুগে (১৮৬২-১৮৯৬) আধুনিক ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক গীতিকবিতার তীব্র অনুভূতি ও আবেগ পাঠকমনে বিস্ময় সঞ্চার করিতেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে নব্য ক্লাসিকতার বাঁধাবাঁধি নিয়মকে

অস্বীকার করিয়া কোলরীজ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৯৮ সালে *Lyrical Ballads* প্রকাশ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে গীতিকবিতার জয় ঘোষণা করেন। ১৭৯৮-১৮৩০ সালে—এই যুগের মধ্যে ইংরাজী গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ কবিগণ (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, স্কট, বায়রণ, শেলী ও কীট্‌স্‌) আবির্ভূত হইয়া কল্পনার বৈচিত্র্য, অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও সৌন্দর্যের অভিব্যঞ্জনাকে ব্যক্তিচিত্তে স্পর্শকাতর বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিলেন। ১৮৬২ সাল হইতে বাংলা দেশেও পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতার মতো বিশুদ্ধ মানবজীবনতন্ত্রী রোমান্টিক গীতিকবিতার আবির্ভাব হইল। কিন্তু ইংরাজী গীতিকবিতার সঙ্গে বাংলা গীতিকবিতার একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে; ইংরাজীতে যেমন নব্য ক্লাসিকতার (Neo-classicism) যুগ শেষ হইবার পর রোমান্টিক গীতিকবিতার যুগ আরম্ভ হইয়াছে, বাংলায় সেইরূপ হয় নাই। এখানে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য একই সময়ে ভিড় করিয়াছে। ১৮৬১ সালে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়; বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক আখ্যানকাব্য 'ললিতা তথা মানস' তাহারও পূর্বে ১৮৫৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা-সংগ্রহ 'সঙ্গীতশতক' প্রকাশিত হইলে গীতিকাব্যধারা মুষ্টিমেয় রসিকের রসদৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য (১৮৭৫), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসীন' (১৮৭৪), এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য' (১৮৫০) প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতকে'র (১৮৮৬) পূর্বেই বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' (বাংলা ১২৮১ সালে কিয়দংশ রচিত, ১২৮৬ সালে পূর্ণ কাব্যাকারে মুদ্রিত) প্রকাশিত হয়। সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য অথবা কৃত্রিম ক্লাসিকতা এবং অকৃত্রিম রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যে স্পষ্টতঃ যুগবিভাগ করা সম্ভব নহে।

এই যুগের গীতিকাব্যে কল্পনা, ভাষারীতি ও আবেগের একটা অভূতপূর্ব মুক্তির উল্লাস লক্ষ্য করা যাইবে। এতদিন ধরিয়া মহাকাব্যের বাঁধাদস্তুর পথে বাংলা কাব্য আধিপত্য করিতেছিল; কিন্তু মর্মরসিক কবিচেতনা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি গীতিকবিগণ অন্তর্গূঢ় জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপারকে পাঠকের হৃদয়গোচর করাইলেন। ইঁহাদের সকলেরই কাব্যে প্রকৃতিচেতনা, নারীচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা ও দেশচেতনার তীব্র অনুভূতি উপলব্ধি করা যাইবে। নিসর্গচিত্রকে জড়প্রকৃতিরূপে না দেখিয়া তাহার সঙ্গে চেতন মনের সম্পর্ক আবিষ্কার এবং গৃহচারিণী নারীকে রোমান্টিক স্বর্গের নায়িকারূপে গ্রহণ—প্রধানতঃ এই দুইটির সুর এই যুগের গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশা বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল; কাজেই এই যুগের গীতিকাব্যে স্বদেশপ্রেমের স্বল্প উত্তাপও উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু সমস্ত চেতনার

মূলে ছিল—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা উচ্চতর প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ এবং কল্পনার অতিরেক। যাহাকে রসিক সমালোচক বলিয়াছেন, "An extra-ordinary development of imaginative sensibility,"[১] অর্থাৎ কল্পনাপ্রধান চিত্তবৃত্তির অসাধারণ উৎকর্ষ—এই যুগে গীতিকাব্যে এই বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে অনুভূত হইবে।

এই গীতিকবিতার যুগের আর একটা প্রধান ব্যাপার—কাব্যক্ষেত্রে মহিলা কবিদের আবির্ভাব। ইতিপূর্বে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে অন্তঃপুরিকাদের সলজ্জ সংকুচিত পদচারণা লক্ষ্য করা গেলেও গীতিকবিতাতেই তাঁহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নারীজাগরণ ও সামাজিক বিকাশ-পরম্পরার দিক হইতে এই ঘটনার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখন আমরা সংক্ষেপে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গীতিকবিদের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)॥

বিহারীলাল আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম প্রবর্তয়িতা, এবং সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিদের গুরুস্থানীয়। কৈশোরে এবং যৌবনের কিছুকাল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন। যদিও কৈশোর কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের আখ্যানকাব্যগুলিতে অক্ষয় চৌধুরী ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবু ভাবাদর্শ ও রচনারীতির অনেক স্থলেই তিনি বিহারীলালকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সে যুগে বিহারীলালের কয়েকজন ভাবশিষ্য তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইলেও সাধারণ পাঠকসমাজে তখনও বিহারীলালের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতার মাধুরী প্রবেশ করে নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভক্ত কবি-শিষ্য অক্ষরকুমার বড়াল কবির সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন ঃ

এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,
কুহরিলে ধীরে ধীরে।
ঘুমঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্নবাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে॥

তাহা ছাড়া তখনও শিক্ষিত সমাজ গতায়ু মহাকাব্য লইয়াই মাতামাতি করিতেছিলেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১) তাঁহার কাব্যধারা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বিহারীলালের কাব্যের মূল সুর ধরাইয়া দেন। সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পর বিহারীলালের কাব্যের প্রতি শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরুকে 'ভোরের পাখী' নাম দিয়াছিলেন। ভোরের পাখী যেমন অন্ধকারের মধ্যেই সহসা কলরব করিয়া সূর্যের মাঙ্গলিক গাহিয়া ওঠে,

১. Herford—*The Age of Wordsworth.*

তেমনি বিহারীলালও সর্বপ্রথম আত্মভাবমূলক গীতিকবিতার সুর সৃষ্টি করেন; তবে সে সুর এত অস্ফুট যে, মোটা সুরের পিয়াসী পাঠকগণ তাহার সূক্ষ্ম অনুরণন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বিহারীলাল সংস্কৃত সাহিত্য এবং কিছু কিছু ইংরাজী কাব্যসাহিত্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন—বিশেষতঃ শেকস্‌পীয়রের নাটক এবং স্কট, বায়রন, মূরের কবিতা। তবে তিনি 'রোমাণ্টিক রিভাইভাল' যুগের ইংরাজ কবিদের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ—যদিও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরীজ-শেলী-কীট্‌সের সঙ্গেই তাঁহার প্রতিভার সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির ('সঙ্গীত শতক'-১৮৬২, 'বঙ্গসুন্দরী'-১৮৭০, 'নিসর্গ সন্দর্শন'-১৮৭০, 'বন্ধুবিয়োগ'-১৮৭০, 'প্রেম-প্রবাহিণী'-১৮৭১, 'সারদামঙ্গল'-১৮৭৯, 'সাধের আসন'-১৮৮৮-১৮৯৯ সালের মধ্যে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত, 'বাউল বিংশতি—১৮৮৭) মধ্যে একটি অনুভূতিপ্রবণ, সৌন্দর্যপিয়াসী, ভাবযুক্ত, প্রেমিক কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ প্রভৃতি 'লেক-কবিগোষ্ঠী'* যেমন প্রেম, সৌন্দর্য ও নিসর্গের মধ্যে অসাধারণ আনন্দময় মানসমুক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমাদের বিহারীলালও ঠিক অনুরূপ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য লীরিক কবিতা পড়িয়া তাঁহার মধ্যে এই বিচিত্র অনুভূতির আত্মপ্রকাশ ঘটে নাই। তিনি যেন জন্মসূত্রে এই লীরিক মনোভাবটি অর্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাব্যে সর্বপ্রথম আত্মনিষ্ঠ প্রকৃতিচেতনা বিকশিত হইল; ইতিপূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনা যে ছিল না তাহা নহে, তবে তাহাতে জড়প্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচে নাই, এবং মানবজীবনের পটভূমিকা হিসাবেই তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রকৃতির সঙ্গে মানবানুভূতির নিবিড়তর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০) এবং অন্যান্য কাব্যের নানাস্থানে প্রকৃতির সজীব মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিল—যাহার সহিত কবির যেন কতদিনের পরিচয়, কত আত্মীয়তা।

কবি বিহারীলাল আধুনিক যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতায় ব্যাকুল হইয়া জনসমাগম-বর্জিত উদার প্রকৃতির বুকে ফিরিয়া গিয়া আদিম জীবনের স্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন:

* স্কটল্যাণ্ডের পর্বত-উপত্যকা-সরোবর-শোভিত অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিতেন বলিয়া ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহারা 'Lake Poets' নামে পরিচিত।

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার।
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি,
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—
গিয়ে তার তীর তরুতলে
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

('বঙ্গসুন্দরী'—১৮৭০)

এখানে প্রকৃতির সঙ্গে জীবন-যন্ত্রণাপীড়িত কবির একটি নিবিড় আসক্তির যোগ স্থাপিত হইয়াছে, প্রকৃতি জীবনময় হইয়া কবিকে দু'বাহু মেলিয়া কাছে টানিয়া লইয়াছে।

প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে প্রেম ও সৌন্দর্যের এমন একটি অবিমিশ্র যোগ আছে যে, কবি নারীসৌন্দর্যকে গৃহজীবনের প্রেম ও প্রীতির মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গসুন্দরী'তে যে নারীচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নির্বিশেষ নারীবন্দনা নহে ; যে নারী প্রত্যহের সঙ্গে পরিচিত, গৃহচারিণী জননী, জায়া, প্রেয়সী—বাঙালী নারীর সেই প্রতিদিনের পরিচিত মূর্তিকেই কবি বিচিত্র সৌন্দর্য ও মানবসম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেমন বঙ্গনারীর বিরহিণী প্রেয়সীমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন ঃ

কে তুমি যোগিনীবালা, আজি এ বিরল বনে
বাজায়ে বিনোদ বীণা ভ্রমিছ আপন মনে।
গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ
বাধ বাধ স্বরতান, ধারা বহে দুনয়নে।

তেমনি আবার নারীর একটি পরিচিত মাতৃমূর্তির চমৎকার আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন ঃ

কোলে শুয়ে শুয়ে ঘুমায়ে শিশু,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে
নয়নের জলে জননী ভাসে।

বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'তে বঙ্গনারীকে সৌন্দর্যময় পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করিলেও তাহাতে একাধারে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা মিশ্রিত হইয়াছে।

ইহার পর বাংলা গীতিকাব্যে নারীচেতনা যে নূতনপথে যাত্রা করিল, তাহার সূচনা হইয়াছে—'বঙ্গসুন্দরী'তে। এই কাব্যের পর বিহারীলাল যে দুইখানি কাব্য রচনা

করেন ('সারদামঙ্গল'—১৮৭৯, এবং 'সাধের আসন'—১৮৮৮-১৮৯৯), তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুতঃ বিহারীলাল, 'সারদামঙ্গলে'র জন্য বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

'সারদামঙ্গল', বাহ্যতঃ আখ্যানধর্মী হইলেও ইহা কবিজীবনের একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের সম্পর্কই ইহার মূল বক্তব্য। কবির সারদা তাঁহার মানসলক্ষ্মী—সৌন্দর্য ও প্রীতির আধার। কবি কখনও সীমাবদ্ধ জগতে সঙ্কীর্ণ প্রতীকের সাহায্যে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন, কখনও-বা তাঁহাকে অসীম অনন্ত সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, কখনও বা রূপহীন, আকারহীন, অতীন্দ্রিয় ভাবরহস্যের (mystic) মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া সরস্বতীকে বৈদেহী চৈতন্যের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যখন তিনি দেবীকে সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যে পাইতে চাহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন; আবার যখন সারদার সন্ধানে অসীম সৌন্দর্যলোকে অভিসার করিয়াছেন, তখনও দেবীর বিরাট মহিমার কোন তল পান নাই। পরিশেষে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব ঘুচিল, কবি ও সারদা হিমাচলের পটভূমিকায় দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত, প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে মিলিত হইলেন। কবির এই শান্তস্নিগ্ধ মিলন-প্রতীতিটি চমৎকার ফুটিয়াছে:

মরুময় ধরাতল
তুমি শুভ শতদল
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার;
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে বসে থাকি
নয়ন পরাণ ভ'রে দেখি অনিবার!—
তোমায় দেখি অনিবার;
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার।

কবির প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা ইহাতে এমন একটা অভিনব তির্যকতা লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক কোন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সরস্বতী বন্দনা প্রাচীন ভারতীয় কবিদের একটা মামুলি প্রথামাত্র। সেই সারদাকে 'মর্মের গেহিনী' রূপে উপলব্ধি করিয়া কবি প্রাচীন প্রথাকে ভাঙিয়াছেন, কিন্তু নবীন গীতিকাব্যের শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

'সারদামঙ্গলে'র একটা তত্ত্বগত গূঢ় তাৎপর্য আছে। কবি সারদাকে সমগ্র সৃষ্টি-সৌন্দর্যের মূলাধাররূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই সারদা একদিকে অনন্ত বিশ্ব-সৌন্দর্যের শরীরী প্রতীক, আবার তিনি প্রেম-প্রীতি-করুণাপূর্ণ মানবরসেও

অভিষিক্ত। শেলী যাহাকে Intellectual Beauty বলিয়াছেন, আমাদের কবির কাছে তিনি সারদা। কিন্তু শেলীর সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের কবির সারদাতত্ত্বের মৌলিক প্রভেদ আছে। শেলীর নিকট সৌন্দর্য একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বমাত্র, এবং অনন্তবোধই সেই সৌন্দর্যের একমাত্র লক্ষণ। অপরদিকে বিহারীলালের সারদা শুধু বুদ্ধিসর্বস্ব অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক নহেন, স্নেহ-প্রেম-করুণাকে স্বীকার করিয়া তাহার মানবীরূপ সার্থক হইয়াছে। জার্মান ভাববাদ ও উইলিয়াম গডউইনের তত্ত্বদর্শনে লালিত শেলী অধরা-অনন্ত সৌন্দর্যকে বাস্তব জীবনের খণ্ডতা হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। অপরদিকে বিহারীলালের সারদা একাধারে বাস্তব নায়িকা—স্নেহপ্রেমে গঠিত, রোমাণ্টিক নায়িকার অপার্থিব লাবণ্যে বিচিত্ররূপিণী, এবং মীস্টিক রহস্য-ভারাতুর চেতনায় দুর্নিরীক্ষ্য। সুতরাং শেলীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াই সারদা-পরিকল্পনা করিয়াছেন, একথা পুরাপুরি সত্য নহে। আসলে তাঁহার মনটি আত্মভাবনিষ্ঠ গীতিরসে সর্বদা ডুবিয়া থাকিত। তাঁহার সারদা একেবারেই তাঁহার নিজস্ব মানসসম্ভূত ব্যাপার। দেশী বা বিদেশী কোন সাহিত্যতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে সারদার রূপ পরিকল্পিত হয় নাই।

'সাধের আসন' কাব্য 'সারদামঙ্গলে'র উপসংহার। বলা বাহুল্য, 'সারদামঙ্গলে'র সুরটি এমন ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বাংলাকাব্যে একান্ত অভিনব যে, সে যুগের অনেক রসজ্ঞ পাঠকই ইহার মূল তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। অবশ্য ইংরাজ কবি উইলিয়াম ব্লেক মীস্টিক রসের কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত মহল ব্লেক সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও নহে। ব্লেকের মীস্টিক চেতনা খৃীস্টান ধর্মাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং তাঁহার কবিতার স্বরূপ আবিষ্কার খুব একটা দুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু বিহারীলালের সারদাতত্ত্ব একেবারে বিশুদ্ধরূপে ব্যক্তিচিত্তের ব্যাপার। তাহার মূল স্বরূপ তো কোন বাঁধা প্রকরণ (pattern) অনুসরণ করে নাই। তাই সেযুগে কবির অনেক রসিক ভক্তও ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানী' কাদম্বরী দেবী কবির একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। তিনি একখানি সুদৃশ্য কার্পেটের আসন বুনিয়া কবিকে উপহার দিয়াছিলেন এবং উহাতে 'সারদামঙ্গল' হইতেই কয়েকটি পংক্তি লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই কয়ছত্রের মধ্যে একটা প্রশ্ন নিহিত ছিল। কাদম্বরী দেবী কবিকেই সারদা সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় জীবনাবসানের* পর কবি ব্যথিত চিত্তে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, 'সাধের আসন' নামটির মধ্যে সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। 'সারদামঙ্গলে' কবি বিহারীলাল রোমাণ্টিক সৌন্দর্য ও মীস্টিক তত্ত্বকে কবির দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন এবং 'সাধের আসনে' তাহাকেই তাত্ত্বিক ও টীকাকারের মতো ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাজেই কাব্য হিসাবে 'সাধের আসন' 'সারদা-

---

* কাদম্বরী দেবী পারিবারিক কারণে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মঙ্গল' অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে কবির ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির জন্য এই কাব্যটির বিশেষ মূল্য আছে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে। বিহারীলাল বাংলা গীতিকাব্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেও তাঁহার কবিতার বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা যায় নাই। তাহার কারণ তিনি কাব্যসৃষ্টিতে ততটা সার্থক হন নাই, যতটা হইয়াছেন নূতন রীতির প্রবর্তনে। তাঁহার কবিতার বহুস্থলে ছন্দের ত্রুটি, ভাষার দুর্বলতা, প্রকাশরীতির অপটুতা লক্ষ্য করা যাইবে। মনে হয় তিনি যেন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া কবিতা রচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যের রচনারীতি ও শিল্পসৌকুমার্য চিত্তাকর্ষক নহে। বহুস্থলে ভাব ও ভাষায় হাস্যকর অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হইবে; মনে হয়, তিনি যেন নিজেই কবি সাজিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, এবং পাঠক সাজিয়া স্বলিখিত কবিতা পাঠ করিয়াছেন। বাহিরের পাঁচজনে যদি শুনিতে চায়, তবে শুনিতে পারে; কিন্তু তাহাদের প্রতি কবির কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। কবি সদাসর্বদা এমন একটা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবরসের পরিমণ্ডলে বিহার করিতেন যে, সাহিত্যের যে-অংশটি সচেতন প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে তাহার প্রতি তাঁহার আদৌ কোন আকর্ষণ ছিল না। ফলে তাঁহার কবিতা শিল্পকর্ম হিসাবে বহুস্থলে ব্যর্থ হইয়াছে।[১] বিহারীলাল কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক নহেন, নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন বলিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)॥

কবি সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্যপ্রভাবের কিঞ্চিৎ বশবর্তী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তিনি বিশুদ্ধ গীতাকবিতা অপেক্ষা ছোট ছোট আখ্যানকাব্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'সবিতা-সুদর্শন' (১৮৭০) এবং 'ফুল্লরা (১৮৭০) দুইখানি আখ্যান কাব্যই বিয়োগান্ত। তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গিমা আদৌ উচ্ছ্বসিত বা তরল নহে। তাঁহার প্রগাঢ় ভাষাবন্ধ ক্লাসিক বাক্‌রীতিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি আরও কিছু ছোট ছোট কবিতা, গদ্যপ্রবন্ধ এবং টডের 'রাজস্থানে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা একটি দীর্ঘ কবিতা ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতিভার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সুরেন্দ্রনাথ কৈশোরে গুপ্ত কবিকে অনুসরণ করিতে গিয়া কবিপ্রতিভাকে বিপথে চালিত করিয়া-

১। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দার্শনিক-কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবি-স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বিহারীলালের হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন।" কিন্তু এই মন্তব্য বোধ হয় যথার্থ কবি-সমালোচনা নহে। রচনাতেই কবিত্বের যথার্থ প্রকাশ, 'নীরব কবি' কথাটা পরস্পর-বিরোধী। কবির যাহা কিছু গৌরব তাহা তাঁহার সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই নিহিত থাকিবে। না থাকিলে,বুঝিতে হইবে, কবির চিত্তপ্রকরণের মধ্যে কোথাও-না-কোথাও কোনওপ্রকার ত্রুটি আছে।

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'মহিলা কাব্য'[২] প্রকাশিত হইলে সকলে তাঁহার গীতিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবন নানা নৈতিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি সদ্‌জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তামসিক জীবনের ক্লেদাক্ত ঘটনাবর্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়া পাইয়া তিনি নারীচরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করিলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) কাব্যের নারীস্তুতি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে ১৮৭১ সালে তিনি মহীয়সী মহিলার বিভিন্ন সামাজিক রূপ অবলম্বনে কয়েকটি নারীচরিত্র অঙ্কন করেন। জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতা—বঙ্গনারীর চতুর্বিধ পারিবারিক মূর্তি বন্দনা করিয়া তিনি কাব্য লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। তন্মধ্যে 'জননী' ও 'জায়া' শীর্ষক প্রস্তাব দুইটি সমাপ্ত হইয়াছিল; 'ভগিনী' শীর্ষক প্রস্তাবের সামান্যমাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'দুহিতা' সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। জননী ও জায়া মূর্তির বন্দনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ নারীত্বের মহৎ স্বরূপ, পুরুষের জীবনে তাহার প্রভাব—এরূপ একটা নীতিতত্ত্বের অনুসরণ করিয়াছেন। সমাজজীবন, পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, অধ্যাত্ম উন্নয়ন প্রভৃতি গূঢ় দার্শনিকতা নারীবন্দনায় প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু পুরুষের হতচ্ছিন্ন জীবনের মর্মমূলে নারীশক্তির অমৃতনিষেকে মানবসংসারের বহিরঙ্গ যে নিত্যই পরিমার্জিত হইতেছে, এই শুভ আদর্শে কবি বিশ্বাসী ছিলেন। চিন্তা ও তত্ত্বে তিনি যেমন একটা অসংশয়ী নিঃস্পৃহ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, তেমনি ভাষা ও বাক্‌রীতিতেও একটি ঘনাপিনদ্ধ ক্লাসিক সংযম ও তৎসম শব্দানুকূল প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন। বাহির হইতে তাই তাঁহাকে রোমাণ্টিকধর্মী অপেক্ষা ক্লাসিকধর্মী বলিয়া মনে হয়। মননে ও আবেগে তিনি ক্লাসিকধর্মের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা আস্তিক্যবাদী মনোভাব, বিশ্বের ক্রমগতিতে বিশ্বাস, হাহাকার-বেদনার তারল্য অপেক্ষা সংযত বোধের সুগম্ভীর নিষ্ঠা তাঁহার কবিতাকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়াছে। শিল্পপ্রকরণ, আবেগ, সৌন্দর্যসৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহার প্রকৃতি রোমাণ্টিক গীতিকবিরই অনুকূল। ক্লাসিকতা ও রোমাণ্টিকতা, সৌন্দর্য ও তত্ত্ব, আবেগ ও মনন তাঁহার বিচিত্র কবিপ্রতিভাকে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থার কবি। বিহারীলালের রোমাণ্টিক স্বপ্নাভিসার এবং মীস্টিক আত্মলীনতা সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান লক্ষণ নহে। তবু প্রেম ও সৌন্দর্যই কবির আরাধ্য, নারীর গৃহচারিণী মূর্তির সঙ্গেই তাঁহার

২। ১৮৭১ সালে রচিত এবং কবির মৃত্যুর পর ১৮৮০ সালে প্রথম খণ্ড ও ১৮৮৩ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে এ কাব্যের কোন নাম দিয়া যাইতে পারেন নাই। কাব্যটি মুদ্রিত করিবার কালে প্রকাশকগণ কেন্দ্রীয় ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'মহিলা' নামকরণ করিয়াছিলেন।

অধিকতর পরিচয়। কল্পনার প্রগাঢ়তা, নিটোল বাক্‌রীতি এবং ছন্দের স্থির মন্থরতায় নিম্নোদ্ধৃত কয়েকছত্র সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হইতে পারে :

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীরশঙ্কায়
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়
হেরে উচ্চ রক্তশিখা প্রকাশিত তার,—
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা 'পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার।

তাঁহার মাতৃবন্দনায় যে আর্তি-আবেগ ফুটিয়াছে, তাহা পুরাতন বাংলা সাহিত্যের শাক্ত পদাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

সুকোমল অঙ্কে নিয়া
অঙ্গে কর বুলাইয়া
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযুষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায়!

ইহার ঘরোয়া ধরনের স্নেহভক্তিসিক্ত আবেগ অন্তরকে স্পর্শ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা কাব্যে'র বিশেষ স্বরূপটি প্রণিধানযোগ্য। যখন অন্য গীতিকবি রোমাণ্টিক আবেগের পথে অনন্ত প্রেম ও অসীম সৌন্দর্য সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ স্থির অচঞ্চল মননের দ্বারা জগৎরহস্যকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশুষ্ক জ্ঞানবাদের মারফতে নিজ অনুভূতিকে প্রকাশ করেন নাই, গীতিকবির আবেগ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যেই ক্লাসিক চেতনার পরিমিত ভাবমণ্ডলের মুক্তি দিয়াছেন। অবশ্য স্থানে স্থানে ভাবরীতির ক্লাসিক সংযম এত গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক সময়ে লীরিক সৌন্দর্য ও রসের মূর্চ্ছনা লাবণ্যের সুকঠিন স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে। সর্বোপরি কবির ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব দুর্বিপাক ও স্বপ্নসম্ভব কবিচেতনা—উভয়ের মধ্যে একটা বিষম অসংগতি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিশক্তি সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। তথাপি মননদীপ্ত গীতিকবি হিসাবে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কখনোই উপেক্ষিত থাকিবে না।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৭০-১৯১৯) ॥

কবি বিহারীলালকে গুরুপদে বরণ করিয়া অক্ষয়কুমার ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কাব্যের আসরে অবতীর্ণ হন এবং রবীন্দ্রযুগের গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কবিতা রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষয়কুমার অতিশয়

স্বাভাবিক বিষয়বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন ; সমাজ-সংস্কার, পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিলেন এবং সংসার-ক্লিষ্ট মনকে রোমান্স, প্রেম ও সৌন্দর্যের অনন্তলোকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো অক্ষয়কুমার বড়ালেরও বাস্তবজীবন ও ভাবজীবনের মধ্যে সুচিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব ঘনাইয়াছিল। তাঁহাকে সমগ্র জীবন ধরিয়া সেই বিপরীত-মুখী চিত্তসংকটের মধ্যে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতি, সৌন্দর্য, প্রেম—তাঁহার প্রায় সমস্ত কাব্যসাধনা প্রধানতঃ এই ত্রিতন্ত্রীতে অনুরণিত হইয়াছেন। এবিষয়ে তিনি তাঁহার গুরু বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং গুরুর করধৃত দীপশিখা হইতে আপনার অন্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। কাজেই গুরু-শিষ্যের কাব্যপ্রত্যয়ের মূলে কোন কোন দিক দিয়া কিছু সাদৃশ্য আছে। নিসর্গের বিষণ্ণ মাধুরী অংকনে আমরা অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকক্ষ বলিতে পারি। তাঁহার বর্ষাবিষয়ক কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতো এত ধ্বনিচিত্রময় না হইলেও একটি গভীর অনুভূতিপ্রবণ চিত্তের ব্যাকুলতা এই নিসর্গ কবিতাগুলিকে সার্থক করিয়াছে। প্রকৃতির পরে তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য্যের কবিতাগুলি উল্লেখ করা যায়। 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) এবং 'ভুল' (১৮৮৭) শীর্ষক তিনখানি গীতিকাব্যে প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি কবির মানস-রূপটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উহ্য করিয়া কীট্সের 'এণ্ডিমিয়নে'র মতো অধরা অনন্তের মধ্যে রোমাণ্টিক নায়িকার সন্ধান করিয়াছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনকে উপলব্ধি করিয়া তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট রোমান্স সৃষ্টি করিবার মতো দুর্লভ যাদুশক্তি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি গতানুগতিক রোমাণ্টিক পন্থা ধরিয়া বাস্তবাতিচারী কল্পকাননে পুষ্পচয়নে উৎসুক হইয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্যের কল্পনা বাঁধা-পথের হাহাকার, বিষণ্ণতা প্রভৃতি চিরাচরিত রোমাণ্টিক পন্হা অনুসরণ করিয়াছে। এখানে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিদের যথাযথ অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শেলী-কীট্স্‌কে আত্মসাৎ করিবার মতো প্রবল শক্তি তাঁহার ছিল না। অবশ্য 'ভুল' কাব্যের শেষের দিকে কবিচেতনার নূতন রূপ ও রসের সন্ধান লক্ষ্য করা যায়। কবি রোমান্সের বাঁধাপথ ত্যাগ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের বাতায়ন হইতে প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। 'শঙ্খ' (১৯১০) কাব্যেই তাঁহার নূতন পথের সন্ধান আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়িল ; কবি মানবজীবনের গভীরে অবতরণ করিয়া প্রেমকে প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন, জীবনকে ভালবাসিয়া জীবনেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইলেন। এতদিন ধরিয়া কবির ব্যর্থ স্বর্গানুসন্ধান শেষ হইল, তিনি মাটির বুকে নামিয়া আসিয়া পরিচিত জগতের মধ্যে বিপুল প্রাণৈশ্বর্য ও বিচিত্র রসলোকের স্বরূপ আবিষ্কার করিলেন।

অক্ষয়কুমারের সর্বশেষ কাব্য 'এষা' (১৯১২) বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শোক-কাব্যরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। বাস্তবিক 'এষা' কাব্যেই তাঁহার মনন, হৃদয় ও শিল্পচেতনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যাইবে। পত্নীর মৃত্যুর পর অকস্মাৎ তিনি মরণের আলোকে দিব্যজীবন প্রত্যক্ষ করিলেন। এতদিন তিনি কল্পনাজীবী নায়িকার সন্ধানে স্বপ্নলোকে বৃথাই ঘুরিয়া মরিয়াছেন। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর পর সহসা তিনি জীবনের সুকঠিন সত্য—মৃত্যুর মুখোমুখি হইলেন। জীবনের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাঁহাকে প্রতিদিবসের সহস্র কর্মজালজড়িত পুনরাবৃত্তির সম্মুখে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড় করাইয়া দিল। তিনি প্রিয়তমার চিতাভস্মের সামনে দাঁড়াইয়া ভগ্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন : "মরণে কি মরে প্রেম ? অনলে কি পুড়ে প্রাণ ?" 'এষা', কাব্যে তিনি 'মৃত্যু', 'অশৌচ, 'শোক' এবং 'সান্ত্বনা'—এই চারিটি পর্বে স্ত্রীর মৃত্যুব্যথাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। 'এষা' কাব্যে একাধারে মর্ত্যজীবনের নিবিড় বেদনা এবং মৃত্যুর পর পরবর্তী অমৃত-অশোক সান্ত্বনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই 'এষা'র দুঃখ শুধু পাণ্ডুর রোমাণ্টিক দুঃখ নহে, ইহার সহিত প্রতিদিনের বাসনাবন্ধের নিবিড় যোগ রাহিয়াছে। যিনি একদিন কবির গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, কবিকে যিনি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও পারিবারিক মমতায় ভরিয়া রাখিতেন, সেই কুলবধূ অকস্মাৎ কালসমুদ্রের কালো জলে হারাইয়া গেলেন। এই বিনষ্টি, শূন্যতা ও বাস্তব ব্যথা কবির রোমাণ্টিক চিত্তকে দুঃখ-পীড়নের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। কবি যখন আর্তস্বরে বলিয়া ওঠেন :

> হা প্রিয়া, শ্মশানদগ্ধা হও পরকাশ।
> ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি,
> তবু আছ—আছ তুমি !
> তুমি নাই, কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।

তখন তাঁহার শূন্য প্রাণের হাহাকার পাঠকের মনকেও অশ্রুভারাতুর করিয়া তোলে। পরিশেষে কবি পত্নীর সীমাবদ্ধ পার্থিব সত্তাকে অনন্তের সঙ্গে সমন্বিত করিয়া সান্ত্বনা পাইলেন :

> দাঁড়াও অভেদ্ আত্মা ! পরলোক-বেলাভূমে,
> বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।
> জগতের বাধাবিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক,
> নীরব সৌন্দর্য মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক।

'এষা' রচনার পূর্বে কবির মধ্যে একটা উগ্র অহংবোধ সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, কবি নিজেই আপনার চারিদিকে রোমান্সের সোনার জাল টানিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু 'এষা' কাব্যে স্ত্রীর চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর আত্মনিবেদনের ব্যাকুল আগ্রহে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। 'এষা' কাব্যের সমাপ্তিতে নির্বেদ-বৈরাগ্যের শান্ত বিষণ্ণতা কবির অশ্রু-কলুষিত বাস্তব জীবনের শূন্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কবি এই শোককাব্যে শুধু শোকের তামসিক

হা-হুতাশ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; টেনিসনের *In Memoriam*-এর মত শোক-দুঃখের অন্তরালবর্তী বৃহৎ চেতনার স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন। টেনিসন যেমন প্রিয়বন্ধু হালামের মৃত্যুর মধ্য দিয়া নবজীবনের সাক্ষাৎ পাইলেন, তেমনি অক্ষয়কুমারও পত্নীর মৃত্যুর পর সত্তার সীমাবন্ধন ঘুচাইয়া জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন।

অক্ষয়কুমার কবি বিহারীলালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও গুরুর নির্দ্বন্দ্ব সৌন্দর্য-চেতনার পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারেন নাই ; 'এষা'র পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার মনে সর্বদা একটা বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল, সংশয় কিছুতেই ঘুচিতেছিল না। কিন্তু 'এষা' কাব্যেই তাঁহার জীবন, প্রেম ও প্রবণতা সুস্থ ও স্বাভাবিক হইল। অবশ্য কবি অক্ষয়কুমার নানা শ্রেণীর গীতিকবিতা লিখিলেও ছন্দ ও শব্দচয়নে সর্বদা নিপুণ রুচির পরিচয় দিতে পারেন নাই—যদিও রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে অক্ষয়কুমারের কয়েকখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলিয়া (যাহাতে হলন্ত সিলেবল্ সর্বদা দুই মাত্রা) অনেক পংক্তিতে পুনঃপুনঃ ছন্দ-পতন লক্ষ্য করা যাইবে। শব্দপ্রয়োগ ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তিনি বিহারীলালের মতো অসতর্ক না হইলেও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারন নাই। রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগে আবির্ভূত হইয়াও তিনি বহুলাংশে পুরাতনপন্থী ছিলেন ; অবশ্য মাঝে মাঝে তিনিও রবীন্দ্রনাথের শব্দ প্রয়োগ ও বাক্‌রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় রহস্য ও অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তিনি বিহারীলালের সমকক্ষ নহেন। ভাষাগত ক্লাসিক শুচিতায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার অপেক্ষা অনেক সতর্ক। ভাবাবেগের তারল্য তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। আবেগকে সংযত করিয়া একটি সৃষ্টিশীল শিল্প-প্রকরণে আত্মস্থ হওয়ার মতো প্রতিভা অক্ষয়কুমারের ততটা না থাকিলেও রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগের পূর্বে পুরাতন রীতির গীতিকাব্যকার হিসাবে তাঁহার কিছু গৌরব স্বীকার করিতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫২—১৯২০) ॥

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, রবীন্দ্রনাথের বান্ধব এবং পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কর্তব্য-ব্যপদেশে বঙ্গের বাহিরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; কাজেই একটু দূরে বসিয়া নিজের মনের মনের মতো করিয়া কাব্যসাধনা করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া তিনি প্রথম জীবনে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং সেযুগের প্রধান পত্র-পত্রিকায় অজস্র কবিতা রচনা করিয়া উচ্চশিক্ষিত মহলে কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভাষা-প্রয়োগে এবং বিষয়বস্তু অনুসরণে মধুসূদনের কিঞ্চিৎ প্রভাব যে তাঁহার উপরে পড়ে নাই, তাহা নহে। যেমন 'ঊর্মিলা কাব্য' (১৮৮১), 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২), অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩)। তিনি নিজেও

বলিয়াছেন, "আমি পুরাতন স্কুলের—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের 'স্কুলের' কবি। এই রবীন্দ্রযুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।" কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক নহে—বরং রবীন্দ্রনাথের বাক্‌রীতি ও চিত্রকল্পের বিশেষ প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। তিনি মধুসূদন হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি, আবেগধর্ম এবং কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচার করিলে তাঁহাকে কোন কোন দিক দিয়া রবীন্দ্রযুগের কবি বলিতে হইবে। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিদের মধ্যে তাঁহার কবিতাতেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। কারণ তাঁহার অধিকাংশ কবিতাগুচ্ছ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সাদৃশ্য না থাকিলেও শব্দচয়ন, সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু প্রভাব তাঁহার কবিতায় লক্ষণীয়। তাঁহার বিশখানি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'নির্ঝরিণী' (১ ৮১), 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২), এবং 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩) উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার কাব্যের প্রধান সুর জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন তন্ময়দৃষ্টি। প্রকৃতি, প্রেম, নারী, সৌন্দর্য প্রভৃতি রোমান্টিক বিষয়বস্তু তাঁহার কল্পনাকে যেমন উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, তেমনি প্রত্যহের ঘর-সংসারের পরিচিত মাধুরীও তাঁহাকে অপূর্ব প্রীতিরসে ভরিয়া দিত। বস্তুতঃ, দেবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো; মহাশূন্যে উঠিয়াও সে শিশিরসিক্ত পৃথিবী এবং শান্ত নীড়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা উদ্দাম নহে, বিহারীলালের মতো অধরার পশ্চাতে ধাবমান হয় নাই, অক্ষয়কুমারের মতো নামরূপহীন, লাবণ্যমূর্তি গড়িয়া তাহার প্রেমে মুগ্ধ হয় নাই। নারী তাঁহার কাছে গৃহচারিণী জায়া ও জননীমূর্তি; প্রত্যহের অযুতকর্মের মধ্য দিয়া ম্লান বিবর্ণ দিনগুলি অতিবাহিত হইলেও কবি তাহারই মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনের রোমান্স উপলব্ধি করিয়াছেন। রোমান্টিক কবিসুলভ হতাশা প্রকাশ বা বিলাপ না করিয়া তিনি প্রসন্ন মনে সব কিছুকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একটি কবিতায় বলিয়াছেন:

চিরদিন, চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দ নেহারি।

এখানে কবির রূপাসক্তি সুইনবার্ণের মতো ইন্দ্রিয়াসক্তির তীব্রতর দাহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই, প্রশান্ত উপলব্ধির স্নিগ্ধতা কবিকে নিঃস্পৃহ বিশ্বরসিকে পরিণত

করিয়াছে। তাঁহার শিশুবিষয়ক কবিতাতেও তাই শিশুত্বের নির্যাস অপেক্ষা শিশুর কলহাস্যমুখর রূপটি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে—

ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে,
ওরে, ছেলেদের কি জাত আছে?

এই দুই পংক্তিতে তাঁহার বাৎসল্য-রসসিক্ত মনটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি সনেট বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সনেটও এত গাঢ়বদ্ধ নহে। মাইকেলের পরেই দেবেন্দ্রনাথের সনেট কারুকর্মের দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'তবু ভরিল না চিত্ত' ("মা") এবং 'হে অশোক, কোন রাঙা চরণচুম্বনে মর্মে মর্মে শিহরিয়া হ'লি লালে' সনেট দুইটি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। রচনার পরিমিত গঠন এবং আবেগের সংযম দেবেন্দ্রনাথের কবিতাকে একটা শান্ত, স্নিগ্ধ, গার্হস্থ্য জীবনের মাধুর্য দান করিয়াছে।

সম্প্রতি কোন এক সমালোচক দেবেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি শ্লথ এবং অসমান।" দেবেন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতাগুলি এই মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করিবে। রচনার প্রসন্ন পারিপাট্য ও পরিমিতি দেবেন্দ্রনাথের কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বরং অক্ষয়কুমারের রচনা, শব্দযোজনা ও স্তবকবন্ধে ক্লাসিক সংযম সত্ত্বেও ভাষারীতির শিথিলতা, ছন্দের ত্রুটি এবং কল্পনার গাঢ়তার অভাব তাঁহার কোন কোন কবিতার রসনিষ্পত্তিতে বাধা ঘটাইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে দেবেন্দ্রনাথ কবিতার বাক্-নির্মিতিকে বিশেষভাবে পরিমার্জনার অবকাশ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং যুগে বর্ধিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য প্রীতিরসের রোমান্টিক কবিতাগুলি এখনও পাঠকের মনে বিস্ময় সঞ্চার করিতে পারে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮) ॥

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিপ্রতিভা বাংলাদেশে যথেষ্ট আদরণীয় হয় নাই। অথচ তাঁহার মধ্যে যে তীব্র জীবনবোধ, আকণ্ঠ মর্ত্য-পিপাসা, ইন্দ্রিয়াসক্তির অসহ্য উল্লাস ধ্বনিত হইয়াছে, ইংরাজ কবি সুইনবার্ণের মধ্যেই তাহার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দেহঘটিত শুচিবাতিকের জন্য অনেক সমালোচক তাঁহার প্রতি নিদারুণ অবিচার করিয়াছেন। ভাওয়ালের অতি দরিদ্র কবি জীবনে একদিনও শান্তি পান নাই; অনশনে, অর্ধাশনে, বিনা চিকিৎসায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভাওয়ালের জমিদার ও জমিদারের কর্মচারীদের নিকট তিনি অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন; শেষ পর্যন্ত ভাওয়ালের দাম্ভিক শাসকগণ তাঁহাকে ভাওয়াল হইতে বিতাড়িত করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার প্রাণ বিনাশেরও ষড়যন্ত্র

করিয়াছিল। শেষ জীবনে পদ্মার গ্রাস এবং জমিদারের কবল হইতে বাস্তুভিটাকে বাঁচাইবার জন্য কবিকে প্রায় ভিক্ষাবৃত্তির মতো হীনতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিষয়কর্মে অনুৎসাহ, যে-কোন ব্যাপারে একাগ্রতার অভাব, তীব্র আত্ম-সম্মানবোধ ও স্বাদেশিক মনোভাব তাঁহাকে সুস্থ, স্বাভাবিক, নিয়মানুগ জীবন অনুসরণ করিতে দেয় নাই। ফলে আধুনিক কালের কোন সারস্বত সাধককে গোবিন্দচন্দ্রের মতো এত দুঃখ-নির্যাতন সহিতে হয় নাই। শেষজীবনে তাঁহাকে দাতব্যের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কবির সেই ব্যক্তিগত দুঃখ, রোমান্টিক প্রেমচেতনা ও নিসর্গপ্রীতি তাঁহার কাব্যকে বাংলা সাহিত্যে একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তাঁহার 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) এবং 'ফুলরেণু' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় কাব্য।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় অনাবৃত জীবনপ্রীতি, নারীর বাস্তব সৌন্দর্যের প্রতি সুস্থ ভোগাসক্তি এবং স্বাদেশিক আবেগ প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদা পথভিখারীর কণ্ঠে কণ্ঠে যে স্বদেশী গানটি গীত হইত[২], তাহা যে গোবিন্দচন্দ্রের রচনা তাহা অনেকেই জানিতেন না। তাঁহার কবিতার আর একটা প্রধান সুর, তীব্র দেহানুরাগ। বাস্তব পারিবারিক জীবনকে বাস্তব ভাবেই উপলব্ধি করিয়া প্রেমকে দেহের মধ্যেই মুক্তি দিয়া এবং দেহাসক্তিকে বরণমাল্যে অভিষিক্ত করিয়া গোবিন্দচন্দ্র বলিয়াছেন :

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি কালিদহ—
ও কর্দমে—ওই পঙ্কে,
ওই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ!
আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংস সহ।

এই বিশুদ্ধ 'হিডোনিস্ট্'[৩] কামসংহিতা ঊনবিংশ শতাব্দীর Mid-Victorian কবি, পাঠক ও সমালোচক সহ্য করিতে পারেন নাই। তবে শুচিবাতিকের বিবর্ণ চমশাজোড়া খুলিয়া ফেলিলে আমরা এই দুঃসাহসী কবিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইতে পারিব। এই জীবনবাদী বলিষ্ঠতা, ভোগবাদী পৌরুষ এবং তান্ত্রিকসুলভ বীরাচার—এই যুগে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। ইঁহার অল্প পরে রবীন্দ্রকাব্য দেশে অশেষ

২. স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়,—
এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে গোরাসৈন্যে জাহাজ কেন বয়!

৩. এই মতে ঐহিক সুখই একমাত্র সত্য।

জনপ্রিয়তা লাভ করে বলিয়া এই বিশুদ্ধ ভোগাসক্তির তীব্র আবেগ ক্রমে সূক্ষ্মতর অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে হারাইয়া যায়। পরবর্তী কালে কবি মোহিতলাল এই বৈশিষ্ট্যকে আরেকটি বিচিত্র দিক্ হইতে দর্শন করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হইলে এবং জীবনে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা পাইলে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর এক অভিনব প্রতিভাবান গীতিকবিকে পাইতাম। কবির শেষ জীবনের হতাশাব্যঞ্জক কবিতাগুলিতে একটা সকরুণ বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হইয়াছে। অসুস্থ কবি মৃত্যু-পথ হইতে ফিরিয়া আর্তস্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন, "কেন বাঁচালে আমায়?" কখনও মৃত্যুতীরে পেঁছাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, "দিন ফুরায়ে যায় রে, আমার দিন ফুরায়ে যায়।" অনশনে, রোগে, শোকে কবির তীব্র বাণী নিবিড় ব্যথায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে ঃ

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোস করি।
না খেয়ে শুকিয়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছটফট……
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

ব্যক্তিগত জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা, অশান্ত আকাঙ্ক্ষার এমন তীব্র প্রদাহ ঊনবিংশ শতাব্দী তো দূরের কথা, পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতেও এমন করিয়া কবি-চেতনাকে অবিরাম দুঃখদহনে অঙ্গারে পরিণত করে নাই। অবশ্য সার্থক গীতিকবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কথিত "emotions recollected in tranquillity" প্রয়োজন। আমাদের কবি সেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি হইতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন কবিতায় রচনাগত শিথিলতা লক্ষ্য করা গেলেও, "ছিল না সর্বত্র ভাবের সংযম এবং ভাষার বাঁধুনি"* একথা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। মাঝে মাঝে তাঁহার অশিক্ষিতপটুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মাত্রাবৃত্ত ও শ্বাসাঘাত ছন্দে তিনি সে যুগের পক্ষে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে যে 'স্বভাবকবি' বলা হয়, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার কবিপ্রেরণা কোন পোশাকী রোমান্টিক সংস্কার নহে, অন্নপান এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই কবিত্ব তাঁহার প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশমাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা-কবি ॥

পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহিলা গীতিকবির নাম উল্লেখ করিয়া আমরা গীতিকাব্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কয়েকজন

* কোন-এক সমালোচকের উক্তি।

মহিলা কবির (কৃষ্ণকামিনী দাসী, অনঙ্গমোহিনী দাসী, ঠাকুরাণী দাসী ইত্যাদি) কবিতা সযত্নে মুদ্রিত হইত। গুপ্তকবি কুলবধূদের অক্ষম কবিতাও ছাপিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। অবশ্য ইঁহারা সকলেই স্ত্রীজাতীয় কিনা সন্দেহ আছে। সর্বযুগেই নারীর বকলমে অনেক পুরুষ লেখক লেখা ছাপিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন মহিলা গীতিকবির কবিতা একদা পাঠকচিত্তে কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৫—১৯২৪) কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৬৫—১৯৩২) কবিত্বশক্তি প্রশংসার যোগ্য।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাধারণভাবে বিদ্যাভ্যাস করিয়া নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘরোয়া ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যম শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাষ' (১৮৯০), 'অর্ঘ্য' (১৯০২) প্রভৃতি কাব্যে কিছু কিছু সৃষ্টিকুশলতা লক্ষ্য করা যাইবে। বিশেষতঃ স্বামিবিয়োগের পর প্রকাশিত তাঁহার 'অশ্রুকণা' নামক কবিতা-গুচ্ছের রচনারীতি যেমন হউক না কেন, কবির প্রিয়জন-বিরহিত ব্যথাকাতর চিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি পাঠকের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা আকর্ষণ করিবে। স্বামী ও পুত্রকন্যাদের লইয়া প্রতিদিনের সংসারই তাঁহার অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু।

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত এবং শক্তিশালী হইতেছেন 'আলোছায়া'র কবি কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)। আধুনিক ধরনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পিতৃবংশ ও স্বামী-পরিবারের দিক হইতে প্রগতিশীল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক লাভ করিয়া কামিনী রায় পাশ্চাত্ত্য লীরিক রীতিতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা লিখিয়া বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা-কবির সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি কবিতাসংকলন ('পৌরাণিকী'—১৮৯৭, 'মাল্য-নির্মাল্য'—১৯১৩, 'অশোক সঙ্গীত—১৯১৪) এবং শিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকা সে-যুগে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিবিধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি নানা সংস্থার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'দীপ ও ধূপে' তাঁহার যাবতীয় কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাঁহার বহু কবিতা একদা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত: "গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার", "নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ এধরা কি শুধু বিষাদময় ?" "যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন", "তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা" প্রভৃতি পংক্তিগুলি এখনও একেবারে অপরিচিত মনে হইবে না। কামিনী রায় সর্বপ্রথম উদারতর পটভূমিকায় এবং বৃহত্তর চেতনার মধ্যে অবতরণ করিয়া গীতিকবিতার সীমা অনেক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর মতো শুধু ঘরোয়া পরিবেশই তাঁহার কবিতার প্রধান বিষয় নহে। অবশ্য রচনারীতিতে তিনি বিশেষ কোন নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই, নূতন পথের সন্ধানও করেন নাই। তাঁহার

কবিতার ছন্দ-সংক্রান্ত গ্রন্থটিও দুষ্প্রাপ্য নহে। তথাপি এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে কয়জন মহিলা-কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তিতে কামিনী রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪), 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪) প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া কিছু কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁহার কবি-প্রতিভার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের জীবনে বৈধব্যযন্ত্রণাই কাব্যের উৎস এবং প্রিয়বিয়োগবেদনাই শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সহজ গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ—সর্বোপরি মৃত স্বামীর স্মৃতিচারণা লইয়া মানকুমারী যে কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা অকৃত্রিম প্রাণের স্পর্শ আছে বলিয়া পাঠক তাহা হইতেও একপ্রকার সুখদুঃখের প্রীতিরস লাভ করিতে পারে। মানকুমারীর বৈধব্য-বেশের মতো তাঁহার কবিতাও নিরাভরণ, শান্ত ও সংযত। 'বীরকুমারবধ কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্যুবধ বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ছোট ছোট ব্যক্তিগত গীতিকবিতাতেই তাঁহার শান্ত স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রমীলা নাগ (১৮৭১-১৮৯৬), সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯৩২) প্রভৃতি আরও কয়েকজন মহিলা-কবি কিছু কিছু প্রশংসনীয় গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের সমতুল্য কোন মহিলা-গীতিকবি এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই, বা পুরুষ-কবিদের মতো তাঁহারা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন মৌলিক ভাবনাও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবে ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখের কথাগুলিতে ইঁহারা কখনও মধুর হাসি, কখনও-বা অশ্রুজলে স্নিগ্ধতর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। বাহিরের সমাজ ও বৃহৎ জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেরই কোনওরূপ সম্পর্ক ছিল না; কেহ হিন্দুঘরের কুলবধূ, কেহ-বা অকালবৈধব্যের আঘাতে ম্রিয়মাণ। ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদের আত্মপ্রকাশ বাধা পাইয়াছে। তবু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনেক মহিলা-কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। (যথা—ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত, মৃণালিনী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত, লজ্জাবতী বসু ইত্যাদি।) এই ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নহে।

নবম অধ্যায়

উপন্যাস

উপন্যাসের সূচনা ॥

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই আখ্যান-উপাখ্যান। প্রাগৈতিহাসিক বর্বর মানুষ শিকারের পর দিনশেষে গুহাবাসে ফিরিয়া নৃত্যগীতে ভোজসভা ও অরণ্য-অন্ধকার চমকিত করিয়া তুলিত। সেই নৃত্যগীতের পশ্চাতেও কোন-একটা শিকার-কাহিনী অথবা শত্রুদলনের জিঘাংসা লুকাইয়া থাকিত। তারপর মানুষ সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াছে, লিপি আবিষ্কার করিয়াছে, কাহিনী-মহাকাব্য রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার গল্প শুনিবার ইচ্ছা হ্রাস পায় নাই। প্রাচীন যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানবিশ্বাস সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া জগৎ ও জীবনের প্রতি রহস্যময় অলৌকিক মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই সে যুগের গল্প-কাহিনীতে ভূতপ্রেত, রাক্ষসখোক্কস, দৈত্যদানব, হুরী-পরীর প্রাধান্য। সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াও লোকে অলৌকিক জগতের আকর্ষণ ভুলিতে পারে নাই। রাজপুত্র, রাজকন্যা, কল্পনার রাজত্ব প্রভৃতি রোমান্টিক ব্যাপার তাহার আধুনিক বাস্তব চেতনাকেও আনন্দরসে ভরিয়া তোলে।

যে কাহিনীতে কল্পনার প্রাধান্য এবং বাস্তবতা সঙ্কুচিত, তাহাকে ইংরাজীতে রোমান্স (Romance) বলে। আধুনিক উপন্যাসের মূল এই রোমান্সে নিহিত। প্রাচীন যুগে প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি কাল্পনিক ঘটনার আতিশয্য লইয়া পদ্যে বহু রোমান্স রচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে গদ্যকে আশ্রয় করিয়াও অনেক রোমান্স রচিত হইয়াছে। অবশ্য কাল যত অগ্রসর হইয়াছে, ততই বাস্তব জীবন ও অভিজ্ঞতার ফলে কল্পনার অতিরেক সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ম্লান-ধূসর চিত্রগুলি ঔপন্যাসিক ও পাঠকের অধিকতর কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে।

ইতালীয় লেখক বোকাচিও প্রণীত *The Decameron* (1348-53) নামক গল্পসংগ্রহে আধুনিক উপন্যাসের প্রথম আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।[১] কিন্তু প্রাচীন

---

১. অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে এক জাপানী লেখিকা মুরাসাকি শিকিবু *The Tale of Gengi* নামক আখ্যানে সর্বপ্রথম উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন কোন সমালোচকের মতে এই উপন্যাস এমনই উৎকৃষ্ট যে, ১৯শ-২০শ শতাব্দীর উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় ইহাকে খুব খর্ব মনে হইবে না।

গ্রীক ও লাটিন ভাষাতেও গদ্যে গল্প-আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকে আরিস্টাইডিসের *Milseiaca* এবং খ্রীঃ ২য় শতকে লুসিয়ানের *The Ass* নামক আখ্যায়িকায় সর্বপ্রথম রোমান্সধর্মী গদ্য আখ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। পেট্রোনিয়াস প্রথম শতাব্দীতে লাটিন ভাষায় *Satyricon* এবং অপুলিসিয়াস *Metamorphos* (২য় শতক) নামক গদ্য কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের পশ্চিম-য়ুরোপে আর্থার, শার্লামেন প্রভৃতি রাজামহারাজদের কাহিনী অবলম্বনে বহু গদ্য রোমান্স রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু বোকাচিও-র *Decameron* হইতেই য়ুরোপে গদ্য ভাষায় যথার্থ আখ্যান শুরু হইল। তিনি এই গ্রন্থকে 'Novella storie', বা নূতন গল্প আখ্যা দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে Novella শব্দ হইতেই 'Novel' শব্দের নিষ্পত্তি নির্ণীত হইয়াছে। অবশ্য য়ুরোপের কোন কোন দেশে উপন্যাসকে 'novel' না বলিয়া Romance বলা হয় (যেমন জার্মান ভাষায়)। প্রাচীন রোমান্সের সঙ্গে উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই বোধ হয় 'রোমান্স' শব্দটি উপন্যাসের বিকল্প শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই যথার্থ উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার দুই শতাব্দী পূর্বে ষোড়শ শতকে রেনেসাঁসের প্রভাবে য়ুরোপে লোকভাষার আদর আরম্ভ হইয়াছিল, ছাপাখানার কল্যাণে সুলভমূল্যের গ্রন্থ জনসাধারণের হাতে পেঁছাইতেছিল এবং জনরুচির তুষ্টির জন্য য়ুরোপের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার গদ্যরীতিতে গল্প-আখ্যান রচনা শুরু হইল। কিন্তু উপন্যাসের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রয়োজন ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনে উন্নতি, রাষ্ট্রে ও সমাজে জনসাধারণের প্রাধান্য, নির্যাতিত জাতি বা দেশের মুক্তিলাভ ইত্যাদি ব্যাপারের ফলে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতি লেখক ও পাঠক—উভয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথম দিকে রোমান্স, উদ্ভট কাহিনী, রোমান্সের ব্যঙ্গ (যথা—*Robinson Crusoe, Don Quixote, Gulliver's Travels, Candide* ইত্যাদি) জনচিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইংরাজী সা ত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, জার্মানীর Wielend, Richter, Goethe, ফরাসী দেশের Madame Fayettee Marivaux, Prevost প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবনে ও য়ুরোপের জনচিত্তে প্রাধান্য বিস্তার করার ফলে তদানীন্তন সমাজসমস্যা ও পারিবারিক জীবন উপন্যাসের প্রাধান বিষয়বস্তু বলিয়া গৃহীত হইল। সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বাস্তব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বিশ শতকের য়ুরোপীয় উপন্যাস বিশাল, বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় ইতালীয় সাহিত্যের মতো প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও গদ্যে অনেকগুলি রোমাণ্টিক আখ্যান রচিত হইয়াছিল। যথা, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (১১শ শতাব্দী), গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' (পাওয়া যায় নাই), ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', শিবদাসের 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' দন্ডীর 'দশকুমারচরিত',

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বাণভট্টের 'কাদম্বরী', বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি। পালি জাতকেও গল্পরসের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রাদেশিক সাহিত্যেও পদ্যে—ক্বচিৎ গদ্যে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র দেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় বাস্তব জীবনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। ইহার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যে অনেক রোমান্টিক গল্প কাহিনী ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফার্সী উপকথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে প্যারীচাঁদ ও ভূদেবপ্রসঙ্গে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রথম সার্থক সূচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের খনিত পথেই বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার জীবিতকালেই উপন্যাসের আদর্শ বদলাইতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—মোট একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের অভূতপূর্ব পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে। তবু বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম উপন্যাসের রীতি ও বিষয়বস্তুকে বাঙালী পাঠকের নিকট কৌতূহলের ব্যাপার করিয়া তোলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) ॥

বাংলা উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র রূপের পরিকল্পনা, রচনায় পাশ্চাত্ত্য রীতির অনুসরণ এবং রোমান্সের কাল্পনিকতা, ইতিহাসের রোমাণ্টিকতা ও বাস্তব জীবন-সমস্যার মর্মবেদনা অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উপন্যাস মূলতঃ মানুষের সমাজপরিপ্রেক্ষিতে-পরিকল্পিত বাস্তব জীবনের গল্প। রোমান্সের সঙ্গে এইস্থানে ইহার বড় রকমের পার্থক্য। রোমান্স গল্প বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের নহে—কল্পনাপ্রধান, অবাস্তব গল্প। অবশ্য বাস্তব জীবনকে উপাদান করিয়াও রোমাণ্টিক ভঙ্গিমার সাহায্যে বাস্তব ঘটনাকে কল্পলোকের কাহিনীর পর্যায়ে লইয়া যাওয়া সম্ভব। (১) কাহিনী, (২) চরিত্র, (৩) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, (৪) সংলাপ, (৫) ঔপন্যাসিকের জীবনচেতনা—এই পাঁচটি প্রধান লক্ষণ না থাকিলে উপন্যাস যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে না। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে কাহিনীর দিকে লেখক-পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও, ক্রমে ক্রমে চরিত্রবিকাশ ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বৈচিত্র্য ও গভীরতা উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি উপন্যাসের মধ্যে মানবজীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের একটা উদার বিশাল ধারণা থাকা প্রয়োজন; ইহাই ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন, সহজ কথায়—দৃষ্টিকোণ। এই লক্ষণগুলির সমবায়ে উপন্যাসের শিল্পরূপ গড়িয়া ওঠে। বলাই বাহুল্য যে, বঙ্কিম-উপন্যাসের অধিকাংশ স্থলেই এই লক্ষণগুলি অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস বাংলা ভাষায় রচিত নহে। ১৮৬৪ সালে 'Indian Field' নামক সাপ্তাহিক

পত্রে তাঁহার প্রথম উপন্যাস *Rajmohan's Wife* প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু এ রচনায় তাঁহার মন ভরে নাই, যদিও ইংরাজী ভাষা তাঁহার মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস (অর্থাৎ *Rajmohan's Wife*) ঐতিহাসিক রোমান্স নহে,—বাস্তব জীবনের গল্প। অবশ্য তাহাতেও রোমান্সের রস ও রং সঞ্চারিত হইয়াছে। যখন এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার পূর্বেই তাঁহার যথার্থ বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার অল্প পূর্বে তিনি *'Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক অধ্যায়ের বেশি অনুবাদ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র রচিত 'বারিবাহিনী' উপন্যাসে এই অনুবাদটুকু যুক্ত হইয়াছে। *Rajmohan's Wife*[২]-এর কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে পরিপক্বতা ও পরিণতির বিশেষ অভাব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 'ললিতা তথা মানসে'র (১৮৫৬) কবি এই ইংরাজী উপন্যাসে তাঁহার প্রথম শক্তির পরিচয় পাইলেন যে, ওয়াল্টার স্কটের মতো, কাব্য নহে, গদ্যই তাহার বাহন—উপন্যাসেই তাঁহার প্রতিভার যথার্থ মুক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা পূর্বে আরম্ভ হইলেও ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' ১৮৮৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মোট বাইশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার চৌদ্দখানি উপন্যাস ('দুর্গেশনন্দিনী'—১৮৬৫, 'কপালকুণ্ডলা'—১৮৬৬, 'মৃণালিনী'—১৮৬৯, 'বিষবৃক্ষ' —১৮৭৩, 'ইন্দিরা'—১৮৭৩, 'যুগলাঙ্গুরীয়'—১৮৭৪, 'চন্দ্রশেখর'—১৮৭৫, 'রজনী'—১৮৭৭, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—১৮৭৮, 'রাজসিংহ'—১৮৮২, 'আনন্দমঠ'—১৮৮২, 'দেবী চৌধুরাণী'—১৮৮৪, 'রাধারাণী'—১৮৮৬, 'সীতারাম'—১৮৮৭) উপন্যাস ও আখ্যান রচিত হইয়াছে। নানাবিধ গুরুতর কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি যে এতগুলি উপন্যাস রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার উপন্যাসগুলির গুণগত শ্রেণী অনুসারে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে:

(ক) ইতিহাস ও রোমান্স—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ 'সীতারাম।

(খ) তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধ—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী'।

(গ) সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবন—'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'রাধারাণী'।

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্কিম-প্রতিভা কত বিচিত্রমুখী এবং বিপুলপ্রসারী। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অবাধ বিচরণ বিস্ময়মুগ্ধ

২. বহুকাল পরে বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'রাজমোহনের স্ত্রী' নামে এই উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব মোচন করিয়াছেন।

প্রশংসা দাবি করিতে পারে। পরবর্তী কালে আর কেহ উপন্যাসে এত বৈচিত্র্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। স্কটের অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক আখ্যান এবং ডিকেন্সের দৈনন্দিন জীবনের গল্পরসের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যাইবে। তাই তাঁহার উপন্যাসে যেমন রোমান্সের বিচিত্র ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমনি বাস্তব জীবনও পুরাপুরি উপেক্ষিত হয় নাই।

ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক, ছদ্ম-ঐতিহাসিক (Pseudo-historical) ও রোমাণ্টিক উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক যুগের চরিত্র ও কাহিনীর প্রাধান্য থাকিলেও নীরস ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল লক্ষ্য নহে। ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের পটে মানবজীবনলীলা অঙ্কন ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য। ইতিহাসের তথ্য নহে, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা—যাহাকে ইতিহাস-রস (spirit of history) বলে, সেই যুগচেতনাটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে ফুটিয়া না উঠিলে তাহার সাহিত্যিক মূল্য ম্লান হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও কল্পনাকে মিশাইয়া সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স সৃষ্টি করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহার প্রথম সূচনা। মুঘল ও পাঠান দ্বন্দ্বের একটি স্বল্পপরিচিত ঘটনার উপর প্রচুর কল্পনার রং ফলাইয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' পরিকল্পিত। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের প্রতি পাঠানকন্যা আয়েষা এবং গড়মান্দারণ দুর্গের অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমার আকর্ষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসে আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও রচনাবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ঐতিহাসিক রোমান্সের সূচনা করিলেও সে আখ্যানের সাহিত্য-গুণ উল্লেখযোগ্য নহে। স্কটের *Ivanhoe* বা ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র সঙ্গে এই উপন্যাসের ঘটনাগত কিঞ্চিৎসাদৃশ্য আছে ; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাসন্নিবেশ, কল্পনার উৎসার এবং বর্ণনার বৈচিত্র্য তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে এক মুহূর্তেই সুপ্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। সংস্কৃত কাহিনী পাঠে যে সমস্ত পাঠকের মন অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহার ভাষা, বর্ণনা ও কাহিনীর মধ্যে অনেক ত্রুটি আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভাকে নিন্দার ভস্মাচ্ছাদনে আর কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নিন্দুকের কণ্ঠ স্তব্ধ হইল, বাঙালী পাঠক এক মুহূর্তেই বঙ্কিমচন্দ্রকে শিরোধার্য করিল। অবশ্য সাধারণ রোমান্সের মতো 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কাহিনীর বৈচিত্র্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করিয়াছে। চরিত্রসমূহে বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু উপন্যাসের মতো স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি ফুটিবার অবকাশ পায় নাই—রোমান্সে তাহা সম্ভবও নহে। কেবল রোমান্সের মধ্যেও বিমলার চরিত্রে একটা বাস্তবানুগামী জীবনের পরিচিত স্পর্শ পাওয়া যায়। অবশ্য গজপতি-আশমানীঘটিত লঘু চিত্রটি এই রোমান্সের মধ্যে

একেবারেই মানায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্কটের আদর্শ অনুসরণ করিলেও আখ্যানে সংস্কৃত ভাব কিছু কিছু স্বীকার করিয়াছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র ঠিক এক বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়। মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' নামক এমন একখানি আশ্চর্য উপন্যাস রচনা করিলেন, যাহাতে উপন্যাস ও রোমান্সের লক্ষণ সুষ্ঠুভাবে মিশিয়া গিয়াছে। অরণ্য-সমুদ্রের নির্জন অবকাশে প্রতিপালিত কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সপ্তগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক নবকুমারের বিবাহ হইল। উভয়ের দাম্পত্যজীবনের সঙ্কট ও মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষ এই উপন্যাসে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনা আরও জটিল হইয়াছে যখন নবকুমারের পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর (সে মুসলমান হইয়া মতিবিবি নামে পরিচিত হইয়াছিল) মনে নবকুমার-লাভের বাসনা পুনর্বার জ্বলিয়া উঠিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসর নবকুমারের সাহচর্যে বাস করিয়াও ঘরের বন্ধন স্বীকার করিতে পারিল না, বনলতা উদ্যানে রোপিত হইয়া শুকাইয়া উঠিল। তাহার অন্তরে একদিকের অরণ্য-সমুদ্রের আহ্বান প্রবল হইয়া উঠিল, আর একদিকে যেন অলক্ষ্য হইতে অদৃষ্টদেবতা তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল। এই শোকাবহ উপন্যাসের ঘটনাগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি, দুর্জ্ঞেয় নিয়তির অনিবার্য অঙ্গুলিসঙ্কেত, ভাষা, বর্ণনভঙ্গিমা প্রভৃতি প্রায় নিখুঁত বলিলেই চলে। ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, এমন কি য়ুরোপীয় সাহিত্যেও ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। কোন এক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, "Outside the *Marriage De Loti* there is nothing comparable to the *Kopal-Kundala* in the history of western fiction." অবশ্য শেক্‌সপীয়রের মিরান্দার ('টেম্পেস্ট্') সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখানো যাইতে পারে; কিন্তু বঙ্কিম-পরিকল্পিত চরিত্রটি অনেক বেশী সুগঠিত। অনেকের মতে 'কপালকুণ্ডলা'ই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেহ বা বলেন যে, 'কপালকুণ্ডলা' রোমাণ্টিক উপন্যাস হিসাবে অপূর্ব হইলেও বিশুদ্ধ উপন্যাস হিসাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সার্থকতর।

'কপালকুণ্ডলা'র অব্যবহিত পরে রচিত 'মৃণালিনী'তে (১৮৬৯) বঙ্কিম প্রতিভার অবনতি লক্ষ্য করা যাইবে। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পটভূমিকায় মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয়কাহিনী ইহার মূল বক্তব্য। ইহাতে ইতিহাস, রোমান্স ও জীবনের গল্প—কোনটাই সুপরিকল্পিত হইতে পারে নাই। একমাত্র মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের যে কাল্পনিক ঘটনাটি (পশুপতির কাহিনী) বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক অনুমান যথাযথ হইয়াছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) একটি বড় গল্প মাত্র। গল্পটির গ্রন্থননৈপুণ্যের দীনতা অত্যন্ত প্রকট, কোন চরিত্রেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) ঐতিহাসিক রোমান্স ও উপন্যাস হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করিয়া ক্ষীয়মাণ

শক্তিকে আবার বলশালী করিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও মীরকাশিম ও ইংরাজ বণিকের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় 'চন্দ্রশেখর'-এর কাহিনীর উপস্থাপনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পাত্রপাত্রী অপেক্ষা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আবির্ভূত সাধারণ নরনারী—চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনীর জটিল ঘটনা ইহার মূল অবলম্বন। শৈবলিনীর বিবাহোত্তর জীবনে পরপুরুষাসক্তি, মানসিক অধঃপতন এবং দেহমনের পীড়নের মধ্য দিয়া আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন লাভ ইহার একটা প্রধান বিষয়। দুর্বল হৃদয়কে নীতির পথে আনিতে অক্ষম হইয়া শৈবলিনীর ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই আদর্শবাদী প্রতাপের আত্মবিসর্জন উপন্যাসটিকে নূতন ঐশ্বর্য দান করিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র যদিও হিন্দুর সামাজিক লোকাচারের বশীভূত হইয়া শৈবলিনী-চরিত্রের পরিণতি বর্ণনা করিয়াছেন, তবু ইহার নানাস্থানে শিল্পী-বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি প্রাধান্য পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'রাজসিংহ'কেই তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'রাজসিংহে'র ঘটনা এবং প্রধান চরিত্র ঐতিহাসিক বটে। চঞ্চলকুমারীকে লইয়া রাজসিংহ ও ঔরংজেবের বিরোধকে অবলম্বন করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। জেবউন্নেসা-মবারক-দরিয়াঘটিত কাহিনী অনৈতিহাসিক হইলেও ইতিহাসের পটভূমিকায় খাপ খাইয়া গিয়াছে। নির্মলকুমারীর চটুলতা এবং ঔরংজেবের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই উপন্যাসেও ইতিহাসের ঘটনা অপেক্ষা মবারক-জেবউন্নিসার কাল্পনিক কাহিনী অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে এবং লেখকের কল্পনাও এই অংশে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। তাঁহার সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে' সামান্য ঐতিহাসিক কাহিনী আছে বটে, কিন্তু লেখক ইহাতে জনশ্রুতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। রূপের প্রতি মোহ চরিত্রবান পুরুষের কিরূপ সর্বনাশ করিতে পারে, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যদিও সীতারামের চরিত্রকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে অঙ্কন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাসে প্রতিভার দীপ্তি যে ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) দুইটি তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সাহায্যে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও জাতীয়তা সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। এই উপন্যাস দুইটিতে সেই তত্ত্বকথা ও চিন্তাশীলতার ছাপ পড়িয়াছে। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে গৌরবান্বিত ভূমিকায় স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত এই উপন্যাসেই সংযোজিত হইয়াছিল। উপন্যাসটির কাহিনীগ্রন্থনে দুর্বলতা আছে; একমাত্র শান্তি ও ভবানন্দ ভিন্ন কোন চরিত্রই সুচিত্রিত হয় নাই। কিন্তু ইহার জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও গর্বোদ্ধত আবেগ পরবর্তী কালের স্বাদেশিক

আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 'দেবীচৌধুরাণী'তে গীতার নিষ্কামতত্ত্ব ও নারীর পারিবারিক কর্তব্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। প্রফুল্ল নাম্নী একটি যুবতী নানা ঘটনাপ্রবাহে কি করিয়া উত্তরবঙ্গের দুর্ধর্ষ মেয়ে-ডাকাত 'দেবীচৌধুরাণী'তে পরিণত হইল এবং কেমন করিয়াই-বা সে স্বামিগৃহে লক্ষ্মী বধূ হইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল, ইহাতে নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কাহিনীতে বাস্তবতার প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এবং নানা তত্ত্বকথা সত্ত্বেও ইহার গল্পরসের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ আছে। প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় অবতারের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছেন; ইহাতেই উপন্যাসটির রসনিষ্পত্তি আংশিক-ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে।[৩]

সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস—বঙ্কিম-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়িয়াছে। রোমান্টিক উপন্যাসে যেমন তাহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা, তেমনি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাস্তব চিত্রাঙ্কনেও তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ও 'রাধারাণী' (১৮৮৬) দুইটি বড় গল্পমাত্র, ইংরাজীতে ইহাকে novelette বলে। 'ইন্দিরা'র গল্পরসের মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আছে, রচনাভঙ্গীর মধ্যেও নূতনত্ব আছে। কিন্তু 'রাধারাণী'তে একটা অতি সাধারণ প্রেমের গল্প বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বঙ্কিম-প্রতিভার বিশেষ কোন স্বাক্ষর নাই। নানা বিপত্তির মধ্যে ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে মিলন এবং রাধারাণীর বাল্যপ্রেমের সার্থকতা—ইহাই আখ্যান দুইটির মূল বক্তব্য। তবে বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্য গল্প দুইটিকে একদা পাঠকসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় করিয়াছিল।

বাস্তবজীবনের কাহিনীকে নূতন পরিস্থিতিতে স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন ('বিষবৃক্ষ'—১৮৭৩, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—১৮৭৮ এবং 'রজনী'—১৮৭৭), তাহাতে বঙ্কিম-প্রতিভার চূড়ান্ত গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের কয়েকটি পারিবারিক সমস্যা এই উপন্যাস তিনখানিকে রোমান্সের স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যের কঠিন মৃত্তিকায় টানিয়া নামাইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ঘটনা, বক্তব্য বিষয় ও চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ পত্নী সূর্যমুখীর প্রেমে পরিতৃপ্ত থাকিয়াও বালবিধবা ও আশ্রিতা কুন্দনন্দিনীর প্রতি উৎসারিত দুর্নিবার কামনাকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিলেন না; বিধবা কুন্দকে বিবাহ করিলেন। অভিমানে সূর্যমুখীও গৃহত্যাগিনী হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুন্দনন্দিনী জীবনভার বহিতে পারিল না, বিষপানে আত্মহত্যা করিল। দীর্ঘ

---

৩. কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' ও শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র মধ্যে ঘটনাগত সাদৃশ্য দেখিয়াছেন। এই সাদৃশ্যকল্পনা অযৌক্তিক।

অদর্শন ও কালরাত্রির অবসানের পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী আবার মিলিত হইলেন।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সচ্চরিত্র গোবিন্দলাল ক্ষণিক মোহের বসে পত্নী ভ্রমরের প্রেম পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপিকা ও কামনালোলুপ বালবিধবা রোহিণীর উত্তেজক প্রেমে ডুবিয়া শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝিতে পারিলেন। রোহিণীও চঞ্চল বৃত্তিচারিণী হইয়া পাপের প্রতিফলস্বরূপ গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিল। কিন্তু গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের পুনর্মিলন হইল না। গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইলেন। পরে তীব্র মানসিক প্রায়শ্চিত্তের পর তিনি ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসন্নিবেশ করিয়া দুঃখক্লেশ ভুলিলেন। উপন্যাস দুইটির কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে লেখকের বাস্তব জ্ঞান প্রশংসনীয়। অবশ্য পুরুষের সংযম ও নারীর পাতিব্রত্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়া হিন্দুর তদানীন্তন সামাজিক নীতি ও আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া উপন্যাস দুইটির শেষরক্ষা হয় নাই। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু উপনাসের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা নহে; রোহিণীর হত্যাও অনাবশ্যক, আকস্মিক ও দুর্বল কৌশল। গোবিন্দলালের সন্ন্যাসগ্রহণও একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। 'বিষবৃক্ষে'র শেষে কুন্দের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলন রোমান্সের পর্যায়ে পড়িয়াছে, বাস্তবজীবনের দাবি ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর সমাজ ও নীতিবাদের দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া এই উপন্যাসের কয়েকস্থলে শিল্পের হানিকর ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। তাহা হইলেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তাহাতে দ্বিমত নাই।

'রজনী' (১৮৭৭) নানাদিক দিয়া অত্যন্ত সার্থক উপন্যাস—যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বড় উপন্যাসের ছায়ায় পড়িয়া ইহা ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। ইহাতে একদিকে শচীশ ও রজনীর রোমান্টিক প্রেম এবং আর একদিকে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের তীব্র তীক্ষ্ম প্রেমের বিষামৃত পরিবেশন বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিকুশলতাই প্রমাণ করিয়াছে। যদিও ইহার কাহিনী লিটন রচিত *The Last Days of Pompeii*-এর নিদিয়া নাম্নী অন্ধ ফুলওয়ালীর আখ্যানের অনুসরণে রচিত, কিন্তু উপন্যাসের গঠন, রচনারীতির অভিনবত্ব এবং অমরনাথ ও লবঙ্গলতার চরিত্রসৃষ্টি লিটনের রোমান্সকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের যে বিশালতার চিত্র রহিয়াছে, তাহা একদিকে মহাকাব্যের অনুরূপ আবার অপরদিকে নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্য, উপন্যাসের গ্রন্থনৈপুণ্য এবং চরিত্রচিত্রণ অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, ছদ্ম-ঐতিহাসিক, পারিবারিক সমস্যামূলক—এমন বিষয় নাই যাহা লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা করেন নাই। স্থানকালের এত বিশালতা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—কাহারও রচনায় এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে

'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন। উপন্যাসের বিশালতা, গভীরতা, কল্পনার ঐশ্বর্য এবং দৈনন্দিন জীবনের বর্ণাঢ্য চিত্র আর কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে এতটা প্রবল হইতে পারে নাই। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মাঝে মাঝে এক প্রকার উগ্র সংকীর্ণ সামাজিক নীতি বড় হইয়া শিল্পকলাকে অনেক স্থলে মাটি করিয়া দিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। শৈবলিনীর সুদীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত, কুন্দের আত্মহত্যা, রোহিণীর জীবনরঙ্গমঞ্চ হইতে দ্রুত অপসরণ—এ সমস্তই সমাজসাংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে। তখন তিনি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ লইয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, উপন্যাসের শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইলেও সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন নাই—কোন কোন সমালোচক এরূপ প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মন্তব্য যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাহা নহে। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিম-উপন্যাসে দৈনন্দিন ম্লান জীবনের কুশ্রীতা অপেক্ষা একটা আদর্শবাদী রোমাণ্টিক ঐশ্বর্য অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি উপন্যাসে স্কট ও ডিকেন্সকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। উপরন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী উপন্যাস বাদ দিলে য়ুরোপের নানা দেশের উপন্যাসে রোমাণ্টিক চিত্র ও আদর্শ জীবনই অধিকতর আধিপত্য করিতেছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ফরাসী উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবনের কুৎসিত নগ্নতা উদ্ঘাটিত হইলেও জীবনের বৃহৎ আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ফরাসী আদর্শ আদৌ অনুসরণ করেন নাই। যে আদর্শ ও চরিত্রনীতি জীবননীতির পরিপন্থী নহে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তদানীন্তন যুগধর্ম বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে সমাজ, জীবন, আদর্শ প্রভৃতির পুনর্গঠন লইয়া বহু আন্দোলন চলিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আন্দোলনের পুরোধা হইয়া আবির্ভূত হন। ফলে তাঁহার জীবন-সম্বন্ধীয় ভাবনাকল্পনা উপন্যাসেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফরাসী উপন্যাসে তাঁহার আসক্তি ছিল কিনা জানা যায় না—সম্ভবতঃ ছিল না। জোলা, বালজাক, ফ্লোবেয়রের উপন্যাসে তাঁহার আকর্ষণ থাকিলে বাংলা উপন্যাসে নূতন সম্ভাবনা দেখা দিত। সে যাহা হউক, সমস্ত দিক বিচার করিলে বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ॥

সে যুগের প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ গবেষক রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা উপন্যাসে আবির্ভাব একটি আকস্মিক ঘটনা। ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র প্রথম জীবনে ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালেও ইংরাজী ভাষায় প্রচুর প্রবন্ধ লিখিয়া

স্বদেশে-বিদেশে একজন সুনিপুণ লেখক ও গবেষক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী কবিতায় সংক্ষিপ্ত রূপান্তর তাঁহার কবি-প্রতিভারও সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার বাংলা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদও একদা ইংরাজী জানা মহলে বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিল। তিনি হয়তো কালে একজন সুদক্ষ ইংরাজী লেখক হইতেন এবং তারপর বাংলা দেশের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইতেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভালে বঙ্গসরস্বতীর স্নেহতিলক লেপিয়া দিয়াছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিভাদীপ্ত যুবককে বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র তো তখনও বিধিমতো বাংলাভাষা শিক্ষা করেন নাই, কলেজে বাংলার পণ্ডিতের ঘণ্টা ফাঁকি দেওয়াই সেযুগের মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ লক্ষণ ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য কেতাবের বাহিরে তিনি তো বিশেষ বাংলাগ্রন্থ পড়েন নাই, বাংলা লেখাও অভ্যাস করেন নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন, সমস্ত সঙ্কোচ উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'রচনা পদ্ধতি আবার কি? তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 'হিন্দুশাস্ত্র' নাম দিয়া নয় খণ্ডে বেদ, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এখানে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রমেশচন্দ্রের মোট উপন্যাস ছয়খানি। তন্মধ্যে দুইখানি কল্পনাপ্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস ('বঙ্গবিজেতা'—১৮৭৪, 'মাধবীকঙ্কণ'—১৮৭৭), দুইখানি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস ('জীবনপ্রভাত'—১৮৭৮, 'জীবনসন্ধ্যা'—১৮৮৯) এবং দুইখানি গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধীয় কাহিনী ('সংসার'—১৮৮৬, 'সমাজ'—১৮৯৪)। প্রথম চারিখানি উপন্যাসে মুঘলযুগের একশত বৎসরের ইতিহাস পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে একত্রে "শতবর্ষ" বলা হয়।

'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণে' ঐতিহাসিক পটভূমিকা নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও প্রধান কাহিনী ও চরিত্র কাল্পনিক। অবশ্য কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে টোডর-মল্লকে আনিয়া গ্রন্থটিকে ইতিহাসের মর্যাদা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার ইতিহাসবাহুল্য লেখকের নিপুণ ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু ইতিহাসের ফাঁসে মানব-জীবনকাহিনী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ইহাতে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবন, ক্রূরতা, আত্মত্যাগ—সবই আছে, নাই শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে-উজ্জ্বল চরিত্র। ইতিহাস ও রোমান্স—কোন দিক দিয়াই ইহা সার্থক হইতে পারে নাই। ইহার রচনাভঙ্গিমা আড়ষ্ট এবং খুঁটিনাটি তথ্যভার পীড়িত। বস্তুতঃ এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক তথ্য ব্যতীত আর কিছুই প্রশংসনীয় নহে। 'বঙ্গবিজেতা'র তিনবৎসর পরে 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭) রচিত হয়। এই উপন্যাসটিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয়

গুণ পাওয়া যাইবে। লেখক তিন বৎসরের মধ্যে রচনায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। টেনিসনের *Enoch Arden* কবিতার আখ্যানের প্রভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত এই ঐতিহাসিক রোমান্সে মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিশালতা, সৌন্দর্য ও আবেগের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই উপন্যাসে তিনি মুঘল দরবার ও হারেমের যে বিচিত্র স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে একাধারে ইতিহাসের আনুগত্য এবং কল্পনার অবাধ মুক্তি লক্ষ্য করা যাইবে। নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও হেমলতাকে কেন্দ্র করিয়া যে ত্রিভুজ রচিত হইল তাহার বেদনাহত পরিণতি বর্ণনায় লেখক মানবজীবনের বিচিত্র জটিলতাকে রোমান্সের রসে ডুবাইয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কেহ কেহ এই ঐতিহাসিক রোমান্সের মধ্যে পারিবারিক জীবনের প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছেন। তাহা আশ্চর্য নহে। কারণ ইহার আরম্ভ হইয়াছে পারিবারিক সম্পর্কের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা লইয়া। সুতরাং নায়ক-প্রতিনায়ক-নায়িকার চরিত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ছাপ পড়িতে পারে। 'বঙ্গবিজেতা'র দুর্বলতা, অপরিপক্কতা ও কৃত্রিমতা এই উপন্যাস হইতে বহুলাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের কলাকুশলতা, চরিত্রচিত্রণ ও কল্পনার ঐশ্বর্য রমেশচন্দ্রে আশা করা যায় না। তবু বাংলা ঐতিহাসিক রোমান্সের মধ্যে 'মাধবীকঙ্কণ' বিশেষ পরিচিত এবং সাধারণ পাঠক এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রকে বঙ্কিমের পার্শ্বেই স্থান দিয়াছেন।

ইহার পরে তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে ('জীবনপ্রভাত'—১৮৭৮, 'জীবন-সন্ধ্যা'—১৮৭৯) বিশুদ্ধ ইতিহাস অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার এই দুইখানি উপন্যাস তাই বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস নামে পরিচিত। ইহার কাহিনী ও চরিত্র—সমস্তই সুপরিচিত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 'জীবনপ্রভাতে' শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং 'জীবনসন্ধ্যা'য় রাজপুত শক্তির অবসান বর্ণিত হইয়াছে। এখানে লেখক রোমান্সের ছদ্মবেশটুকুও ত্যাগ করিয়া ইতিহাস লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। ফলে উপন্যাস দুইটিতে বাস্তব মানবজীবনেব বিশেষ কোন পরিচয় নাই, ধড়াচূড়াপরা বীরপুরুষেরাই ইহার প্রাঙ্গণে রণকোলাহলে মত্ত হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক জটিলতা, দুঃসাহসিক অভিযান, প্রশংসনীয় বীরত্ব, আত্মত্যাগ, নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমিকার জন্য নায়কের ঘনঘটাপূর্ণ বিপদকে বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ—ইত্যাদি ঐতিহাসিক যুগের বিবিধ ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ইতিহাসের অনেক রহস্যময় কক্ষে সন্ধানী আলোকপাত করিয়া পাঠকের জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা বেদনার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, রমেশচন্দ্রের ইতিহাসের পাণ্ডিত্যই তাঁহার উপন্যাসের কাল হইয়াছে—ঐতিহাসিক বর্মচর্ম ও কিংখাপের অন্তরালে মানবজীবনরহস্য অন্তর্ধান করিয়াছে। এইখানে স্কট-বঙ্কিম তাঁহাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস ও মানবজীবনকে এক-রেখায় মিলাইয়া দিতে না পারিলে উহারা সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়, কেহ কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না—ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মারাত্মক ত্রুটি।

এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রের কল্পনা ও বুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ ছিল না। তাই দেখা যায় যে, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে পাঠার্থী ছাত্রের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আছে, কিন্তু উপন্যাসের শিল্পকলা অতিশয় দুর্বল। পরবর্তী কালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এই দুর্বলতা আরও মারাত্মক আকারে ধরা পড়িয়াছে। কেহ কেহ বঙ্কিম-চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের হুবহু আনুগত্য দেখিতে পান না বলিয়া বঙ্কিমের উক্ত উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছু সংশয়ী। তাঁহাদের মতে রমেশচন্দ্র অধিকতর দায়িত্বের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। এ মন্তব্য কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস দুইটিতে ইতিহাসের বাহুল্য থাকিলেও ইহাদের উপন্যাস-লক্ষণ যে অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং তাঁহার পূর্বতন উপন্যাস দুইখানিতে কল্পনার প্রাধান্য আছে বলিয়া তাহাতে তিনি উপন্যাসগত নৈপুণ্যের অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের প্রতিভা শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস লইয়াই খুশি হইতে পারে নাই। তিনি দুইখানি উপন্যাসে ('সংসার'—১৮৮৬, 'সমাজ'—১৮৯৪) বাংলায় সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার আশ্চর্য তীক্ষ্ন চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উপন্যাস দুইটির ভাষা সরল,—আবেগের আতিশয্য নাই বলিলেই চলে। লেখক ইহাতে দুইটি গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা করিলেও সরল গ্রাম্য জীবনের স্বচ্ছন্দ কাহিনীটিকে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। রাঢ়ের এমন নিপুণ বর্ণনায় পরবর্তী কালের শরৎচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 'সংসারে' বিধবাবিবাহ এবং 'সমাজে' অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া কাহিনীতে এই দুইটি সামাজিক সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে সামাজিক সংস্কার, আন্দোলন, প্রগতিশীল মতবাদ প্রভৃতির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দুইখানি উপন্যাসেই কোন চরিত্র সুগঠিত হইতে পারে নাই। ইহাতে বাস্তব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, পল্লীচিত্রের জীবন্ত রূপও ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু উপন্যাস দুইটি চিত্রশিল্প হইয়াছে, ভাস্করের গঠিত মূর্তি হয় নাই। বিবৃতিমূলক কাহিনীগ্রন্থন ভিন্ন রমেশচন্দ্র আর কোন বিষয়েই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই জাতীয় উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সংস্কারের সংঘাতের ফলে নরনারীর চরিত্রে যে মানসিক সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, রমেশচন্দ্র তাহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তবে একবিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ সত্ত্বেও তিনি বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পটভূমিকায় কাহিনীকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনের বল, সংস্কার ও উদার হৃদয়ের মহত্ত্ব শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন কি, এই সমস্ত ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বরং কিয়ৎ পরিমাণে অযৌক্তিক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের এই দুইখানি উপন্যাসের শিল্পলক্ষণ বিশেষ প্রশংসনীয় না হইলেও তিনি যে পল্লীবাংলার জীবনকে সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯) ॥

১২৮১ সনের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, "যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করিতে হয়। সাহিত্যবোধ, আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্যসৃষ্টির অভূতপূর্ব শক্তি—সর্বোপরি জগৎ ও জীবনের প্রতি এমন প্রসন্ন রসদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টিল-অ্যাডিসনের মনোভাব, চিন্তা ও শিল্পীসত্তাই যেন নূতন করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেই সঞ্জীবচন্দ্রের মনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই জগৎ ও জীবনকে নিঃস্পৃহতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়েরই রোমান্টিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু দুইজনেই কোন ব্যাপারে বিশেষ নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা ও আকর্ষণ দেখান নাই। দুইজনের মধ্যে শুধু একটু পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যকবিতা লিখিলেও মূলতঃ তত্ত্বদর্শনে নিষ্ণাত; সঞ্জীবচন্দ্র গদ্যকাহিনী ও প্রবন্ধ লিখিলেও মূলতঃ কবি-প্রতিভার অধিকারী। অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দূরতম পার্থক্য। বঙ্কিমের তীক্ষ্ন মনন, দুর্ধর্ষ চরিত্র, প্রবল প্রভাববিস্তারের অপ্রতিহত শক্তি, কর্মে ও জীবনে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা—এ সমস্ত উৎকৃষ্ট চরিত্রলক্ষণ সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্র যেন আকস্মিকভাবে বাস্তব পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; পৃথিবীতে বাস করিয়া এবং ইহার নির্মম পরিচয় পাইয়াও তাঁহার নয়ন হইতে স্বপ্নলোকের মায়াঞ্জন মুছিয়া যায় নাই। কাজকর্মে তাঁহার কখনও বাঁধাবাঁধি নিষ্ঠা ছিল না; অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াও আলস্যবশতঃ অধিকাংশ পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আবার তিনিই ইংরাজী ভাষায় বাংলার কৃষক সম্বন্ধে তথ্যবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বেশ কিছুদিন 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' পত্র পরিচালনা করিয়াছেন, যাত্রা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসে আশ্চর্য কৌতূহল ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদালতের নথিপত্র ঘাঁটিয়া মামলার বিষয়কে উপন্যাসের বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তাঁহার মধ্যে একাধারে একটি বন্ধনবিমুখ মুক্তপুরুষ এবং সহস্র বন্ধনজালজড়িত পার্থিব মানুষ—উভয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনী (সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ১২৮৭-৮৯) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র সর্বপ্রথম ভ্রমণকে সাহিত্যে পরিণত করেন। তাঁহার 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) উপন্যাসও বিচিত্র ঘটনাপরিপূর্ণ এবং খানিকটা সত্য-মূলক বলিয়া সে যুগের পাঠকসমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭)'

'মাধবীলতা' (১৮৮৫)[৪]—তাঁহার মোট চারিখানি উপন্যাস। 'দামিনী' (১৮৯৩) তাঁহার একমাত্র গল্পগ্রন্থ। এই উপন্যাসগুলিতে চমকপ্রদ কাহিনী এবং কৌতূহলপ্রদ চরিত্র থাকিলেও উপন্যাসের বাঁধুনি ও চরিত্রাঙ্কনের নিষ্ঠা নাই। 'মাধবীলতা'র পরবর্তী কাহিনী 'কণ্ঠমালা'য় বিবৃত হইয়াছে ; অথচ দুইটি উপন্যাসে কালপর্যায়গত কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা নাই। যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁহার কাহিনী ও চরিত্রসমূহ যেন মাটি স্পর্শ করে না। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার উদার বৈরাগীসুলভ অনাসক্তি বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। বর্ধমানের রাজবংশের ঘটনা লইয়া রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসে গোয়েন্দা-কাহিনীসুলভ আদালতের খুঁটিনাটি তথ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের কিশোরের মতো কৌতূহল প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ এই উপন্যাসের নায়কের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি এতই তীব্রভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, প্রতাপচাঁদের ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের দিকে পাঠকের কৌতূহল আকৃষ্ট হইবার অবকাশ পায় না। "তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।" বঙ্কিমযুগের নীতি-আদর্শের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্রের এই উদার সহানুভূতি প্রশংসনীয়। তিনি 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের শৈলের অভিনব চিত্র আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বাস্তব জীবনের নির্মম বর্ণনা থাকিলেও তাহার সঙ্গে যেন লেখক-মনের কোন যোগ নাই। গীতিকবি ও ব্যক্তিগত রচনাকারের প্রায় সমস্ত লক্ষণ তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেই মনোভাব উপন্যাসে ততটা সার্থক হয় নাই। বরং তাঁহার গল্পরচনাশক্তি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বাংলা ছোটগল্পের সূচনাকার সঞ্জীবচন্দ্র। 'দামিনী' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্পের গৌরব দাবি করিতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও শুধু উদ্যম, নিষ্ঠা ও কর্মঠ প্রকৃতির অভাবে তাঁহার প্রতিভা শিল্পসৃষ্টিতে ততটা সার্থক হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীব-প্রতিভায় 'গৃহিণীপণা'র অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার প্রধান ত্রুটি—গৃহিণীপনার অভাব। সেইজন্য তাঁহার প্রায় কোন রচনাই পূর্ণাঙ্গ ও সুবলয়িত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উপন্যাস রচনায় যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য যশ লাভ করিয়া থাকেন, তবে তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিমযুগে রচিত হইয়াও বাঙালী পাঠকের রোমান্স-প্রিয় কল্পনাকে বাস্তবাভিমুখী

৪। 'কণ্ঠমালা' পূর্বভাগ, 'মাধবীলতা' উত্তরভাগ।

গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। 'স্বর্ণলতা'র খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, লেখকের জীবৎকালের মধ্যেই ইহার সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাট্যরূপ 'সরলা' একদা কলিকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এবং গ্রামাঞ্চলের সৌখীন অভিনয়ের একমাত্র নাটক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার যশে বঙ্কিমচন্দ্রের যশও কিছুকাল ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের আতিশয্য পছন্দ করিতেন না।[৫] বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' সমকালীন প্রায় সমস্ত লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'স্বর্ণলতা'র মতো একখানি অভূতপূর্ব খ্যাতিমান উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি কোন উৎসাহ দেখান নাই। 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) তারকনাথের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি ইহার জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হইয়া আরও কয়েকখানি উপন্যাস ও আখ্যান ('ললিত-সৌদামিনী'—১৮৮২, 'হরিষে বিষাদ'—১৮৮৭, 'তিনটি গল্প'—১৮৮৯, 'অদৃষ্ট'—১৮৯২, 'বিধিলিপি'—১৮৯১) লিখিয়াছিলেন। 'স্বর্ণলতা'য় তিনি অনেক দিন নিজ নাম গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যায় না। 'স্বর্ণলতা' রচিত না হইলে তাঁহার অন্যান্য আখ্যায়িকা অচিরে লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া যাইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক জীবন, ভ্রাতৃবধূদের কলহের ফলে পরিবারের ভাঙন—প্রধানতঃ এই পটভূমিকায় শশিভূষণ এবং বিধুভূষণের একান্নবর্তী পরিবারের ঘরোয়া সমস্যাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহার সজীব বাস্তব চিত্র, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা জীর্ণতা, একদিকে প্রমদার স্বার্থপরতা, নির্মমতা, ক্রূরতা, আর একদিকে সরলার আদর্শ নারীচরিত্র, একদিকে দারিদ্র্য-দুঃখের বেদনা, আর একদিকে গদাধরচন্দ্র ও নীলকমলের হাস্যপরিহাস—সে যুগের সাধারণ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক বাঙালী-জীবনের প্রাণরসোজ্জ্বল পরিচয় এবং মনোরম স্নিগ্ধ রচনা লেখককে প্রায় অমরত্বের কোঠায় লইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাস এবং নীতি-আদর্শ-পীড়িত বাস্তব কাহিনীকে লোকে নিশ্চয় শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তারকনাথকে অধিকতর ভালোবাসিত। 'স্বর্ণলতা' এতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী, ঘটনা, বর্ণনা—কতদূর সত্য, কোন্ গ্রামের কোন্ পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে ইহার মিল আছে—এই সমস্ত নানা জল্পনাকল্পনা সে যুগের পাঠককে অতিশয় কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন চমক সৃষ্টি করিয়াছিল, ঠিক তেমনি ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে তারকনাথও অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়া তাঁহার বাস্তবধর্মী গল্পগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে।

৫। 'স্বর্ণলতা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তবতার অভাবের জন্য সাহিত্য-সম্রাটের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তারকনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলিয়া লওয়া ভালো। অনেক সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তব কাহিনী-সংক্রান্ত উপন্যাসগুলির তুলনায় তারকনাথের গল্প-উপন্যাসের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু একটু অবহিত হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অখণ্ড জনপ্রিয়তার জয়মাল্য ধারণ করিলেও তারকনাথের উপন্যাস প্রতিদিনের পাঁচালি হইয়াছে, সার্থক উপন্যাস হইতে পারে নাই। চরিত্রগুলি অতি পরিচিত 'টাইপ' ধরনের; আখ্যানটি এমন গতানুগতিক বাস্তবধর্মী যে-কোন পরিবারের সঙ্গে অল্পবিস্তর মিলিয়া যাইবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য বা সামাজিক উপন্যাসের ইহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমবিকাশে তারকনাথ কিছুমাত্র মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পারিবারিক দুর্ঘটনাটিকে তিনি অতিশয় স্থূলভাবে দেখিয়াছিলেন। তাই চরিত্রগুলি হয় ষোল আনা ভালো, আর না হয় ষোল আনা মন্দ—এইভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক পরিশেষে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া poetic justice-এর চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, মনের অন্তরালে অবস্থিত বাসনাকামনার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির সংঘাত—যাহার মধ্য দিয়া কাহিনীতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, চরিত্রের বিকাশ লক্ষিত হয়, সে সম্বন্ধে তারকনাথ সম্পূর্ণ উদাসীন। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রজনী'র তুলনায় তাঁহার 'স্বর্ণলতা', 'বিধিলিপি', 'অদৃষ্ট' প্রভৃতির আখ্যান ও চরিত্র অত্যন্ত ম্লান মনে হইবে। লেখকের কল্পনার দুর্বলতা, চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের প্রায়শঃই অনুপস্থিতি, মানবজীবনকে বাহিরের ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন মৌলিক ধারণার অভাবের জন্য তাঁহার 'স্বর্ণলতা' শ্রেষ্ঠ সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাসে পরিণত হইতে পারে নাই। সে যুগে 'সরলা'র অভিনয় দেখিয়া কেহ কেহ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছেন, 'আমরা এই অভিনয় দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি। আবার সময়ে সময়ে হাসিতে হাসিতেও পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছে।'[৬] 'অবিশ্রান্ত অশ্রু' এবং 'পেটের নাড়ী-ছেঁড়া হাসি'—জীবনের এই স্বরূপটির প্রতি লেখক অধিকতর অবহিত ছিলেন। 'স্বর্ণলতা'র নীলকমল-চরিত্রটি বাদ দিলে প্রায় কোন চরিত্র গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। তাই 'স্বর্ণলতার' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াও লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অপ্রধান ঔপন্যাসিক ॥

বঙ্কিম-প্রতিভার পরিমণ্ডলে যে কয়জন ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে বিচক্ষণ লিপিকুশলতা ও দর্শনশক্তির পরিচয় দিলেও জ্যোতির্ময় সূর্যের সম্মুখে নিষ্প্রভ খদ্যোতের মতো কোনপ্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। একদা পরিমিত ক্ষেত্রে ইঁহাদের কিছু কিছু জনপ্রিয়তা দেখা গেলেও

৬. 'অনুসন্ধান'—৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮

আধুনিক যুগে অনেকেই লোক-স্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—ইঁহাদের অনেকগুলি উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কাহিনী নির্বাচনে কথঞ্চিৎ মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খণ্ড—১৮৬৯, ২য় খণ্ড—১৮৮৪) আকারে-প্রকারে বিরাটকায় ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসটি একদা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। বাঙালী বীর, যিনি মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং প্রতাপচন্দ্রের কাহিনী নির্বাচন ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। কিন্তু কাহিনী বাদ দিলে এই বৃহদায়তন উপন্যাস আর কোন দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে নাই। তিনি কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ ও ভাষাপ্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছেন। ফলে উপন্যাসটি পরবর্তী কালে পাঠকের হাতে পেঁছায় নাই। কারণ উন্নতরুচির পাঠকের রসের ভোজে এই জাতীয় উপন্যাস প্রায়ই স্বাদের ক্ষুধা ও ভোগের তৃপ্তি মিটাইতে পারে না। লেখকের ভাষার মধ্যে এমন একটা অনভ্যস্ত জড়তা এবং কাহিনীর মধ্যে এমন একটা অনাবশ্যক দীর্ঘতা রহিয়াছে যে, গল্প বুভুক্ষু পরম সহিষ্ণু পাঠকও ইহা পাঠে উৎসাহিত হইবেন না। ইহার কাহিনীটি হয়তো সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে শুধু কাহিনী থাকিলেই চলিবে না, তাহাকে জীবনদ্বন্দ্বের মাঝখানে স্থাপন করিতে হইবে। প্রতাপচন্দ্রের সে শক্তি ছিল না। তাই তিনি চরিত্রগত ত্রুটিকে আকারগত বিশালতার দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কোন কোন সমালোচক 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের' বিশাল আকারের সহিত ইংরাজী উপন্যাসের আকারসাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, এবং কেহ-বা তাঁহাকে স্কটের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের একনিষ্ঠ ছাত্র প্রতাপচন্দ্র পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রোমান্সের আদর্শও অনুসরণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এই সুদীর্ঘ নীরস কাহিনী পাঠকের নিকট আদৌ প্রীতিকর মনে হইবে না। যাহা হউক প্রতাপচন্দ্র এই উপন্যাসে জটিল অরণ্যানীর মধ্যে মাঝে মাঝে হাল্‌কা সুরে ঘরোয়া পরিবেশে যে চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) একদা বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাসের ঘটনা-সমাপ্তি হইতে আবার গল্পের আখ্যান টানিয়া দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪) এবং 'নবাবনন্দিনী' (১৯০১)।[৬] দামোদর আরও কয়েকখানি উপন্যাস ('কমলকুমারী', 'বিমলা,' 'মা ও মেয়ে,' 'দুই ভগিনী' ইত্যাদি)

৬. 'মৃন্ময়ী', 'কপালকুণ্ডলা'র এবং 'নবাবনন্দিনী,' দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার।

রচনা করিয়া একদা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিল্পবোধ ও পরিমাণবোধের বিশেষ অভাব ছিল। তাহা না হইলে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস বিশেষত্ববর্জিত; সেগুলি বয়স্ক বালকভুলানো উপকথায় পর্যবসিত হইয়াছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং চিন্তাশীল লেখক বলিয়া এখনও সম্মানিত। তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একখানি নির্ভরযোগ্য দলিল। কিন্তু সমাজসেবী ও মননশীল শাস্ত্রী মহাশয়ের পাশেই আর একজন শিল্পী ছিলেন—তিনি শিবনাথ ভট্টাচার্য। সেখানে শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিন্দুমাত্র গুরুভার নাই। শিবনাথ কবি ও ঔপন্যাসিক। তাঁহার 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮), 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫), 'হিমাদ্রিকুসুম' (১৮৮৭), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮), 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯) প্রভৃতি কাব্যে সত্যকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনখানি উপন্যাসে ('মেজবৌ' —১৮৮০, 'যুগান্তর'—১৮৯৫, 'নয়নতারা'—১৮৯৯) বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ চিত্র, বিশেষতঃ আদর্শ নারী-চরিত্রাঙ্কনে তিনি সহানুভূতিশীল উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাসে পারিবারিক নারীর যে মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, শিবনাথ তাঁহার উপন্যাসে সার্থক সূচনা করেন। এই উপন্যাস-গুলিতে বাস্তব জীবনচিত্র এবং নারীজীবনের আদর্শ স্নিগ্ধমধুর পারিবারিক আস্বাদ সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য সামাজিক উপন্যাস বা গার্হস্থ্য উপন্যাসে শুধু যথাযথ কাহিনী বা আদর্শ চরিত্রের বাস্তবানুগামী বর্ণনা থাকিলেই চলে না। তাহার সঙ্গে লেখকের একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকা প্রয়োজন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি নিতান্তই 'আখ্যায়িকা' (Tale) হইয়াছে, উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে 'বিষাদসিন্ধু'র বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) সম্বন্ধে দুই-এক কথা জানা প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের মধ্যে তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। কারবালার শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে লেখা 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১) ক্লাসিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়াও তিনি নাটক, কাব্য ও আত্মজীবনী লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক। বিচিত্র প্রতিভার অধিকারিণী স্বর্ণকুমারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের কিঞ্চিৎ ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ আলোচনা এখনও হয় নাই। বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁহার অনুরূপ কোন নারী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। গল্প, উপন্যাস,

নাটক, কবিতা, প্রহসন, গান—প্রায় সর্ববিভাগে স্বর্ণকুমারী বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৮০), 'কাহাকে' (১৮৯৮), 'স্নেহলতা' (১৮৯০-৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও শিল্পকৌশল নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবি করিতে পারে। বিশেষতঃ, 'স্নেহলতা'য় তাঁহার সামাজচিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসের একটি ত্রুটি কিছু আপত্তিকর। স্বর্ণকুমারী প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে পুরুষালি ছাঁদের রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথম উপন্যাসের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার আড়ষ্টতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ঠাকুরবাড়ীর অধিকাংশ গদ্য রচনায়, বিশেষতঃ আখ্যান-আখ্যায়িকায় ঠিক যেন প্রতিদিনের বাংলার ছবিটি ফুটিতে পারে নাই। ইঁহারা একটা বিশেষ নীতি ও ধর্মের পরিমণ্ডলে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় ক্ষমতা সত্ত্বেও ইঁহাদের ভাষাভঙ্গিমা, বর্ণিত বিষয়, চরিত্র প্রভৃতিতে কিছু কৃত্রিমতা, কিছু দূরাগত অস্পষ্টতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী, সাধারণ নরনারী, বিশেষতঃ শহরের নারীসমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁহার উপন্যাস খুব মহৎ শিল্প না হইলেও সহজ সরল বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে সুখপাঠ্য হইয়াছে।

এ পর্যন্ত আমরা বাংলা উপন্যাসের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের কথা আলোচনা করিলাম। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একপ্রকার উপন্যাস রচিত হইয়াছিল, যাহা মূলতঃ প্রহসনধর্মী ও ব্যঙ্গাত্মক। এই শতাব্দীতে নূতন ও পুরাতনের ভাবদ্বন্দ্ব শিক্ষিত বাঙালীর মনে নানা সংশয় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবানীচরণের পুস্তিকাগুলিতে আধুনিক জীবন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার বিকৃতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' ধনীর দুলাল মতিলালের নানা 'মর্কটলীলা' প্রচুর কৌতুকহাস্যের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণশীল সম্প্রদায় কোন কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তীক্ষ্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সুচতুর বাক্‌রীতির সাহায্যে তদানীন্তন প্রগতিশীল সম্প্রদায়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) ব্যঙ্গ পরিহাসমিশ্রিত 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি—যাহাতে কবি বাঙালীর বাক্‌সর্বস্ব স্বাদেশিক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতাকে নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, অথচ পরিহাসের প্রসন্নতা কখনও গালির বিষে মলিন হয় নাই। তাঁহার গল্প-আখ্যান-রঙ্গরহস্যে এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হইবে। ১৮৭৪ সালে 'কল্পতরু' নামক উপন্যাস এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চানন্দ' নামক রহস্যপূর্ণ শিরোনামায় তিনি 'পাঁচুঠাকুর' ছদ্মনামে গদ্যে ও পদ্যে যত ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনখণ্ডে 'পাঁচুঠাকুর' নামে সংকলিত হইয়া ১৮৮৪-৮৫ সালের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কল্পতরু' বাংলা সাহিত্যে অভিনব। ইহা বাহ্যতঃ উপন্যাস,

ইহাতে একটি কাহিনী মোটামুটি অনুসৃত হইয়াছে ; কিন্তু হাস্যপরিহাস এবং তীব্র ব্যঙ্গসৃষ্টি লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই যুগের হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষতঃ 'ব্রাহ্মিকা'রা অশোভনভাবে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুসমাজ বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখিত না। ইন্দ্রনাথ যদিও সুমিষ্ট পরিহাস ও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে নিপুণ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রগতিশীলতার বিকৃতিকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজেই ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার 'পাঁচুঠাকুর' একটা বিচিত্র সৃষ্টি। চুটকি ও বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে জাতির চারিত্রিক অধোগতিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এই রচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বঙ্কিমের দার্শনিক নিঃস্পৃহতা, উদার রসদৃষ্টি এবং চিত্তের সাত্ত্বিক লক্ষণ ইন্দ্রনাথের বিশেষ ছিল না ; কাজেই তাঁহার পাঁচুঠাকুর কমলাকান্ত হইতে পারে নাই। তাই একযুগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অভ্যর্থিত এবং পাঠকের দ্বারা বহুপঠিত হইলেও ইদানীং আর সাধারণ পাঠকসমাজে পরিচিত নহেন। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, বাংলার মুষ্টিমেয় ব্যঙ্গ-লেখকের মধ্যে ইন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

ইন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) প্রধানতঃ সমাজসংস্কারের ব্রত লইয়া ব্যঙ্গ রচনায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যে মনোভাবের বশে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্র প্রচার করিয়া-ছিলেন, হিন্দুর বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিয়া শিক্ষাসংস্কৃতির অভূতপূর্ব উপকার করিয়াছিলেন, সেই মন লইয়াই তিনি 'মডেল-ভগিনী' (১৭৮৬-১৮৮৮), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬), কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০), 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (বাংলা ১৩০২-১৩০৫ সনে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত, ১৯০২ সালে একত্রে প্রকাশিত) রচনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের রচনার মূলেও সমাজসংস্কারের স্পৃহা বর্তমান ছিল,—প্রত্যেক ব্যঙ্গপ্রবণ লেখকেরই মনে প্রচ্ছন্নভাবে সমাজচেতনা নিহিত থাকে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমাজসংস্কার স্পৃহা পুরাপুরি রক্ষণশীল, উগ্র এবং পরমত-অসহিষ্ণু। বিশেষতঃ শিক্ষিত নারীসমাজের প্রতি তাঁহার মনোভাব নিদারুণভাবে সঙ্কীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মপরিবার এবং ব্রাহ্মমহিলাকে অশোভনভাবে আক্রমণ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 'মডেল-ভগিনী' এবং 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নামক উপন্যাস দুইটিতে একটা কাহিনী এবং কতকগুলি চরিত্র আছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝে উপন্যাসের লক্ষণ বহুস্থলে বিপর্যস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র মতো বিপুলায়তন উপন্যাস পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইতিহাস, ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, বিশুদ্ধ রোমান্স, গার্হস্থ্যকাহিনী, সমাজসমস্যামূলক কাহিনী এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক গল্পকথা উপন্যাসের কলেবর পুর্তিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই শতকে বাঙালীর মনের সঙ্গে বৃহৎ দেশ ও কালের পরিচয় ঘটিল ;

ফলে কোথাও ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া, কখনও-বা ইতিহাস হইতে দূরে গিয়া কল্পনার বর্ণাঢ্যলীলা ও উত্তপ্ত স্বাদেশিক আবেগ লইয়া ঔপন্যাসিকগণ মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহারই আশে-পাশে ক্ষীণস্রোতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী-গুলিও প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান্সধর্মী উপন্যাসে সমস্যাসংকুল সমাজজীবন ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মূলক উপন্যাসেও সমাজচেতনারই প্রকাশ ঘটিল—অবশ্য একটু বক্রভঙ্গীতে। পরবর্তী শতাব্দীতে ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্স ধীরে ধীরে উপন্যাস হইতে লোপ পাইল, তাহার স্থানে প্রতিদিনের ম্লান, বিবর্ণ জীবন উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইল।

দশম অধ্যায়

প্রবন্ধসাহিত্য : মননশীলতার উৎকর্ষ

প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মননশীল প্রবন্ধের মধ্যে বাঙালী সমগ্র জাতীয় মানসটিকে আবিষ্কার করিল, সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। বস্তুতঃ এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—চিন্তাতরঙ্গিণীর গতিবেগ। এককথায় বাঙালীর সমগ্র অধিমানসের পরিচয় এই যুগের গদ্য প্রবন্ধে আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু তত্ত্বকথা, সাহিত্যসমালোচনা ও দার্শনিক চিন্তা গদ্যের পরিমিত বাগ্‌বন্ধনে আশ্চর্য কুশলতা লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মধ্যযুগীয় য়ুরোপেও গ্রীক, লাটিন ও প্রাদেশিক ভাষায় নানা তত্ত্বকথা, নানা আন্দোলন চলিয়াছিল। রেনেসাঁসের প্রভাবে এবং গুটেনবার্গ প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার কল্যাণে ক্রমে ক্রমে লাটিন গদ্যের স্থলে ইতালী, জার্মান, ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় গদ্য প্রবন্ধ চূড়ান্ত রূপ লইতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচুর মননশীল রচনা পাওয়া গেলেও আবেগ বা চিন্তা, কোনও ব্যাপারেই গদ্যের ব্যবহার লক্ষিত হয় না। মঙ্গলকাব্যের বহু অংশ নীরস গদ্যাত্মক; কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ও বিশুদ্ধ চিন্তামূলক ব্যাপার। কিন্তু সে যুগের কবিগণ চৌদ্দমাত্রার পয়ারে অবলীলাক্রমে দুরূহ গদ্যাত্মক তত্ত্বকথা বর্ণনা করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গল্প-প্রবন্ধের সূচনা হইল, প্রথমার্ধে ইহার খানিকটা বিকাশও ঘটিয়াছিল; কিন্তু যথার্থ মননশীল রচনা ও নিবন্ধসন্দর্ভের ঐশ্বর্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে নবরূপ লাভ করিল।

এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে দুই শ্রেণীর চিন্তামূলক গদ্যরচনার স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতেছে। চিন্তামূলক তথ্যবহুল গদ্যরচনাকে বাংলায় সাধারণভাবে প্রবন্ধ বলা হইলেও পাশ্চাত্য সমালোচনার ইতিহাসে এই জাতীয় রচনার শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যে গদ্য-রচনায় তত্ত্ব, তথ্য ও বস্তুভার বেশি, বিষয়গৌরব প্রধান, যুক্তিতর্কবহুল প্রমাণপুঞ্জের সাহায্যে লেখক তত্ত্বকথা বা সমস্যার আলোচনা করেন, তাহাকে প্রবন্ধ, সন্দর্ভ বা বস্তুপ্রধান প্রবন্ধ[১] বলা হয়। অপরদিকে আর একপ্রকার গদ্য রাচনা আছে যাহাতে বস্তু অপেক্ষা রচনাকারের প্রাধান্য অধিক, বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা বক্তব্য ভঙ্গিমা অধিকতর রমণীয়, তত্ত্ব-তথ্য খুঁটিনাটি বিবরণী অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রধান;

---

১. ইংরাজীতে ইহাকে Formal Essays, Impersonal Essays, Treatise, Discourse, Dissertations বলে।

তাহাকে রচনাসাহিত্য বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ[২] বলা হয়। এই জাতীয় গদ্যরচনা আর পাঁচটা সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের (অর্থাৎ কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি) মতো একটা নূতন সৃষ্টি। গীতিকবিতা ও ছোটগল্পের সঙ্গে ইহার কৌলীন্যের যোগ লক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের বাঁধুনির চেয়ে একটি মনের বিশেষ মুহূর্তের 'মুড' বা মেজাজ অধিকতর উপভোগ্য হয়।

পাশ্চাত্ত্যদেশে বোধহয় ফরাসী সাহিত্যিক মিচেল মঁতেইন (১৫৩৩-৯২) তাঁহার *Essais* (1580) নামক রচনাসংগ্রহে সর্বপ্রথম এই ব্যক্তিগত রচনার সার্থক সূচনা করেন। ফরাসী ভাষায় *essais* শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। মঁতেইন একটা নূতন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; তাই বুঝি কিছু সংশয়সন্দেহে *Essais* নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাগুলির প্রধান লক্ষণ—লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, ভালো-লাগা মন্দ-লাগাই তাঁহার মূল বক্তব্যের প্রধান সুর। ইহার উপসংহারের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেয়ে অসম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনার অধিকতর গৌরব স্বীকৃত হয়। ফলে এই ধরনের রচনার গঠনরীতি একটু শিথিল হইয়া থাকে। গল্প, কবিতা, নাটক, দার্শনিকতা, পরিহাস—সমস্ত কিছুই রচনাসাহিত্য বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রচনাকৌশলকে প্রভাবিত করিতে পারে। পরবর্তী কালে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, এ্যাডিসন, স্টিল, ডি-কুইনসি, স্টিভেনসন প্রভৃতি বিখ্যাত গদ্যশিল্পীরা ইংরাজী ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অপূর্ব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রবন্ধ বস্তুগত প্রবন্ধের (Objective Essays) লক্ষণযুক্ত ; অল্প কয়েকজন রচনাকার কদাচিৎ রচনাসাহিত্য বা ব্যক্তিগত রচনা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকজন প্রধান প্রবন্ধকারের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

বাংলা উপন্যাসের মতো বাংলা প্রবন্ধেরও সুগঠিত রূপ দান করেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই প্রবন্ধের সূচনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব এবং রাজেন্দ্রলাল বাংলা প্রবন্ধের ভাষা নির্মাণ করেন। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যৌবন লাভ করিল বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রচেষ্টায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' সমাস-সন্ধি-যমক-সমাকীর্ণ উৎকট গদ্যে প্রবন্ধ রচনা করিলেও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে তিনি প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। ১৮৭১ সালে তিনি বেনামীতে 'The Calcutta Review' পত্রিকায় *Bengali Literature* শীর্ষক একটি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করেন।

২. ইংরাজীতে ইহাকে Essay Literature, Personal Essays, Informal Essays, Subjective Essays ইত্যাদি বলে।

যদিও প্রবন্ধটি ইংরাজী ভাষায় রচিত, তবু ইহাতে প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধের গুণ লক্ষ্য করা যাইবে। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেন প্রবন্ধ-নিবন্ধের বান ডাকিল। তাহার পরে 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রেও তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধের পরিমাণ উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক। শুধু পরিমাণের জন্য নহে, বাঙালীর চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন, তদানীন্তন সমাজজীবন প্রভৃতি তাঁহার প্রবন্ধে এমন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙালী মাত্রেই তাঁহার বিরাট পৌরুষের স্পর্শে নব প্রাণরস আস্বাদন করিলেন। তাঁহার প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকা ঃ—'লোকরহস্য' (১২৭৯-৮০ সনে ধারাবাহিক-ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত, ১৮৭৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), 'বিজ্ঞানরহস্য' ১২৭৯-৮০ সনের 'বঙ্গদর্শন' হইতে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১২৮০-৮২ সনে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত, ১৮৭৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' ('প্রচার' পত্রে প্রকাশিত, ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ—১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব' (প্রথম ভাগ—১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভগবদ-গীতা' ('প্রচারে' ১২৯৩-১২৯৫ সালে, মৃত্যুর পর ১৯০২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)।

এই তালিকা দৃষ্টে বঙ্কিম-প্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ—এমন বিষয় নাই যাহা লইয়া প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। এই সমস্ত প্রবন্ধে তাঁহার মননশীলতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বিষয়বস্তুর নিপুণ অধিকার—সর্বোপরি তথ্যবহুল প্রবন্ধকেও সরস করিয়া তুলিবার দুর্লভশক্তি সে যুগের অন্য কোন প্রাবন্ধিকের মধ্যে এত সুপ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। 'লোকরহস্যে' সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক গুরুতর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু হাল্‌কা মজলিসী পরিহাসের সরসতায় গুরুতর তত্ত্বকথাও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি বিজ্ঞানের আলোচনাও যে কথাসাহিত্যের মতো শোভন হইতে পারে, তাহা তাঁহার 'বিজ্ঞানরহস্য' পাঠ না করিলে জানা যাইত কি? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীল প্রতিভার এক বিচিত্র সৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দধিদুগ্ধে অপত্য-নির্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া নসীরামবাবু প্রদত্ত অহিফেন বটিকা সেবন করিয়া এবং যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া মুক্তজীবনের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্‌সির (১৭৮৫-১৮৫৯) *Confessions of an English Opium Eater* (1822) গ্রন্থের অনুসরণে 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচিত বলিয়া সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ডি-কুইন্‌সির উক্ত গ্রন্থ পাঠে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু নানাদিক দিয়া উভয় গ্রন্থের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই অধিক। ডি-কুইন্‌সি রোগমুক্তির জন্য সর্বপ্রথম অহিফেন সেবন আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে মাত্রা চড়াইয়া ইহার প্রতি ভয়াবহ পরিমাণে আসক্ত হইয়া পড়েন।

ইহার ফলে তাঁহার মনোজগতেও আফিমের মাদকতা ছড়াইয়া পড়িল ; আট বৎসর ধরিয়া তিনি আফিমের ঝোঁকে উদ্ভট অদ্ভুত 'খোয়াব' দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে, এইরূপ অধিকমাত্রায় আফিম খাইলে মৃত্যু হইতে বিলম্ব হইবে না, তখন তিনি প্রাণপণে নেশার মোহ ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আফিমের মাত্রা কমাইতে লাগিলেন। অবশ্য তাহার ফলে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের সীমা রহিল না। তবু তিনি অসীম মনোবলের সাহায্যে মাদকের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। এই ব্যক্তিগত কাহিনীটি তাঁহার গ্রন্থের মূল কথা। অপর দিকে বঙ্কিমের কমলাকান্ত-চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অবশ্য তিনি কমলাকান্তের ছদ্মবেশে বাঙালীকে তাঁহার নিজের কথাই শুনাইয়াছেন। বৃদ্ধ নিরাসক্ত কমলাকান্ত আফিমের প্রসাদে দিব্যকর্ণ ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তখন তিনি বিড়ালের ডাকের মধ্যে কার্ল মার্ক্স্ প্রতিষ্ঠিত 'First International'-এর সাম্যবাদ শুনিতে পান, মানুষকে বৃহৎ পতঙ্গ বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যের 'বড়বাজারে' গিয়া বিচিত্র বিকিকিনির দৃশ্য দেখিয়া মৃদু হাস্য করেন, মানুষের আচার-আচরণ, ব্যবহার, উক্তি—প্রত্যেক বিষয়েই তিনি একটা হাস্যকর অসঙ্গতি দেখিয়া কৌতুক বোধ করেন। তাই কমলাকান্ত কখনও দার্শনিক, কখনও কবি, কখনও সমাজতান্ত্রিক, কখনও স্বদেশপ্রাণ বাঙালী। বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য শক্তির বলে নিজেকে কমলাকান্তের সত্তার মধ্যে সংগুপ্ত করিয়া নিঃস্পৃহ উদারভাবে বাংলার সমাজ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নূতন ক রয়া আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। পরিশেষে দেখা যায়—জগৎ-জনতার মধ্যেও কমলাকান্ত নিঃসঙ্গ নির্জন ; তাঁহার শেষ কথা—"কেহ একা থাকিও না।" এ যেন সঙ্গিহীন বঙ্কিমের অন্তঃপুরের চকিত আভাস—সেখানে তিনি ডেপুটী নহেন, দেশের বরেণ্য ব্যক্তি নহেন, সাহিত্যিক নহেন, সম্পাদকও নহেন,—সেখানে আপন একাকিত্বের দুঃসহ বেদনায় ব্যাকুল হইয়া মানুষের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন। এই পরিহাস, দার্শনিকতা, গীতকবির মতো স্বগত ভাষণ—ইহার সঙ্গে ডি-কুইন্সির বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তর'—বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সার্থক, অনবদ্য নিখুঁত সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কমলাকান্ত'কে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করিতেন ; কারণ ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের গোপন অনুভূতি এবং মনের নানাকথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকের কাছেও এ গ্রন্থের প্রচুর সমাদর ; আজিও সে সমাদর হ্রাস পায় নাই। পরবর্তী কালে (এমন কি আধুনিক কালেও), অনেকে কমলাকান্তের জবানীতে অনেক কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র শেষে "কমলাকান্তের বিদায়" শীর্ষক অনুচ্ছেদে কমলাকান্ত হাসির ছলে তীব্র বেদনার কথা শুনাইয়াছেন, "সম্পাদক মহাশয়, বিদায় হইলাম, আর লিখিব না, বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর বনিল না।" কমলাকান্ত বিদায় লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙালী তাঁহাকে ভুলিতে পারে কই ? তাই এখনও কত লেখক কমলাকান্ত সাজিয়া হাস্যকৌতুক সৃষ্টির কত চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের-চরিত্রগুলির চেয়ে কমলাকান্ত আমাদের অধিকতর আপনার

জন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে সরস পরিহাস, স্নিগ্ধ মাধুরী, গীতিরসের মূর্ছনা এবং সঙ্গীতের শ্রুতিমাধুর্য রহিয়াছে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'[১] ও 'পঞ্চভূত' ছাড়িয়া দিলে আর কোন গ্রন্থে তাহার সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ইহাতে সংকলিত তিনটি রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের নহে। 'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা, 'স্ত্রীলোকের রূপ' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত। নাম বলিয়া না দিলেও এই তিনটি রচনার মুন্সিয়ানার অভাব সহজেই চোখে পড়িবে। তবে সরস পরিহাস প্রিয়তার জন্য অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধ দুইটিতে অপেক্ষাকৃত পরিপক্কতার চিহ্ন আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য রীতির আলোচনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যবিচার-পদ্ধতির একটা যুক্তিপূর্ণ আকার দিবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তিনি কোন দিনই শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন নাই; কাজেই বাংলা সমালোচনায় পাশ্চাত্ত্য রীতিতে তিনি সার্থকভাবে অবতারিত করিলেও তখনও তাঁহার সমালোচনার রূপটি পূর্ণ আকার লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য ও গ্রন্থ বিচারেও তিনি নির্ভীক পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। বাংলা ও ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসের প্রতি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহলী ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি ইতিহাস রচনার মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে তাঁহার আধুনিক সাম্যবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যাইবে। ইহাতে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কোঁৎ, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। এই যুগের প্রবন্ধে তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে। অবশ্য কিছুকাল পরে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোঁতের Positivism-কে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই মনোভাবের বশে রচিত হইল, 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র'। এ সমস্ত গ্রন্থে হিন্দুধর্মের মূল্যবিচার নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং অবিশ্বাস্য অনৈসর্গিকতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা ও দূরদর্শিতা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্য এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মনোজগতের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, এই প্রবন্ধগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

---

১. অবশ্য 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বিশুদ্ধরূপে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্কলন; তাহাতে কোন আখ্যান-উপাখ্যানের আভাস নাই, বা কমলাকান্তের মতো কোন চরিত্রও নাই।

বঙ্কিম-শিষ্যসম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রাবন্ধিক ॥

গ্রহসনাথ সূর্যের মতো বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া একদল শিষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা বঙ্কিমের ভাবাদর্শের প্রভাবে বর্ধিত হইয়া এবং সেইরূপ রচনারীতি অবলম্বন করিয়া 'বঙ্গদর্শন' পত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও রসদৃষ্টির যেরূপ সুষ্ঠু সমন্বয় করিয়াছিলেন, নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ সাধ্যমতো সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ইঁহারা প্রায় সকলেই প্রবন্ধসাহিত্যে কোন-না-কোন দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরুপদে বরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯০০) প্রধানতঃ বঙ্কিমের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের আদর্শে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার 'গ্রীক ও হিন্দু' (১৮৭৫) এবং 'বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬) একদা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে সুপরিচিত ছিল। সমাজ-আদর্শে তিনি বস্তুগত ভিত্তিভূমিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী এবং অনুসরণকারী। তাঁহার ভাষা আবেগবর্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং তত্ত্বালোচনার সম্পূর্ণ উপযোগী। অবশ্য ইহাতে সরসতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা এবং 'আর্যদর্শন পত্রিকা'র (১৮৭৪) সম্পাদক ও পরিচালক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এবং অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক জীবনী রচনা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮০), 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০) এবং 'বীরপূজা' (১ম—১৯০০, ২য়—১৯০০) গ্রন্থগুলি নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। নব্য ইতালির জনকস্থানীয় ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্‌ডির জীবনী রচনা করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বাংলার নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেমকে বর্ধিত করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। বিধ্বস্ত ইতালি যেমন ঐ জননায়কদ্বয়ের নেতৃত্বে নবরূপ ধারণ করিয়াছিল, তেমনি বাঙালীর মনেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভারতের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথের রচনারীতি আবেগময় কিন্তু তথ্যবর্জিত নহে, বিশেষতঃ স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে তিনি উচ্ছ্বাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন।

বহরমপুরের অধিবাসী রামদাস সেন (১৮৪৬-১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ও অনুরাগী ছিলেন। বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করেন, তখন তাঁহার অনুরোধে তরুণ রামদাস ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১ম—১৮৭৪, ২য়—১৮৭৬, ৩য়—১৮৭৯) এবং 'ভারত

রহস্য' (১৮৮৫) ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গ্রন্থ হিসাবে এখনও মূল্যবান। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম, নীতি, সংহিতা এবং প্রাচীনযুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি অনেক অভিনব তথ্য উদ্ধার এবং নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্বে অভূতপূর্ব অধিকার দেখিয়া য়ুরোপের অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ভারতপ্রেমিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত (যেমন ম্যাক্স্‌মুলর) তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) বঙ্কিমপ্রভাবে ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগর্ভ প্রাবন্ধিকরূপে আবির্ভূত হইলেও প্রথম যৌবনে প্রচুর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ('যৌবনোদ্যন'—১৮৬৮, 'মিত্রবিলাপ'—১৮৬৯, 'কাব্যকলাপ'—১৮৭০, 'কবিতামালা'—১৮৭৭, 'মেঘদূতের পদ্যানুবাদ'—১৮৮৩)। পরিমাণে গদ্য অপেক্ষা তাঁহার কবিতাই অধিক। রাজেন্দ্রলালের মতো সুদক্ষ সমালোচক তাঁহার কবিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, রাজকৃষ্ণ বরং কবিতায় কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে যে ধরনের শুষ্ক কঠিন ভাষাভঙ্গিমা ও গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে, তাঁহার কবিতায় সেরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্যগোচর হয় না। অবশ্য তিনি 'নানা প্রবন্ধে'র (১৮৮৫) লেখক বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি-সংহিতা—এই সমস্ত চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কিন্তু গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেই তিনি এমন একটা পোষাকী আড়ম্বর অবলম্বন করিতেন যে তাঁহার প্রবন্ধগুলির বিষয়গৌরব বাদ দিলে উহাতে বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাইবে না।

চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—ইঁহারা সকলেই কোন-না-কোন দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলা তত্ত্ব' (১৮৮১), 'ফুল ও ফল' (১৮৮৫), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' (১৮৯৯) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ পাঠযোগ্য। চন্দ্রনাথ যখন সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ধৃতাস্ত্র হইয়া রণস্থলে আবির্ভূত হইতেন ('হিন্দুবিবাহ'—১৮৮৭, 'হিন্দুত্ব'—১৮৯২, 'কঃ পন্থাঃ—১৮৯৮), তখন তিনি যুক্তিতর্ককে গোঁড়ামির প্রশ্রয়ে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। কিন্তু কোন কোন সময়ে তিনি একটি চমৎকার মধুর গীতি-রসসিক্ত মেজাজ আমদানি করিতেন—যেমন "ফুলের ভাষা" ('ফুল ও ফল'), "পাখীটি কোথায় গেল" ('ত্রিধারা'—১৮৯১), তখন প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকৃত শিল্পরূপ লাভ করিত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকসমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) সে যুগে বহুপঠিত শোকাশ্রুপূত গদ্যকাব্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আবেগাপ্লুত ভাষা, উচ্ছ্বসিত করুণরস, জীবনের প্রতি নির্বেদ-বৈরাগ্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতি এই গ্রন্থে কাব্যধর্মী ও নাটকীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আন্তরিকতা

ও আবেগ প্রথমে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর মনে হইলেও পরে গ্রন্থটির চিন্তাগত শিথিলতা ও বাণীবিন্যাসের দুর্বলতা ধরা পড়ে। তাঁহার 'সারস্বত কুঞ্জ' (১২৯২) ও 'স্ত্রীচরিত্র' (১২৯৭) কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের প্রিয়শিষ্য, অনুরাগী, ভক্ত ও আত্মীয়কল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনেক রচনা এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমপ্রতিভা ও ভূয়োদর্শনের অধিকারী না হইয়াও তাঁহার মন ও মেজাজ অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'চন্দ্রালোক' ও 'মশক' নামক যে রচনা দুইটি আছে তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই রচনা। তিনি কবিতা ও উপন্যাস লিখিলেও প্রধানতঃ 'সমাজ-সমালোচনা' (১৮৭৫), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) প্রভৃতি সরস প্রবন্ধগ্রন্থের লেখকরূপেই অধিকতর পরিচিত। গভীরতা ও মনীষার কিঞ্চিৎ খর্বতার জন্য রচনার উৎকৃষ্ট গুণ সত্ত্বেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক হইতে পারেন নাই। কোন কোন স্থলে অনাবশ্যক ও অনুচিত পরিহাসের জন্য তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিম্নগ্রামে নামিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিকথা ধরনের রচনাটি ('পিতাপুত্র') অতিশয় সুখপাঠ্য।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) উল্লেখ করিলেই বঙ্কিম-শিষ্য এবং উক্ত ভাবমণ্ডলে বর্ধিত প্রাবন্ধিকসম্প্রদায় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে। ঠাকুরদাস চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য-সমালোচক-রূপে সে যুগে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। 'সাহিত্যমঙ্গল' (১৮৮৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁহার একমাত্র সমালোচনা পুস্তক। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্ত্বের পটভূমিকায় তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সাহিত্যবিচার শুরু করিয়াছিলেন। সমালোচনা ছাড়াও হালকা চালের সরস প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন ('সহরচিত্র'—১৯০১, 'সোহাগচিত্র'—১৯০১)।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলার প্রাবন্ধিক ও মনীষী বলিয়া সুপরিচিত। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' পত্রিকার (১৮৭৪) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সে যুগে কতকগুলি আবেগ-তরল কাব্যধর্মী গদ্যগ্রন্থ ('প্রভাতচিন্তা'—১৮৭৭, 'নিভৃতচিন্তা'—১৮৮৩, 'নিশীথচিন্তা'—১৮৯৬) রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বলিয়া দীর্ঘকাল খ্যাতির উচ্চ শিখরে আসীন ছিলেন। তখন তাঁহাকে বাংলার কার্লাইল বলা হইত। সে যুগের তরুণ লেখকগণ কালীপ্রসন্নের ওজস্বিনী ভাষা, ঝঙ্কারমুখর স্টাইল এবং উদ্দাম আবেগের অনুকরণে গদ্য লিখিবার চেষ্টা করিতেন। আধুনিককালে কালীপ্রসন্নের প্রতি আমাদের আর

কোন মোহ নাই। তাঁহার ভাষা অকারণে অলংকৃত, কৃত্রিম এবং অনুচিত আবেগে উন্দাম। চিন্তাশীল বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থাদিতে মৌলিক চিন্তার খুব বেশি নিদর্শন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া এবং পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার হইয়া ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য ও শাস্ত্রসংহিতায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যশিষ্যদের মধ্যে প্রতিভায় তিনি সকলকেই ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভা জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও সরস রচনাভঙ্গিতে এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মানুষটির এমন আশ্চর্য দক্ষতা ছিল যে, তিনি যেন লেখনী দিয়া লিখিতেন না, কথা বলিতেন। চলিত ধরনের বাক্য রচনা এবং কথকতার ধারা তাহার রচনাগুলিকে একটি আস্বাদনীয় মাধুর্য দান করিয়াছে। সর্বসাধারণের বোধগম্যতা সাহিত্য ও ভাষার প্রধান লক্ষণ—বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুরুবাক্য তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার 'কাঞ্চনমালা' (১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শনে এবং ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) এবং 'বেনের মেয়ে' (১৩২৫-২৬ সালে 'নারায়ণে' এবং ১৯২০ সালে প্রকাশিত) উপন্যাস হিসাবে খুব একটা সার্থক না হইলেও ইতিহাস-সম্মত জীবনচিত্র হিসাবে বিশেষ মূল্যবান ; এতদ্ব্যতীত 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১) নামক পৌরাণিক রূপক-আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২) তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর গদ্যলেখকে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার ভাষার চলতাধর্ম, জীবন্ত বিকাশপরম্পরা ও সরসতা পাণ্ডিত্যের চাপে নষ্ট হয় নাই, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্য তাঁহার গদ্য যেরূপ সহজ, সরস, তরল এবং মৌখিক ধরনের, ঠিক সেইরূপ সংহত, সংযত ও তীক্ষ্ম নহে। ইহাতে গভীর ও চিন্তাশীল ব্যাপার কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া পড়ে। তাঁহার 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' অতিশয় সুখপাঠ্য হইলেও ভাষার তরলতার জন্য বিষয়বস্তু ও বক্তব্যভঙ্গিমা ততটা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়াও ইংরাজী ও বাংলাতে তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা ততটা প্রয়োজনীয় নহে।

বঙ্কিম-শিষ্য ও অনুসরণকারীদের গদ্যনিবন্ধের কথা বলা হইল। বঙ্কিমগোষ্ঠীর বাহিরেও কয়েকজন গদ্যলেখক প্রশংসনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রসঙ্গকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য আমরা শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করিব।

দ্বিজেন্দ্রনাথ[১] ভাবুকপ্রকৃতির নিঃস্পৃহ দার্শনিক ধরনের মানুষ ছিলেন। জীবনের কোন কিছুর প্রতি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। গদ্য রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা ছিল কিন্তু নিয়মানুগভাবে কোন আলোচনায় তাঁহার রুচি ছিল না। গভীর চিন্তামূলক

১. দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

রচনাতেও তিনি মাঝে মাঝে লঘুধরনের শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষার মধ্যে তির্যকতা সৃষ্টি করিয়া কৌতুক বোধ করিতেন। ফলে গভীর চিন্তামূলক রচনাও পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিত। চারিখণ্ডে সমাপ্ত 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০)[২], 'চিন্তামণি' (১৩০৮-১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত), 'গীতাপাঠ' (১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সুগভীর চিন্তা ও মৌলিক মননধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন, চিন্তা ও কর্মসংযোগে একনিষ্ঠতা ও নিয়মের অভাব ছিল বলিয়া তাঁহার ভাববাদী দার্শনিক চিন্তা এদেশে যথেষ্ট প্রচারিত হয় নাই। প্রচারিত হইলে বাঙালীর দর্শনচিন্তার বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যাইত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ধর্মজগতের অধিবাসী হইয়াও বাংলা গদ্যে অসামান্য অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যান ও আরও নানা প্রসঙ্গে পুস্তিকা রচনা করিয়া তীক্ষ্ম যুক্তি এবং ওজস্বিনী ভাষায় বিচিত্র ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম ও ধর্মাচার, জীবনের কর্তব্য, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাঁহার 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশরীতির সাত্ত্বিকতা এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির গভীরতা চিন্তাশীল মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবে। কেশব লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য সুলভ মূল্যে কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন ('সুলভ সমাচার'—১৮৭০, 'নববিধান'—১৮৮০, 'বালকবন্ধু'—১৮৭৮ ইত্যাদি)। তাঁহার রচনার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

"শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্য মন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে? তোমার যে এত বড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে। বিশ্বজননী যখন তোমাকে সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতর এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে ;......হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতর নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জনের সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকলের দুঃখজ্বালা নির্বাণ করিলে?"

স্বামী বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনা ইংরাজীতে লিখিত ; কিন্তু তিনি চিঠিপত্রে শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদিগকে নানা তত্ত্বোপদেশ দিতেন, আলোচনা করিতেন। এই স্বল্পপরিমিত রচনাগুলি আশ্চর্য শক্তিশালী চলিতভাষায় রচিত। প্রচণ্ড এবং শুভ্র নিরঞ্জন অধ্যাত্মচেতনায় যিনি সূর্যের মতো দাহ ও দীপ্তি লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যরীতিকে চিঠিপত্র, ডায়েরী ও ভ্রমণকাহিনীতে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন। এই চলিত রীতি একেবারে খাঁটি কলিকাতার 'ককনি', কিন্তু অশিষ্ট বা অমার্জিত নহে। 'হুতোমে'র দুর্নিবার সাহস, কিন্তু বিকৃত

---

২. এই সমস্ত প্রবন্ধগ্রন্থ বিংশ শতকে প্রকাশিত হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রবন্ধ ঊনবিংশ শতকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রুচি নহে, এবং বীরবলের মননশীল রসিকতা, কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নহে—বিবেকানন্দের ভাষার প্রধান গুণ। আবার কোথাও কোথাও তিনি চলিত বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্যে সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদবন্ধের ঝঙ্কার তুলিয়া অপরূপ ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় চরিত্র, অপার মানবপ্রেম, সু-উচ্চ আদর্শ এবং তাহার সহিত অবহেলিত মানুষের প্রতি বুকভরা ভালবাসা স্বল্পসংখ্যক পুস্তিকাগুলিতে গৈরিক লাভাস্রোতের মতো প্রবাহিত হইয়াছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা' (ইহাতে একটি প্রবন্ধ চলিতভাষায় রচিত) প্রভৃতি পুস্তিকাগুলির মধ্যে স্বামীজীর দৃপ্ত পৌরুষ ও অদ্ভুত মনীষা চলিত বাংলাভাষাকে অবলম্বন করিয়া বাংলা গদ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

"বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে যাও। আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট, আর এ তালতমাল আম নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!"

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে বিবেকানন্দ ভাগীরথীর দুই পার্শ্বের যে প্রাণহীন যান্ত্রিক ধূসর মূর্তি কল্পনানয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন একালে তাহা শোচনীয়রূপে সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মননশীল সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে এবং 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর সহযোগিতায় দেশের ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতির দিকে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এবং প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কার, আচার-আচরণকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হইল। বর্ধমান রাজসভা ও 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত পুরাণসংহিতার অনুবাদগুলি এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে বেদান্ত উপনিষদের চর্চা, সত্যব্রত সামশ্রমীর ভারতীয় দর্শন প্রচার, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রকে যুক্তির দ্বারা বিচার, রামদাস-রাজকৃষ্ণ-হরপ্রসাদের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের জীবন, ইতিহাস ও পুরাকাহিনীকে নূতনরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রভৃতি ঘটনায় বুঝা যাইতেছে যে, বাংলার মননশীল সাহিত্য ক্রমেই মাটির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। দেশের জীবন ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মননশীল প্রবন্ধসাহিত্য বাঙালীর যথার্থ চিন্তার বাহন হইল। বাংলার ঊনিশ শতকী রেনেসাঁস (নবজাগরণ) প্রধানতঃ এই ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

তৃতীয় পর্ব : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

একাদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) : কাব্য ও নাটক

বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানতঃ রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগ বলিয়া পরিচিত। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক হইতে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যথার্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতে সূচিত হয়।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেমন আমরা বঙ্কিমযুগ নাম দিয়া থাকি, তেমনি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ নাম দিতে পারি। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর হইতে বাংলা সাহিত্যে নূতনতর যুগসম্ভাবনার সূচনা হইয়াছে—যাহা রবীন্দ্র-বিরোধী না হইলেও রবীন্দ্রানুসারীও নহে। কোন-এক আধুনিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' বলিয়াছেন। কথাটা অতিশয় সত্য। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে একটা জ্ঞানভূয়িষ্ঠ বিশ্বভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ অনাগত কালের বাংলাভাষী মানুষের নিকট অম্লান মহিমায় বিরাজ করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

বঙ্কিমপর্বের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের মানসিক ভাবাকাশে সে যুগের যুগমানসটি বিচিত্র বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি করিয়াছিল। সামাজিক আন্দোলন, ব্রাহ্ম জীবনাদর্শ, হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শ, পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ, রাজনৈতিক চেতনা—এই সমস্ত বস্তুগ্রাহ্য পটভূমিকায় এইযুগের বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগপ্রভাব, কালধর্ম ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও মৃত্তিকার গভীরে পুরাপুরি শিকড় চালাইতে সমর্থ হয় নাই। কিয়দংশে বায়রনীয় আদর্শ, রোমান্টিক চেতনা এবং গ্রন্থলব্ধ সংস্কার এই যুগসাহিত্যকে প্রাণরসে ভরিয়া তুলিয়াছিল ; তাই সামাজিক আন্দোলন যেমন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রিক আন্দোলনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রণালীকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রভাব-মুক্ত রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা প্রচন্ড ভাবাবেগরূপে আবির্ভূত হইতে কিছু সঙ্কুচিত

---

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান গ্রন্থের তালিকা :—'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রাণী (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৮২), 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮০), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত জীবন ও সমাজে বাংলা সাহিত্যের অভিনব বিকাশধারা লক্ষিত হইবে। এই যুগের সাহিত্যে অর্ধশতাব্দীর যাবতীয় আন্দোলন ও চিন্তাপ্রণালী কোথাও সূক্ষ্মভাবে অলক্ষিতে, কোথাও বা প্রত্যক্ষভাবে আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একই সময়ে ভাববাদী অধ্যাত্মচেতনা, রোমাণ্টিক স্বপ্নবিলাস এবং ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষ জীবন সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে; বাঙালীর জীবনসংকট, বাস্তব সমস্যা, অধ্যাত্ম দ্বন্দ্ব—সমস্ত কিছুকেই বাংলা সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। তাই বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর সাম্প্রতিক ধ্যানধারণা, চৈতন্যের প্রসরণশীলতা, জীবন সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং তাহারই সঙ্গে পরাজয়ী মানবাত্মার বিক্ষোভ, সমাজ সংস্কৃতির পুরাতন কাঠামো ভাঙিয়া-চুরিয়া, জীবনের সনাতন মূল্যবোধগুলিকে অবহেলাভরে উড়াইয়া দিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক জীবনকে একেবারে বন্ধনমুক্ত করিবার উদ্দাম বাসনা যেমন জীবনে উগ্র হইয়া উঠিতেছে, সাহিত্যেও তেমনি তাহার উত্তাপ স্পর্শ করিতেছে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া সদাশয় সরকারের নিকট শুধু সকরুণ আবেদন-নিবেদনের তালিকা পেশ করিয়াই স্বাদেশিক গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অভিজাত প্রতিষ্ঠানেও নবজীবনের যৌবন-জলতরঙ্গ প্রবেশ করিল। ১৮৯০ সালের পর বোম্বাই প্রদেশে গণপতি-মেলা এবং শিবাজী-উৎসবের সাহায্যে পশ্চিম-ভারতে সংগ্রামী মনোভাব উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে ইহার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার ১৮৯১ সাল হইতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন এবং ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করিলেন। ফলে বাংলাদেশে দাবানলের মতো জনবিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িল; মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহাতে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে রহিলেন না; সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যাভিনয়, লোকাভিনয় প্রভৃতিতে অতি দ্রুতবেগে বিপ্লবী প্রাণশক্তির বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল। এই আন্দোলনের কালপরিমাণ—১৯০৩-১৯১০ সাল। মহারাষ্ট্র ও বাংলায় প্রায় এক সময়ে একই রূপ তীব্র স্বাদেশিক আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে অভিনব বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চার করিল। কংগ্রেসের স্থবির আদর্শেও ফাটল ধরিল; লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ—ইঁহাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিধা-সঙ্কোচ অনেকটা হ্রাস পাইল। অবশ্য কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কোন দিনই সন্ধি হয় নাই, সুরাট কংগ্রেসে উভয়ের মতভেদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। প্রায় এই সময় (১৯০৭) হইতে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোপনীয় পন্থা গ্রহণ করিল। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' ইংরাজ নিধনের জন্য গোপনে গোপনে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৩০ সাল—প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাংলার যুবসমাজ গোপনসঞ্চারী সন্ত্রাসবাদী

কার্যধারা পরিচালিত করিয়াছিলেন। মুসলমানকে জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার জন্য লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ সালে এই সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক-নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন, এবং তাহার ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া শুরু হইল। কিন্তু স্বাদেশিক আন্দোলন হ্রাস পাইল না। বাধ্য হইয়া তৎকালীন রাষ্ট্রসচিব মর্লি এবং গভর্ণর-জেনারেল মিণ্টো ১৯০৯ সালে শাসন সংস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কংগ্রেসের আন্দোলন হ্রাস পাইল না। ইতিপূর্বে রুশ-জাপান যুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তিশালী রুশ জাতিকে জাপান শোচনীয়রূপে পরাভূত করিয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র প্রাচ্যজাতির এই অপূর্ব বীরত্বের দৃষ্টান্ত বাঙালীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায়ে গোপনে গোপনে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯১৪ সালে য়ুরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষতঃ ভারতের সঙ্গে জড়িত ছিল না বলিয়া বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইহার প্রায় কোন প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুদিনের আশায় ভারত এই যুদ্ধে সরকারের সহযোগিতা ও মিত্রশক্তিকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের আশাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল না। ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে যুদ্ধে সহযোগিতা করার পুরস্কার দিলেন রাউলাট অ্যাক্ট (১৯১৯) এবং জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)।

১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে জননেতারূপে আবির্ভূত হইলেন। ১৯১৭ সালে তাঁহার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিল। সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-অস্ত্রের সাহায্যে মহাত্মা ভারতীয় জনসাধারণের মনে নিরস্ত্র বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিলেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের ঘোষণা (১৯১৫) সত্ত্বেও ১৯২০ সালের মধ্যে এই আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। কিছুদিন কালহরণের পর ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন করিয়া এবং বিলাতে তিনবার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। আসলে মুসলমান সমাজকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উসকাইয়া দিয়া এবং হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর কলহ বাধাইয়া দিয়া ভারতের ঐক্যবদ্ধ স্বাদেশিক সংগ্রামকে হতবল করিয়া দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র অভিসন্ধি। মহাত্মা আন্দোলন করিলেন, অনশন করিলেন ; কিন্তু মুসলমানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যভাব দূর হইল না। গান্ধীজী হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিলেন—এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তাহার তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। ইতিপূর্বে মহাত্মাজী খিলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষে (১৯২০) হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাও আন্তরিক মিলন নহে। মুসলমানদের মধ্যযুগীয় মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়া মহাত্মা যে মিলন রচনা করিলেন, অল্প দিনের মধ্যে তাহা ভাঙিয়া পড়িল। ১৯২১ সালে সারা ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন প্রচণ্ড আকারে ব্রিটিশ বিরোধিতা করিল ; কিন্তু ভারতের

কল্যাণ অপেক্ষা তুরস্কের খলিফা-প্রীতি এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে অনগ্রসর মুসলমান সমাজে হানিকর সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইল। তারপর র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড্ এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন এবং ১৯২৩ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি প্রবর্তন করিলেন। পৃথক-নির্বাচন নীতি অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারত আইনের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান কার্যকর করা হইল। পাছে মুসলমান সম্প্রদায় বিগড়াইয়া যায়, এই বিপদ এড়াইবার জন্য অবশ্য কংগ্রেস 'না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি' গ্রহণ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিতে লাগিল। ১৯৩৬-৩৭ সালের পর বাংলা ও পাঞ্জাব ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইল ; এবার যুদ্ধ যথার্থই বাংলার দ্বারপ্রান্তে হানা দিল। যুদ্ধের বিশালতা নহে, ভয়াবহতাও নহে—ইহার কদর্য ক্ষুদ্রতা, সামাজিক ভাঙন, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, চরিত্রভ্রষ্টতা, নীচতা ভারতবর্ষকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শ্মশানধূমে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার শ্যামল প্রাণশক্তি বিবর্ণ হইয়া গেল। নীতিভ্রষ্ট, মূল্যমানভ্রষ্ট, মনুষ্যত্বহীন জীবনের পঙ্কবিলাসে আকণ্ঠমগ্ন বাঙালীর ঐতিহ্য মৃত্যুমুহূর্ত গণনা করিতে লাগিল।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব এবং তাহার পরে সরকারী চণ্ডনীতির ইতিহাস এখনও মলিন হইয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল শুভ স্বাস্থ্যবান আদর্শ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বহির্ভারতে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কীর্তিকাহিনী। ১৯৪৪ সালে মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পাইয়া মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে যথারীতি আপস-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। যাহা হউক ১৯৪৫-৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় প্রত্যেকটি অ-মুসলমান আসন অধিকার করিল। মহম্মদ আলী জিন্না পূর্বের মতোই মুসলমানকে পৃথক জাতি হিসাবে দাবি করিয়া এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিনষ্ট করিয়া গোটা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্ত প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। ১৯৪৭ সালে দুই জাতিতত্ত্বের (মুসলমান ও অ-মুসলমান) অযৌক্তিক, অন্যায়, অস্বাভাবিক ও মূঢ় নীতি মানিয়া এবং মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কংগ্রেস খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিল। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ—মোট সাড়ে আটশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া মুসলমান শাসক যাহার কথা চিন্তাও করিতে পারেন নাই, আধুনিককালে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট তাহা সম্ভব হইল। ভারতবর্ষ মুসলমান ও অ-মুসলমান (হিন্দু নহে)—দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গেল।

এই আন্দোলনের সঙ্গে আরও একটা আন্দোলন উল্লেখ করা কর্তব্য। ইহা সাম্যবাদী শ্রমিক আন্দোলন। ১৯১৭ সালে রুশদেশে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতেও তাহার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ইহার ফলে ১৯২০ সালে ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু স্তিমিত হইয়া

পীড়ন. সাম্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী কেহ কেহ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রহিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের অনেকের চিত্তে সাম্যবাদী দর্শন একমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিদানরূপে প্রতিভাত হয়। ১৯২১ সালের শেষের দিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং ১৯২২ সালে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের আদর্শ ও প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা শক্তিশালী অংশ কংগ্রেসের ধনতন্ত্র-ঘেঁষা আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই সাম্যবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৩০ সালে এই দল নিখিল-বিশ্ব-সাম্যবাদী বা তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের যথার্থ শাখাভুক্ত হইল। যাহা হউক কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে আবির্ভূত এই সাম্যবাদী দল শুধু যে শ্রমিক ও কৃষাণ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, বহুকাল-সঞ্চিত ভারতীয় চিন্তাধারায় ইঁহারা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে বদ্ধপরিকর হইলেন—যাহার অনেকটাই সম্পূর্ণরূপে অ-ভারতীয়, যাহাকে ইতিহাসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে।

বিংশ শতাব্দীর নানাবিধ আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সর্বপ্রথম দেশপ্রেম প্রবল আবেগরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রায় একই সময়ে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার রহস্যময় গতিবিধি, মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি ও রোমাণ্টিক ত্যাগ তিতিক্ষা বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রবুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংসানীতি, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। মহাত্মাজীর অহিংসাতত্ত্ব ও নীতিবাদ বাঙালীর বুদ্ধিকে তীক্ষ্ন এবং আবেগকে উদ্বেল করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং অসহযোগের পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন (যথা—কৃষাণমজদুর আন্দোলন, আগস্ট-বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব ইত্যাদি) বাংলা সাহিত্যকে বহু স্থলেই নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর মনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যুগের আন্দোলনগুলি যেমন বায়বীয় লোক ত্যাগ করিয়া কঠিন মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তেমনি এই যুগের সাহিত্যও বাহিরের প্রভাবকে স্বীকার করিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা

দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আশি বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া যে কাব্যসাধনা করিয়াছেন, তাহার বিপুল আয়তন, বিচিত্র রূপসজ্জা, ভাবলোকের অভূতপূর্ব বিস্ময়, চেতনার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের এমন সুষ্ঠু পরিচয় পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে অদ্ভুত ব্যাপার। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিককাল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—কোন দেশে, কোন কালে একটি কবিমানসের এত প্রাণৈশ্বর্য দৃষ্টিগোচর

হয় না। মহাকবি গ্যয়ঠের সঙ্গে তাঁহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু নানাদিক বিচারে রবীন্দ্র কাব্য প্রতিভা অনন্যসাধারণ। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই ছাপার অক্ষরে তাঁহার কবিতা মুদ্রিত হইতে থাকে। বাল্যকালে সেই সমস্ত অস্ফুটবাক কবিতাতেও একটা পরিণত মনের লক্ষণ ক্রমে ফুটিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠে আঁব।' কথাটা তিনি পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিলেও ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় রচনাগত ত্রুটি ও ভাবের শিথিলতা থাকিলেও ইহাতে একটি সুগঠিত কবিমানস সাড়া দিয়াছে।

সূচনা পর্ব ॥

ঠাকুরবাড়ীর মার্জিত, আভিজাত্যমণ্ডিত জীবন, পিতার ব্রহ্মনিষ্ঠ ঔপনিষদিক আদর্শ, পরিবারের স্বাদেশিক মনোভাব, শিল্পসাহিত্যে একনিষ্ঠ প্রীতি এবং চারিত্রিক সংযম আদর্শের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালিত হইয়াছিলেন। বাঁধাধরা শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, রুচিও ছিল না। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ নিয়মানুগ বিদ্যাতেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রাণহীন কঙ্কাল-তত্ত্ব অনুশীলনের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন এবং বাল্যে পিতার সাহচর্যে আসিয়া যথার্থ শিক্ষার আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বধূঠাকুরাণীর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী) উৎসাহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের উদ্দীপনা, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর গাথাকাব্যের প্রভাব, বিহারীলালের গীতরসাসিক্ত কাব্যনির্মিতি, আর তাহার সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভব, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, জয়দেবের গীতগোবিন্দের অপূর্ব ধ্বনিঝঙ্কার, 'পৌলবর্জিনীর'[২] রোমাণ্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যের আখ্যান এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত প্রাচীন-বৈষ্ণবপদের ব্রজবুলি কবির কিশোর চিত্তকে মাতাইয়া তুলিল। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা "দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ" ১২৮১ সনের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়; কিন্তু উহাতে কবির নাম ছিল না। বোলপুরে মহর্ষিদেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাস করিবার সময় তিনি 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামক একখানি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে কিশোর কবির এই রচনাটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম কবিতা হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীতে'র অনুকরণে রচিত 'হিন্দুমেলার উপহার' ১৮৭৫ সালে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে পঠিত হয় এবং পরে মুদ্রিত হয়। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর

---

২. সেণ্ট পিয়েরী (১৭৩৭-১৮১৪) নামক এক ফরাসী ঔপন্যাসিক ১৭৮৭ সালে *Paul et Virgine* শীর্ষক একখানি রোমাণ্টিক উপন্যাস রচনা করেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় (১২৭৫-৭৬ সন) 'পৌলবর্জিনী' নামে ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে 'অবোধবন্ধু'-তে এই কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন।

মাত্র। তাঁহার তের বৎসর হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যে রচিত কবিতাকে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের শৈশবপর্ব আখ্যা দিতে পারি। এই পর্বটি ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৮১ খ্রঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কয় বৎসরের মধ্যে কিশোর কবির 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) প্রভৃতি কাব্যকবিতা এবং 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়। 'শৈশবসঙ্গীত' ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইলেও পূর্বে রচিত অনেক কবিতা ইহাতে ঠাঁই পাইয়াছিল। এই যুগের সমস্ত কাব্যেই আখ্যানকাব্যের রীতি লক্ষ্য করা যায়—সম্ভবতঃ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যের প্রভাবে। কিশোর কবির আবেগব্যাকুল হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং নিজেকে নায়ক করিয়া চিত্রিত করিবার ইচ্ছা ব্যতীত ইহাতে প্রতিভার বিশেষ কোন চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। কেবল তাঁহার 'শৈশব সঙ্গীতে'র মধ্যে সংকলিত গুটিকয়েক কবিতার মধ্যে ভাবী কবির আভাস লক্ষ্য করা যায়। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের এই কাব্যকে তিনি উত্তরকালে লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ইতিহাসের অনুরোধে ক্রমরক্ষার প্রয়োজনেই ইহাদের যা কিছু মূল্য। তবু লক্ষ্য করা যাইবে, এই যুগের কাব্য ও নাটকে[৩] কবির প্রবল ব্যক্তিচেতনার প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে। কাব্যের গঠনকৌশলে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী পরিকল্পিত আখ্যানকাব্যের রীতি এবং অন্তর্জীবনে প্রতিফলিত কবি বিহারীলালের সৌন্দর্যস্নিগ্ধ নিসর্গচেতনা ও লীরিক অনুভূতি—কবির এই অপরিণত ও অপরিপক্ব কাব্যকবিতায় কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, —এইটুকুই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখনও নিজ স্বাতন্ত্র্যের পথ খুঁজিয়া পান নাই, বৃহৎ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হন নাই, গুটিপোকার লুতাতন্তুর মতো নিজের চারিদিকে ভাবাবেগের স্বর্ণজাল বয়ন করিয়া নিজেরই অস্পষ্ট কুহেলিমাখা রোমাণ্টিক আবেগের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিলেন। মুক্তি ঘটিল উহার পরের পর্বে—'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যাহার সূচনা।

অবশ্য কিশোর-কবি প্রথম মুক্তির স্বাদ পাইলেন ১২৮৪ সনের বর্ষাকালে (১৮৭৮)। সেই মুক্তির বশে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে শিথিল স্তবকবন্ধনে রাধার কথা লিখিলেন ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')। তবু পুরাপুরি স্বাতন্ত্র্য ফুটিল না। প্রাচীন রচনার নকলকারী বালককবি চ্যাটারটনের অনুকরণে বৈষ্ণব কবিদের ছককাটা পথ ধরিয়া তিনি অক্ষয় চৌধুরীকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি পরে বুঝিয়াছেন—উহাতে তাঁহার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে ফুটিতে পারে নাই ; তবু তাহার অস্পষ্ট আভাস আছে এবং আছে বলিয়াই পরবর্তী কালের কাব্যসংগ্রহ হইতে কৈশোর ও প্রথমযৌবনের সমস্ত অপরিপক্ব রচনা নির্মমভাবে বাদ দিয়াও তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে ভুলিতে পারেন নাই।

৩. নাটকের কথা নাট্যপর্বে আলোচিত হইবে।

উন্মেষ পর্ব ॥

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) হইতে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)—মোট চার বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা :—(১) 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), (২) 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), (৩) 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), (৪) 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), (৫) 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। এই পর্বকে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের উন্মেষ পর্ব নাম দিতে পারি ; কারণ এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ কৈশোর জীবনের অস্ফুট ভাব ও ভাষা এবং পূর্বতন কাব্যরীতির বৃথা-অনুকরণ ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথম স্বকীয় ভাবভাবনা, প্রকাশরীতি ও চিত্তবৈশিষ্ট্যের মধ্যে নবজন্ম লাভ করিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত' রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রথম স্মারক স্তম্ভ। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র রোমাণ্টিক বিষণ্ণতা, অন্তর্মুখীনতা, বাস্তবাতিচারী সুদূরের দীর্ঘনিশ্বাস এবং জগৎ ও জীবনকে উৎকট ব্যক্তিবাদ বা ego-র মধ্যে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার প্রথম মুক্তি ও আত্মসম্বিতের নিবিড় আস্বাদন ফুটিয়া উঠিল। এই পর্বের কবিতাকে কোন সমালোচক 'হৃদয়-অরণ্য' নাম দিয়াছেন। কবি এই যুগের কাব্যে আপন হৃদয়ের গোপন একাকিত্বের মধ্যে রোদন করিয়াছেন।

চলে গেল সকলেই চলে গেল গো।
বুক শুধু ভেঙ্গে গেল দলে গেল গো

এই ব্যাকুল বেদনাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অসম পংক্তির শিথিল স্তবকগুলিকে সায়াহ্নের দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া দিয়াছে। বলাই বাহুল্য কবি এই কাব্যে গতানুগতিক রোমান্সের স্বপ্নাঞ্জন চোখে আঁকিয়া নিজের অন্তর্গূঢ় অনুভূতির সীমায় বিশ্বকে ধরিতে চাহিয়াছেন বলিয়া উচ্ছ্বসিত বেদনা, অকারণ দুঃখ ('ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন ; ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।') এবং নিঃসঙ্গ জীবনের আর্তি, ইহাতে এত করুণভাবে অনুরণিত হইয়াছে। এই রোমাণ্টিক দুঃখবিলাস রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম নহে ; জগৎকে ভালবাসিয়া স্বীকৃতি দিয়া আপনাকে জগতের মধ্যে প্রতিফলিত করিবার বিপুল উচ্ছ্বাস ইহার পরেই 'প্রভাতসঙ্গীতে' (১৮৮৩) ফুটিয়া উঠিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার অসংলগ্নতা, অপ্রাসঙ্গিক দৈর্ঘ্য এবং কেন্দ্রীয় ভাবের শিথিলতা সত্ত্বেও ইহাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিষাদ, বেদনা, হতাশা ও একাকিত্বের অভিশাপ 'প্রভাতসঙ্গীতে' দূর হইল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে নূতন উপলব্ধির অবারিত আনন্দ ব্যক্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এই জগৎ-প্রতীতি ও মর্ত্যপ্রেম পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গানে' (১৮৮৪) দৈনন্দিন জীবনের হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনার ছোট ছোট চিত্রের মধ্যে কবি আপনাকে উপলব্ধি

করিলেন; কিন্তু 'ছবি ও গানে'র অন্তর্নিহিত জগৎ-প্রতীতি প্রকাশসুষমায় তখনও সার্থক হইতে পারে নাই। কবি হৃদয়অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও জগতের মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দিতে পারেন নাই। 'ছবি ও গান' চিত্রধর্মী ও সঙ্গীতধর্মী বটে; কিন্তু সে চিত্র অস্পষ্ট, সে সঙ্গীত অস্ফুট। 'কড়ি ও কোমলে'ই (১৮৮৬) কবির প্রথম স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিল এবং এই নিটোল সনেটগুচ্ছ এই উন্মেষপর্বের সর্বাপেক্ষা পরিপক্ব রচনা। এই কাব্যে তিনি মর্ত্যজীবনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন ঃ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জগতের রূপসৌন্দর্যকে দস্যুর মতো লুণ্ঠন করিয়া যৌবনের মাদক রসে মাতাল হইয়া জীবনের আর এক মূর্তি আবিষ্কার এই কাব্যের একটা বড় তাৎপর্য। কবি নারীসৌন্দর্যের যে উত্তপ্ত জয়গান করিয়াছেন, তাহা খানিকটা সুইনবার্ণসুলভ ইন্দ্রিয়পারবশ্যের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে—যাহা সমগ্র রবীন্দ্রজীবনেই এক অভিনব ব্যাপার।। তবে এই অপূর্ব সংহত সনেটগুচ্ছের শেষ রক্ষা হয় নাই। কবি শেষ পর্যন্ত দেহলীলার উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রকে অধরাগ্র হইতে ফিরাইয়া দিয়া আর্তনাদ করিয় উঠিয়াছেন। বহির্জগৎ ও ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্যে বন্দী হইয়া রবীন্দ্রনাথ পীড়নের ব্যথা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, 'কড়ি ও কোমলে'র কোমল লাবণ্যের মদিরা কবিকে অসীম মনোজগৎ হইতে যেন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ বস্তুজগতের মধ্যে টানিয়া আনিল। রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় পর্বে অভূতপূর্ব মুক্তির সূচনা—এবং রবীন্দ্রকাব্যের এই তৃতীয় পর্ব তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির গৌরব দিয়াছে। তাই আমরা তৃতীয় পর্বকে 'ঐশ্বর্য পর্ব' নাম দিতে পারি।

ঐশ্বর্য পর্ব ॥

রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সূচনা হইয়াছে 'মানসী'তে (১৮৯০) এবং ক্রমে ক্রমে 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)—ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার কবিপ্রতিভা বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই পর্বের পরে 'নৈবেদ্য', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইলেও কাব্যসৃষ্টির মৌলিকতা, শিল্পরূপ এবং চৈতন্যের গভীর উপলব্ধি বিচার করিলে এই ছয় বৎসরের কাব্যের ফসলকে অসাধারণ তাৎপর্যমণ্ডিত মনে হইবে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে 'কড়ি ও কোমলে' কবিচিত্ত পার্থিব চেতনার মধ্যে যেন শান্তি পাইতেছিল না। 'মানসী'র মধ্যেও অনুরূপ সংশয়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব বর্তমান। প্রেম ও প্রকৃতি এই দুইটি সুর ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। দেহ ও আত্মার অন্বয় সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও তিনি অবহিত হন নাই বলিয়া প্রেমকে দেহচেতনারই অঙ্গীভূত করিয়া

দেখিতেছেন এবং সেইজন্যই এত অশান্তি ও বিক্ষোভ। বাসনার বাস্তব উত্তাপে প্রেমকে পাওয়া যায় না—"নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।" তাই কবি এই কাব্যে প্রেমকে 'কড়ি ও কোমল' পর্বের দেহচেতনা হইতে মুক্তি দিয়া একেবারে মানসজগতে প্রস্থান করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, "আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।" তাই কবিহৃদয়ের মধ্যে দুরন্তবাসনা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে; কবি পোষমানা জীবনকে ত্যাগ করিয়া দুর্দান্ত কঠিন জীবনের বন্য আস্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন, প্রকৃতির মধ্যেও দ্বৈতসত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি কখনও 'অহল্যার প্রতি' ও 'মেঘদূত' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী মিলন দেখিতেছেন, কখনও প্রকৃতির মধ্যে বীভৎসতা ও মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন; কখনও-বা তিনি তদানীন্তন বাঙালী-জীবনের সঙ্কীর্ণতার উপর তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত করিতেছেন। অর্থাৎ চিত্ত-অন্তঃপুরের সঙ্গে বহির্জীবনের মিল ঘটাইতে না পারিয়া কবিকে মানস-জগতের অভিসারে বাহির হইতে হইতেছে। এই কাব্যেই তিনি বহু বিচিত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রেমের চেতনাকে একটি কেন্দ্রে সংহত করিবার চেষ্টা করিলেন। 'মানসী'র রচনারীতি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিলেও কবিমানস তখনও স্থৈর্য লাভ করিতে পারে নাই। সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য, জগতের প্রতি রোমাণ্টিক সৌন্দর্যবোধ এবং বহু বিচিত্রের মধ্যে মানসসুন্দরীর সন্ধান 'মানসী' কাব্যে কবিকে অপূর্ণ বাসনার মতো উত্তেজিত করিয়াছে। ইহার সামান্য পরে প্রকাশিত 'সোনার তরী'তে (১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ক্রমে একটা স্থৈর্যের সন্ধান পাইল, অশান্ত বিক্ষোভ অনেকটা দূর হইল।

'সোনার তরী' রবীন্দ্র-কবিজীবনের একটি বিশেষ প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'মানসী'তে কবি ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর আধিপত্য লাভ করিলেও বিশেষ ধরনের ভাবানুভূতির উপরে তখনও পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম সার্থক ইঙ্গিত দেখা দিল 'সোনার তরী'তে। এখানে তিনি নিসর্গের যে মোহনলোভন অপূর্ব মাধুরীর পরিচয় পাইলেন, তাহাকে ব্যক্তিমানসের সঙ্গে একীভূত করিয়া প্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচাইলেন, জাতিস্মর কবি সুদূর অতীত হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে নানা জীব-সম্পর্কে মিলিত হইলেন ("সমুদ্রের প্রতি", "বসুন্ধরা")। ইহারই সঙ্গে তাঁহার কবিচিত্তে প্রেমের এক অপূর্ব মূর্তি ফুটিয়া উঠিল এবং এই কাব্য হইতে কবির মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা প্রভৃতি তত্ত্বের সূত্রপাত হইল। প্রেমকে একটা নির্বস্তুক ভাবস্বরূপে না দেখিয়া তাহাকে তিনি মানবিক প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশ্য এ কাব্যেও কবির সঙ্গে কবির মানসসুন্দরীর পরিপূর্ণ মিলনের অন্বয় যোগ তখনও স্থাপিত হয় নাই। ইহার প্রথম কবিতায় লক্ষ্য করা যাইতেছে, কবি জীবনের উপকূলে সারা জীবনের ফসল লইয়া বসিয়া আছেন; সোনার তরীর নাবিক আসিয়া সোনার ধানগুলি লইয়া গেল, কিন্তু কবি শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিলেন। মহাকাল

কবিকে গ্রহণ করিলেন না। সর্বশেষ কবিতায় ('নিরুদ্দেশ যাত্রা') নৌকায় কবির ঠাঁই হইয়াছে। রহস্যময়ী রমণী তাঁহাকে নৌকায় স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তখনও পরিপূর্ণ মিলনের রূপটি ফুটে নাই। তাই আসন্ন সন্ধ্যার ঘনান্ধকার, অশান্ত সমুদ্রের মত্ত গর্জন এবং রমণীটির রহস্যময় নীরবতা কবির সংশয়কে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। এই কাব্যে কবির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে, দ্বৈতরূপের মধ্যে সর্বপ্রথম পরিচয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনন্যসাধারণ, বিশ্বসাহিত্যেও ইহার তুলনা পাওয়া ভার। তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা এই কাব্যেই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে মানসসুন্দরী জীবনদেবতা-তত্ত্ব ('চিত্রা', 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী', 'সিন্ধুপারে'), প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অদ্বৈত অনুভূতি ('প্রেমের অভিষেক'), অনন্ত সৌন্দর্যের স্তবগান ('উর্বশী', 'বিজয়িনী') প্রভৃতি বিষয় রবীন্দ্রনাথের পরিপক্ক মন, শান্তসমাহিত ভাবরসস্নিগ্ধ আবেশ, কুশলী বাক্‌রীতি এবং অপূর্ব সৌন্দর্যচেতনাকে সার্থক কাব্যশিল্পে পরিণত করিয়াছে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যেই একটা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া গিয়াছে। জগতের খণ্ডতা এবং কবিচেতনার অখণ্ড ঐশ্বর্য—এই দুইটিকে তিনি কিছুতেই একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না। 'চিত্রা' কাব্যে সমস্ত জগৎ ও জীবন এবং কবির ব্যক্তিগত ভাবানুষঙ্গ একসুরে বাজিয়া উঠিল। তিনি সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে বিচিত্ররূপিণী মানসসুন্দরীকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে", "অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তর-ব্যাপিনী",—এই ভিতর-বাহিরের অন্বয় সম্পর্কটি অপূর্ব কাব্যরসে ভরিয়া উঠিল। কবি বুঝিতে পারিলেন, কোন্ অলক্ষ্য হইতে কে যেন তাঁহার জীবন ও জীবনাতীত সত্তাকে আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকেই তিনি জীবনদেবতা নাম দিয়াছেন। এই কাব্যের সঙ্গেই একই বৎসরে (১৮৯৬) 'চৈতালি' প্রকাশিত হইল। এই পর্বের শেষ কাব্যখানিতে রবীন্দ্রনাথের একযুগের কাব্য সাধনার ইতিহাস সমাপ্ত হইল। পরিপূর্ণ জীবনের আনম্র ঐশ্বর্য, খণ্ড প্রত্যহকে অখণ্ড অনন্তের সঙ্গে গাঁথিয়া তুলিবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষে মানসপরিক্রমা—সর্বোপরি গাঢ়বদ্ধ সনেট রচনায় এই কাব্যখানি এই পর্বের শেষ ফসল। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চৈতালি'—চৈত্র মাসে সংগৃহীত বৎসরের শেষ ফসল। ইহার পর তাঁহার মন প্রাচীন ভারত, কল্পজগৎ ও বিশাল সৌন্দর্যলোকের মধ্যে আর একপ্রকার মুক্তি পাইল।

অন্তর্বর্তী পর্ব ॥

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ, প্রেম, সৌন্দর্য ও জীবন-দেবতা-তত্ত্বের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও রূপদক্ষের বিপুল কলাকৃতির সাহায্যে জগৎ ও

জীবনের মাঙ্গলিক রচনা করেন। কবি সর্বদা সীমাবদ্ধ প্রত্যয় এবং অসীম চৈতন্য—এই দুই বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন উপলব্ধি করিয়াছেন। 'চৈতালি' পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব রূপরসের ক্ষেত্রে একটা সমীকরণের রেখা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। 'চৈতালি'র কবি প্রাচীন ভারতকে যে নবরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী কাব্যে আরও স্পষ্ট হইল। 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০২), 'স্মরণ' (১৯০২-৩ সালের মধ্যে রচিত), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ' (১৯১৪ সালে কাব্যাকারে প্রকাশিত) এবং 'খেয়া' (১৯১০)—মোট দশ বৎসরের মধ্যে দশখানি কাব্য বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। শুধু একটি বৎসরেই (১৯০০) চারখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'কথা ও কাহিনী' এবং 'কল্পনা'র কয়েকটি কবিতায় কবির ইতিহাস-পরিক্রমা এবং প্রাচীন ভারতীয় জীবনে পদচারণা মূর্ত হইয়া উঠিল। 'চৈতালি'তে যে বৈশিষ্ট্যটির সূচনা হইয়াছিল, সেই ভারত আবিষ্কারের ব্যাকুলতা কবিকে প্রাচীন ভারতের পুরাণ, ইতিহাস, মহাকাব্যের বিশালতার মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল; 'কল্পনা' কাব্য এই পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপক্ব মনের সৃষ্টি। 'কল্পনা'র একদিক প্রাচীন ভারতের আত্মা আবিষ্কারের ঐকান্তিক বাসনা, আর একদিকে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া প্রাণশক্তির অমেয় প্রাচুর্য ঘোষণা বীর্যবান আত্মপ্রত্যয়কে ত্বরান্বিত করিল। তাঁহার একটি মন "দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনী পুরে" রজনীর অন্ধকারে পূর্বজন্মের প্রিয়াকে সন্ধান করিয়াছে, আর এক মন সমস্ত বাধাবিপত্তি টুটিয়া, মৃত্যুমারী পার হইয়া মানসবিহঙ্গকে অনন্ত আকাশে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছে, "ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।" তাই বৈশাখের রক্তচক্ষু দীর্ঘনিশ্বাস, বর্ষার মেঘমন্দ্রমধুর কাজরীগাথা—সমস্ত কিছুর মধ্যে কল্পনা অপরূপ ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিলেও তৎকালীন দেশ ও সমাজের সঙ্কীর্ণ গন্ডি ছাড়িয়া উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিয়া তাঁহার মহাজীবনের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা জাগিয়াছে। তাই 'বর্ষশেষ' এবং 'অশেষে'র মধ্যে দীপ্ত জীবনের জয়োল্লাস নব দিগন্তে নূতন আশার বিদ্যুৎকশা হানিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মলীন চেতনাকে বিশ্বতোমুখী করিয়া তুলিল। 'ক্ষণিকা'র মধ্যে আপাত চটুল ছন্দ ও বাগ্‌বিন্যাসের হালকা রীতির মধ্যে কবি যেন ক্ষণশাশ্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে 'বলাকা' কাব্যের তত্ত্বলোকে কবির যে মানসমুক্তি ঘটিয়াছিল, 'ক্ষণিকা'র মধ্যে প্রেম, সৌন্দর্য ও নিসর্গলোকে সেই মুক্তি ঘটিল। জগৎকে ভালবাসিয়া, ইহার মানবযাত্রায় যোগ দিয়া 'ক্ষণিকা'র কবি ক্ষণমুহূর্তকেই অনন্ত রসে পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল, "সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা"—এই উক্তিতে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের রস-সাধনার ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নৈবেদ্য' কাব্যের অধিকাংশই সনেট, এবং স্তবকবন্ধে রচিত কিছু গান। সমকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এবং সামাজিক মুক্তি-ইচ্ছা প্রবল আবেগরূপে রবীন্দ্রচিত্তে প্রতিহত হইল। 'কল্পনা' কাব্যে তিনি প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণের

মধ্যে মানস-পরিক্রমা করিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে তিনি আধুনিক দেশ ও কালের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। একদিকে গানগুলির মধ্যে জীবনেশ্বরকে প্রিয়রূপে, পিতারূপে, সখারূপে অন্তরতম করিয়া পাইবার ইচ্ছা, আর একদিকে সনেটগুলিতে তদানীন্তন বিশ্বের লোভলোলুপতা এবং অবহেলিত ভারতের মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতি ধিক্কার। কবি এখন 'প্রফেট'রূপে দেখা দিলেন। যুগসঞ্চিত কলুষ-গ্লানিকে উদ্দীপ্ত রোষারুণ উত্তাপে ভস্মসাৎ করিয়া কবি মহৎ মনুষ্যধর্ম ও বৃহৎ ভারতের মানবতা, বীর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পুণ্যক্ষেত্রে পাবনীমূর্তির চিত্র অঙ্কন করিলেন। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যথা শির", সেই গগনস্পর্শী মানবমহিমার তুঙ্গলোকে তিনি অধঃপতিত জাতিকে আহ্বান করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অনেকগুলি দুর্ঘটনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। স্ত্রী গিয়াছেন, পুত্র-কন্য গিয়াছে। কবি শূন্য স্মৃতি আগলিয়া বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পত্নীপ্রেম নিরুচ্ছ্বসিত আবেগে স্ফটিকবর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তিগত বেদনাকে তিনি আপন হৃদয়েই রাখিয়া দিতেন। তবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর 'স্মরণ' রচিত হইল ; জীবনে যিনি কল্যাণী-গেহিনী ছিলেন, মৃত্যুর চিতাধূমের মধ্যে তাঁহার বহিরন্তরব্যাপিনী মূর্তি কবির নয়নে প্রতিভাত হইল। সন্তান ক'টিকে বুকে করিয়া কবি কঠোর কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করিলেন বটে, কিন্তু শিশুগুলিকে কি দিয়া ভুলান যায়? রচিত হইল 'শিশু'। শিশুর রূপকথাপ্রিয় রোমাণ্টিক কল্পনাকে এমন অপূর্ব রঙে রসে ভরিয়া তুলিবার দুর্লভ ক্ষমতা বিশ্বের কোন কবিই দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা রূপকথা লিখিয়াছেন, 'পিটার প্যান' রচনা করিয়াছেন, 'ব্লু বার্ড" লিখিয়াছেন, কিন্তু শিশুর অন্তস্তলে এমন করিয়া কেহ আলো নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই পর্বের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কাব্য—'খেয়া'। খেয়া নামটি খুবই অর্থদ্যোতক। কবির ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর ঝড় বহিয়া গিয়াছে। প্রত্যহের পরিচিত সংসার যেন মলিন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ গূঢ় সর্প ফুঁসিতেছে। কবি সমগ্র দেশকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও মহৎ মানবতত্ত্বের মধ্যে মিলাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সমস্ত আন্দোলন গোপনচারী সুড়ঙ্গপথে ভয়ঙ্করের অভিসারে বাহির হইল, তখন কবিকে বলিতে হইল,

> বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
> কাজের পথে আমি তো আর নাই।

তখনই কবি ওপারের মসীমাখা আর এক জগতের সন্ধান পাইলেন—"দুখযামিনীর বুকচেরা ধন হেরিনু একি।" কবি 'চিত্রা'-কল্পনার' জগৎ ছাড়িয়া আর এক জগতে যাত্রা করিতেছেন—তাহা 'গীতাঞ্জলি'র জগৎ। রূপজগৎ ও অরূপজগৎ—এ দুইয়ের মধ্যে 'খেয়া'র জগৎ। খেয়ানৌকা যেমন একঘাট হইতে অপর ঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি

কবিও প্রেমসৌন্দর্যের জগৎ ছাড়িয়া ভক্তি ও অধ্যাত্ম-সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করিলেন।

গীতাঞ্জলি পর্ব ॥

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকসমাজে পূর্ব হইতেই যে ভক্তির আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কবিতাগুলির জন্য—বিশেষতঃ তিনি যে বিশ্বকবি বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহাও এই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদের জন্য। ১৯১৩ সালে তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ (Song Offerings) সুইডিশ একাডেমির বিচারে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে নির্বাচিত হইল।[৪] কবিও স্বদেশ-বিদেশে প্রচুর সম্মান পাইলেন; পাশ্চাত্ত্য সারস্বত সমাজ ও ঐতিহ্যের জগতে ভারতবর্ষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল। পরবর্তী দীর্ঘ দুই দশক ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার কাব্য ও অন্যান্য রচনা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই পর্বটিকে তাই আমরা 'গীতাঞ্জলি' পর্ব নাম দিতে পারি। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি' (১৯১৫)—মোট তিনখানি কাব্যে যে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল বাংলা সাহিত্যের তাহা অমূল্য সম্পদ। এই পর্বের কবিতাগুলি মূলতঃ গান—সুরে তালে গেয়। যাহা গীত হইবার জন্য রচিত হয়, পাঠে তাহার অনেক অংশ দুর্বল মনে হয়। কিন্তু এই তিনখানি কাব্য সেইদিক দিয়া একটা বড়ো রকমের ব্যতিক্রম। কবিতা হিসাবেই ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

'গীতাঞ্জলি' পর্বটিকে আমরা রবীন্দ্র-কবিচেতনার অধ্যাত্মপর্ব নাম দিতে পারি। ইতিপূর্বে 'খেয়া' কাব্যে দেখা গিয়াছে, কবি বস্তুলোক ছাড়িয়া অন্তর্লোকের যাত্রী হইতে চলিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি'তে সেই অন্তর্লোকের অপূর্ব গীতিমাধুর্য ঝরিয়া পড়িল। কবি অন্তরদেবতাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে—বিভিন্ন মানবরসের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে মিলনের পূর্ণ রূপটি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'গীতাঞ্জলি' অশ্রুনিবিড় বিরহের রসে আর্দ্র; ধনজনমানসম্ভ্রমের বাধা কিছুতেই ঘুচে না, চরণধূলার তলে মাথা নত হইতে চায় না। তাই কবিকে ঝড়ের রাত্রে প্রিয়ের অভিসারে বাহির হইতে হয়, কখনও-বা তিনি শূন্য-দুয়ারে হতাশমনে চাহিয়া থাকেন, শুধু মনে পদধ্বনি বাজে, "ঐ যে আসে, আসে, আসে।" এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের জন্য বুকফাটা আর্তি 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে একই সঙ্গে ভাগবত মহিমা ও মানবরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে যুগে এবং এ যুগেও অনেক সমালোচক 'গীতাঞ্জলি'র প্রতি কিছু প্রতিকূল। তাঁহারা মনে করেন, 'গীতাঞ্জলি'র ধর্ম-সাধনা, ভাগবত উপলব্ধি এবং অধ্যাত্মচেতনা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে—ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তসম্প্রদায়ের রসে-লালিত মনের কাছে তো নহেই।

৪. ইহাতে শুধু 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাই অনূদিত হয় নাই। 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' এবং 'গীতিমাল্যে'র কিছু কবিতা ও গানের অনুবাদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

কোন-এক সমালোচক এ বিষয়ে বলিয়াছেন, "গীতাঞ্জলি অসমাপ্ত সুরের, অসমাপ্ত সাধনার কাব্য।" আমাদের তো মনে হয়, এই 'অসমাপ্ত সুর', 'অসমাপ্ত সাধনা'ই 'গীতাঞ্জলি'কে যথার্থ কাব্যপদবাচ্য করিয়াছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 'গীতাঞ্জলি' পর্বের অধ্যাত্মসাধনা নিছক নীতিসাধনাও নহে, ধর্মাচারও নহে। তীব্র বিরহের নিবিড় উপলব্ধির এই গানগুলির অধ্যাত্মরসের মধ্যেও অপরূপ বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে। 'চিত্রা' হইতে 'কল্পনা'-'খেয়া' পর্যন্ত 'জীবনদেবতা,' 'মানসসুন্দরী', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিমানসটি যে বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে ধাবিত হইতেছিল, 'গীতাঞ্জলি' তাহারই একটি স্বাভাবিক বিকাশ। কবিত্বের দিক দিয়া ইহা অবশ্য 'চিত্রা' ও 'কল্পনা'র সমকক্ষ নহে, তবে ইহার অধ্যাত্মচেতনা কাব্যের কাব্যগুণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, একথা যথার্থ নহে।

'গীতাঞ্জলি'তে নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধ এবং প্রাণেশের সঙ্গে বিরহ ব্যথার যোগ স্থাপিত হইয়াছে; 'গীতালি'তে তাহার আর এক বৈচিত্র্য দেখা গেল। এই কাব্যগ্রন্থ আসলে গীতিসংগ্রহ—তত্ত্ব নহে, অধ্যাত্মসাধনা নহে। পরম প্রেমিকের বেশে কবির দেবতা দেখা দিলেন। উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় লীলারসের আসক্তি ফুটিয়া উঠিল। তাই কবি সার্থক আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।" উপলব্ধির নিবিড়তা 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'কে 'গীতাঞ্জলি' অপেক্ষা আর একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য দান করিয়াছে। তাই তিনি 'গীতালি'র কবিতায় জগৎ ও জীবনকে পরম আসক্তির আশ্লেষে ঘেরিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন,

> জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
> ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
> পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।

অবশ্য 'গীতালি'র মধ্যে আবার 'গীতাঞ্জলি'র তত্ত্বপ্রাধান্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রজীবনের একটা বড় অংশ অধ্যাত্মপিপাসা। মহর্ষির সান্নিধ্যে ও ঔপনিষদিক তত্ত্বরসে নিষ্ণাত হইয়া এবং বাংলার বৈষ্ণবকাব্য ও অন্যান্য প্রদেশের সাধুসন্তদের ভক্তিরসে অবগাহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে এই তিনখানি গীতিগুচ্ছ রচনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই অধ্যাত্মরসের কবিতাতেও একটা নিবিড় পার্থিব আসক্তির উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই নিছক ধর্মীয় সাহিত্য বা ভজনগীতিকার আদর্শে এই গীতিগুচ্ছত্রয় বিচার্য নহে।

বলাকা পর্ব ॥

রবীন্দ্র-কবিজীবনের সর্বশেষ পরিণত পরিপক্ব পর্বটিকে আমরা 'বলাকা'র নামানুসারে চিহ্নিত করিতে পারি। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) এবং 'মহুয়া' (১৯২৯)—এই পর্বের তিনখানি কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়জীবনের প্রসন্ন স্নিগ্ধতার মধ্যে রচিত হইলেও ইহার প্রত্যেকটিতে যে জাগ্রত জীবনবোধ, বুদ্ধির যে

বিস্ময়কর দীপ্তি এবং জগৎ সম্বন্ধে যে বিশালতার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা প্রৌঢ়জীবনের মন্থরতার মধ্যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহা এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের স্বাভাবিক প্রবণতা অধ্যাত্মমুখী ; সাধারণ রীতি ও প্রবণতা অনুসারে এইখানেই কবিজীবনের ছেদরেখা পড়িতে পারে। যে কবি এতদিন প্রেম, সৌন্দর্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র সূক্ষ্ম ভক্তির গভীর রসে নিমজ্জিত হইলে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু আকস্মিকের ঝড়ো হাওয়ার বেগে কবির লেখনী হইতে 'বলাকা' বাহির হইয়া গেল। এই সময় তিনি পাশ্চাত্ত্য জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। য়ুরোপে তখন সর্বনাশা যুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রভাবে মানবচিত্ত ব্যথিত ও ক্লিষ্ট। ফরাসী দার্শনিক আঁরি বার্গস‍ঁ-এর *Elan Vital* বা ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ত্ব য়ুরোপে দার্শনিক ও শিল্পীমহলে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। এই মতবাদের অর্থ—অনন্ত, অবারিত, অপরিণামী গতিপ্রবাহই সৃষ্টি ; থামিয়া থাকার নাম মৃত্যু, 'অকারণ অবারণ চলা'ই জীবন, অনন্ত গতিই একমাত্র সত্য। এই গতিবাদ একটা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ; কবি কিন্তু তাঁহার অন্তরে এই তত্ত্বের আঘাতে একটা বড়ো কাব্যসত্য লাভ করিলেন। 'শাজাহান', 'ছবি', 'চঞ্চলা', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতায় 'ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা' কবিকে অনন্ত গতিবেগে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সম্রাট শাজাহান শুধু মৃত মমতাজের স্মৃতি আঁকড়াইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া নাই, নদী একস্থানে থামিয়া থাকে না। রেখার-বন্ধনের মধ্যে চিত্রের চূড়ান্ত সত্য নিহিত নাই। সমস্ত সৃষ্টি অনন্ত অভিসারে ছুটিয়াছে। মৃত্যুস্নানের মধ্য দিয়া জীবন নিত্য শুচি হইয়া উঠিতেছে। 'বলাকা' কবিতায় একদল হংসবলাকার পক্ষবিধূনন কবিকে নূতন গতিবেগে উদ্দাম করিয়া তুলিল। তখন তাঁহার মনে হইল, "পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।" এই তীব্র গতিবেগের নামহীন, আকারহীন, অনিবার প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের আবেগকে একটা নূতন উপলব্ধির রসে ভরিয়া তুলিল। যৌবনকে তিনি রাজটীকা দিলেন—যে যৌবন স্থবিরের নিষেধ অবহেলা করিয়া উদ্ধত আবেগে জগৎ ও জীবনকে মুঠি ভরিয়া গ্রহণ করিতে চায়। অবশ্য এই 'বলাকা' কাব্যের কোন কোন কবিতায় আবার ('ঝড়ের খেয়া') বৃহৎ জীবনের সঙ্গে জীবনের বাস্তব আদর্শও কবিকে উতলা করিয়াছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনকে জয়ী করিবার জন্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে পথিককে আহ্বান করিলেন, "যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল—এসেছে আদেশ।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, 'বলাকা' কাব্যে যেমন উদ্দাম গতিবেগ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তেমনি এই কাব্যের শেষের দিকে তাঁহার আস্তিক্যবাদী মন বিদ্রোহী হইয়াছে। জগতের সমস্তই পরিণামহীন বিকাশের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর কিছুই স্থিতিশীল নয়, কিছুই থাকিবে না,—ভারতীয় তত্ত্বরসে লালিত রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই বৈজ্ঞানিক গতিবাদ পুরাপুরি মানিতে পারেন নাই, "এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোন মিল।" গতি ও স্থিতির মধ্যে তিনি একটা সমন্বয়ের রেখা আবিষ্কার করিলেন ; গতি ও

বিকাশের মধ্য দিয়া জীবন পূর্ণতর সত্যের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেছে—এই আশ্বাসবাণী 'বলাকা' কাব্যের অন্তিমে একটা জ্যোতির্ময় স্থির বিন্দুর মতো বিরাজ করিয়াছে। তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'বলাকা' কাব্যের অসম ছন্দের মধ্যে যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া গেল এবং শব্দ প্রয়োগে যে বুদ্ধি-দীপ্তির স্ফুরণ দেখা দিল, তাহা পূর্বতন পর্বসমূহে খুব সুলভ নহে।

'পলাতকা'র মধ্যে মর্ত্যধরিত্রীর যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'পূরবী'র মধ্যে তাহাই নবরূপ ও অপূর্ব দীপ্তির সঙ্গে দিগন্তে জ্বলিয়া উঠিল। নিভিবার আগে দীপশিখা শেষবারের মতো জ্বলিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অন্ত্যপর্বের অভিনব কাব্যপ্রকরণে প্রস্থান করিবার পূর্বে 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র মধ্যে রক্তিম যৌবনের সমস্ত আবেগ-আসক্তি ঢালিয়া দিয়া বৈরাগ্যের গেরুয়া উত্তরীয় ধারণ করিয়া নূতন জগতে অবতীর্ণ হইলেন। 'পূরবী' কাব্যে কবি আবার 'লীলাসঙ্গিনী'র হাতছানি লক্ষ্য করিলেন ; কিন্তু তখন যৌবনের কিংশুক-মঞ্জরী ঝরিয়া পড়িয়াছে, রবির ছন্দে পূরবীর বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হইয়াছে। 'পূরবী'র "তপোভঙ্গ" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। 'বলাকা'র কোন কোন কবিতা তত্ত্বের দিক দিয়া উচ্চস্তরের হইলেও সমস্ত দিক বিচারে 'তপোভঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। মহেশ্বরের তপোভঙ্গের প্রতীকের মধ্য দিয়া কবি নিজ কাব্য-জীবনের অখন্ড সৌন্দর্য ও যৌবনের জয়মাল্য ধারণ করিয়াছেন। 'মহুয়া' কাব্যে যে সমস্ত কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি-শক্তিকেই প্রমাণিত করিল। তিনি প্রেমের সাধনবেগকে প্রতিদিনের তুচ্ছতা ও আরামের পঙ্কশয্যা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৃহৎ ও মহৎ কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন ('উজ্জীবন')—যাহা ইতিপূর্বে-রচিত প্রেমের কবিতায় বিশেষ লক্ষ্যগোচর হয় নাই। এতদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যক্ষেত্রে যে বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, য়ুরোপের যে-কোন কবির পক্ষে তাহা বিস্ময়কর ও পরম শ্লাঘনীয়। আমরা কথায় কথায় গ্যয়ঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা দিই বটে, কিন্তু জার্মান মহাকবি নানাবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইলেও উপলব্ধির গভীরতা, বিচিত্রের লীলারস উপলব্ধি এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের তন্ময়ীভূত আত্মার অভিবন্দনায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 'পূরবী' ও 'মহুয়ার' পর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রধান পর্বের সমাপ্তি হইল। ইহার পর ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪১ সাল—এগার বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনধর্ম, সাধনা, প্রকাশরীতির আর একটি নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে, যাহার সঙ্গে এই সমস্ত পর্বের বিরোধিতা না থাকিলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক খুব নিবিড় নহে।

অন্ত্যপর্ব ॥

১৯২৯ সালের কথা। কবি আটষট্টি বৎসরে পৌঁছাইয়াছেন। শরীরে জরার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। এবার কি সারস্বত জীবন হইতে বিদায়ের বাঁশী বাজিল? কিন্তু

পৃথিবীর এই এক বড় বিস্ময়—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির আনন্দ ভুলিতে পারেন নাই। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল—মোট বারো বৎসরের মধ্যে তাঁহার অন্তত: বারোখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতা কবিকে পীড়িত করিয়াছিল, দীর্ঘকাল জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে শঙ্কিত মুহূর্ত যাপন করিতে হইয়াছিল। এই শেষ কয় বৎসরের কাব্যসৃষ্টি রবীন্দ্র-কবিজীবনেরও একটা অপরূপ বিস্ময় বলিয়া মনে হইবে। এতদিন ধরিয়া বাক্‌নির্মিতি ও ভাববস্তু যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহার একটা একমুখী ঐক্য ছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'মহুয়া' (১৮৮২-১৯২৯) প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া তিনি কাব্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রূপকলাগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকিলেও কবি পুরাতন ছন্দরীতিকেই গ্রহণ করিয়া অসীম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বিষয়বস্তুর দিক হইতেও সনাতন রীতিপ্রকরণ ছাড়িয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। একমাত্র 'বলাকা' কাব্যেই নূতনের জয়ধ্বনি শোনা গিয়াছিল, অবশ্য 'বলাকা'র শেষের দিকে কবি আবার আস্তিক্যবাদী মনোধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পরে 'বনবাণী'তে (১৯৩১) বৃক্ষ বন্দনাসূচক অনেকগুলি কবিতা সংকলিত হইয়াছে; ইহাতে নিসর্গ-প্রকৃতির যে সশ্রদ্ধ রূপটি অপরূপ ধ্বনিমাধুর্যে ও চিত্রপ্রতীকের সাহায্যে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার ভাষা ও ছন্দ কোন অভিনব ব্যাপার নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের অন্ত্যপর্ব যথার্থ শুরু হইল 'পুনশ্চ' (১৯৩২) হইতে। 'পুনশ্চ' হইতে 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—চারি বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইল—'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—অন্ত্যপর্বের প্রথম দিকের এই কয়খানি কাব্যকে আমরা 'পুনশ্চ' বর্গের কাব্য বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'বলাকা'য় যে প্রবহমান পয়ার ছন্দের নূতন পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এই 'পুনশ্চ' বর্গের কাব্যগুলিতে ভাষা ও ছন্দরীতির দিক দিয়া তাহারই এক চূড়ান্ত রূপে প্রত্যক্ষ করা গেল। 'পুনশ্চ' হইতেই গদ্যকবিতার সূচনা এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্যচ্ছন্দই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের বাণীবাহক। ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া ছন্দের বন্ধন ও মুক্তির যুগপৎ লীলা উপভোগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে 'লিপিকা'য় তিনি গদ্যের অনুচ্ছেদ-বন্ধনে গদ্যকবিতার স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অবশ্য গদ্যকবিতার মূল রীতিটি রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে ১২৯২ সালে রাজকৃষ্ণ রায় প্রথম উদ্ভাবন করেন; তাঁহার 'অবসর-সরোজিনী' কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে দুইটি গদ্যকবিতা সংকলিত হইয়াছিল। 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দমুক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এই পর্বের কাব্যগুলিতে তাহাই গদ্যচ্ছন্দে রচিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর দিক হইতেও ইহাতে খুব একটা মৌলিক দিকপরিবর্তন সূচিত হইতেছে না। কবি দৈনন্দিন ভাঙাচোরা জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, মনে করিয়াছেন—রোমান্স ও কল্পলোকের জীবন হইতে যেন তাঁহার নির্বাসন ঘনাইয়া আসিতেছে। জীবনের পারঘাটে আসিয়া

তিনি কিছুটা মোহনির্মুক্ত বৈরাগ্যের দৃষ্টি দিয়া পরিপার্শ্বকে দেখিয়া লইতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, গদ্যকবিতার ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের ছন্দমুক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং এই ছন্দই তাঁহার প্রধান গৌরবস্থল। ইহাতে তিনি যে ধরনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ('শ্যামলী'র "ছেলেটা"), তাহা সমমাত্রিক ও অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দে সম্ভব হইত না। এই মন্তব্য কিন্তু আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। লঘু চালের ছন্দে জীবনের প্রত্যক্ষতাকেও যে ফুটাইতে পারা যায়, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'। কাজেই গদ্যচ্ছন্দ অবলম্বিত না হইলে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনের অনেক কথাই বলিতে পারিতেন না, একথা সত্য নহে। কারণ মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বে আবার তিনি মিলহীন ও মিলযুক্ত ছন্দোস্পন্দনে (rhythm) ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, 'পুনশ্চ'বর্গের কাব্যের স্বাদবৈচিত্র্য অবশ্য স্বীকার্য। এই বর্গের পর তাঁহার কতকগুলি লঘুধরনের হাস্যপরিহাসযুক্ত কাব্যগ্রন্থ ('খাপছাড়া'—১৯৩৭, 'ছড়া ও ছবি'—১৯৩৭, 'প্রহাসিনী'—১৯৩৯) প্রকাশিত হইলে তাঁহার জীবনের-প্রীতিনিষিক্ত কলহাস্যমুখর আর এক রূপকল্পের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু অন্ত্যপর্বের শেষ কয়খানি কাব্য ('প্রান্তিক'—১৯৩৮, 'সেঁজুতি'—১৯৩৮, 'আকাশ প্রদীপ'—১৯৩৯, 'নবজাতক'—১৯৪০, 'সানাই'—১৯৪০, 'রোগশয্যায়'—১৯৪০ 'আরোগ্য'—১৯৪১, 'জন্মদিনে'—১৯৪১, এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া'—১৯৪৩, 'শেষলেখা'—১৯৪১) এমন কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে যে, মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও বাস্তবদৃষ্টির অখণ্ড ঐক্য পাঠকের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে। এই সময়ে য়ুরোপে সর্বনাশা যুদ্ধের মারণযজ্ঞ চলিতেছিল; পৃথিবীর বায়ু বারুদের ধূমে বিষাইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে সেই খণ্ডিত কবন্ধের প্রেতচ্ছায়াকে দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন; উপরন্তু তিনি মৃত্তিকার মানুষের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে চাহিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া যে রোমান্স, ভাগবত চেতনা ও ভাববাদের জ্যোতির্ময় নির্মোক কবির বাস্তব দৃষ্টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, শেষজীবনে রোগপাণ্ডুর দৃষ্টি-ক্ষীণতার মধ্য দিয়াও কবির তীব্রতীক্ষ্ণ অনুভূতি সেই বাস্তব জীবনের মহিমা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাঁহার জীবনের শেষ তিন বৎসরের এই অভিনব রূপান্তর আধুনিক সমালোচকের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৯৩৮—১৯৪১, এই তিন বৎসরই রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, চূড়ান্ত সৃষ্টি। কারণ তিনি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করিয়া প্রত্যহের জীবনবেগের সৃষ্টিশীলতাকে মানিয়া লইয়াছেন, পূর্বতন কাব্যকে বরবাদ করিয়া এই তিন বৎসরের কাব্যে জনতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং যুদ্ধবাজ ফ্যাসিশক্তির বিরুদ্ধে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু এই যুগের কাব্যে তিনি মানুষের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইতিহাসের রথচক্রকে গতিমুখর করিয়াছেন—ইহাও যেমন সত্য, তেমনি ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মমুক্তির অনির্বাণ পিপাসা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও

তেমনি সত্য। অসীম বৈচিত্র্যপিয়াসী রবীন্দ্রনাথের কোন-একটি পর্বকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পর্ব এবং বিবর্তনরীতি অনুসারে সর্বাধুনিককে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বের কবিতায় জগতের প্রতি যে মমতামেদুর আবেগ ফুটিয়াছে এবং বাস্তব জীবন-প্রত্যয় তাঁহাকে যেভাবে উন্মুখর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ক্রিয়াশীল প্রাণবেগই জয়ী হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সর্বশেষ কাব্যপর্বকে 'চিত্রা' পর্ব বা 'বলাকা' পর্বের সমতুল্য বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কবিমানসের বিকাশধারা আলোচিত হইল; কিন্তু স্থানাভাবের জন্য কবির রূপনির্মিতির বিচিত্র ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইল না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্র-কাব্যসাধনা সম্পর্কে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রবীন্দ্রকাব্য রোমাণ্টিক, অধ্যাত্ম ধারাপুষ্ট, ভাববাদী ও স্বপ্নানুষঙ্গী। আধুনিক জীবনের তরঙ্গকল্লোল, বিক্ষোভ ও বাস্তব সত্যকে পাশ কাটাইয়া তিনি যেন একটি কল্পিত মর্মর প্রাসাদে স্বপ্নবিলাসের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। জার্মান মহাকবি গ্যয়ঠের ন্যায় বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করিয়া, অঙ্গে-মনে ধূলামাটি মাখিয়া জীবনের বিষামৃতকে পরমানন্দে পান করিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ততটা পরিদৃশ্যমান নহে। কেহ বা আরও সুর চড়াইয়া বলিতে চান, রবীন্দ্রনাথ বড় জোর য়ুরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলা যায় যে, কাব্যবিচারে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি শ্রেণীচিহ্ন দাগিয়া দেওয়া হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করিতে বসিয়া গ্যয়ঠে, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে, কামু, সার্ত্র-এর আদর্শের নিরিখে বিচারপ্রণালী চালিত করিলে বিচার-বুদ্ধিহীন মূঢ়তার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। শিলার কেন শেকস্‌পীয়ার হইলেন না, ভবভূতি কেন কালিদাস হইলেন না, ম্যালার্মে কেন শেলী হইলেন না, গোর্কী কেন টলস্টয় হইলেন না—এ প্রশ্ন যেমন নিরর্থক, রবীন্দ্রনাথ কেন গ্যয়ঠে হইলেন না, সে প্রশ্ন তেমনি নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক। গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির যে ধারাপ্রবাহ চলিয়াছে, রবীন্দ্রকাব্য যে তাহারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

গীতিকাব্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যক্তিভাবানুরঞ্জিত মন হইতে সার্থক গীতিকবিতার সৃষ্টি হইলেও নাটক ও নাট্যসাহিত্যে গীতিকবিদের তেমন প্রতিষ্ঠা নাই। শেলী-কীট্‌স্‌-ব্রাউনিঙ, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা শ্রেষ্ঠ গীতিপ্রতিভাধর হইলেও স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নাটক-গুলিতে নানা প্রশংসনীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কবিমানসটি প্রায়ই প্রধান হইয়া ওঠে বলিয়া

লীরিক-প্লাবনের ফলে নাটকের বস্তুসত্তা বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। নাটক মূলতঃ বস্তুশিল্প (objective art)। নাট্যকার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গোপন করিয়া রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন মানুষের সংবেগ ও কাহিনী, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ফুটাইয়া তুলিবেন—তা সে দ্বন্দ্ব অন্তর্মুখী মনোদ্বন্দ্বই হউক, আর কর্মমুখর বহির্দ্বন্দ্বই হউক। কিন্তু গীতিকবির রচিত নাটকে গীতিপ্রবাহের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাস এবং কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি অনেক সময় নাটকের বস্তুসত্তাকে কথঞ্চিৎ দুর্বল করিয়া ফেলে। একটি বিশেষ মনের তত্ত্বকথা বা আইডিয়া প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া কোন কোন সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিরা অনেক সময় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারেন না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও তত্ত্ববাণী নাটকের ঘটনাপ্রধান বস্তুসত্তাকে কিয়দংশ পিচ্ছিল করিয়া ফেলে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নাটকের বস্তুগত শিল্পরূপের অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে। ইদানীন্তন কালের নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তিগত মনন, ধ্যানধারণা ও চিন্তাপ্রণালী বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে—ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইব্‌সেন ও বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকাবলী। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতিকবি বলিয়া তাঁহার নাটকে লীরিক প্রাধান্য থাকিবারই কথা; উপরন্তু তাঁহার সমস্ত নাটকে তত্ত্বপ্রাধান্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, বিশুদ্ধ নাটক সাংকেতিক নাটক—সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের একটা তত্ত্ববাদ ও উপলব্ধ সত্য নাটকের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর টমসন রবীন্দ্র-নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action." কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহার নাটকে ঘটনার অনিবার্যতা খুঁজিয়া পান না। তাঁহাদের মতে নাট্যকারের চিন্তাসূত্রই নাট্যকাহিনীর সূত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ফলে তাঁহার প্রায় সমস্ত নাটক গীতিনাট্য বা নাট্যকাব্য বা তত্ত্বনাট্য (Thesis drama) হইয়া উঠিয়াছে।

কৈশোর জীবনে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের পরিমণ্ডলে বর্ধিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অগ্রজেরা এবং বাটীর অন্যান্য বালক-বালিকারা সকলেই রীতিমত অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন; কাজেই বাল্যকাল হইতে নাটকে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল; নাটকের অভিনয়কালে এবং নূতন আঙ্গিক সৃষ্টিতে তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। তাঁহার সময়ে কলিকাতায় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক ভক্তিরসের নাটক, বীররসের আন্দোলনে উচ্চকিত ঐতিহাসিক নাটক এবং দৈনন্দিন জীবনের স্থূল বাস্তব চিত্র প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিলেও সাহিত্যহিসাবে ইহাদের অধিকাংশই মূল্যহীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে যেমন অভিনয়কলার নূতনত্বের আমদানি করিলেন, তেমনি অভিনেতব্য নাটকের মধ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণ সৃষ্টি করিলেন। ফলে তাঁহার নাটক অভিনয়যোগ্য এবং পাঠযোগ্য—উভয়শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হইল।

অবশ্য একথা ঠিক, যাহাকে সাধারণতঃ ঘটনাসংবেগ বা action বলে, তাঁহার নাটকে তাহার বিশেষ পরিচয় নাই। ঘটনার সংবর্ত অপেক্ষা তত্ত্ব, জীবনের অপরূপ রহস্য, গীতিকাব্যের স্বতোৎসারিত প্রাচুর্য—প্রধানতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহার নাটককে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সনাতন রীতির মাপকাঠির সাহায্যে মাপিতে গেলে তাঁহার নাটককে পুরাপুরি 'নাটকীয়' বলা যাইবে না। ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, মেটারলিঙ্ক, হপ্ট্‌মান ষ্ট্রিন্ড্‌বার্গ প্রভৃতি নাট্যকারদের অনেক নাটকই পুরাতন রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নাটক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কালধর্মানুসারে নাটকের নিয়মতন্ত্রও পাল্টাইয়া যায়। গ্রীক ক্লাসিক যুগের নাটক এবং মধ্যযুগের মিরাক্‌ল্‌ ও মর্‌ালিটি নাটকে একই নীতি অনুসৃত হয় নাই. শেকস্‌পীয়র ও শিলারের নাট্যাদর্শ আবার ভিন্ন প্রকার। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসমস্যা এবং গভীর চেতনালব্ধ সাঙ্কেতিক তত্ত্বের উত্থানের ফলে যে সমস্ত নাটক রচিত হইল, তাহার ধরন-ধারণ আরও বিচিত্র। সাম্প্রতিক নাটকে আবার অবচেতন সত্তার গভীর রহস্য নূতন দ্যোতনা সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা যদি সাম্প্রতিক নাটককে প্রাচীন অ্যারিস্টটল ও আধুনিক নিকলের আদর্শ অনুযায়ী পুরাপুরি মাপিতে যাই, তাহা হইলে ভুল করিব। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা মননের প্রাধান্য. তাহা সত্য বটে; কিন্তু আধুনিক নাটকে নাটকের বস্তুসত্তা হ্রাস পাইয়া গিয়া নাট্যকারের অন্তর্গূঢ় বাণী প্রাধান্য পাইতেছে; ফলে বাহিরের সংবেগ বা action হ্রাস পাইয়া গিয়া অন্তরের আবেগ, অনুভূতি ও তত্ত্বের সংঘাত একটা বিশেষ ব্যক্তিক রূপ ধরিতেছে। য়ুরোপের সাঙ্কেতিক গোষ্ঠীর নাটক যদি নাটক হয়, ইব্‌সেন-শ-গল্‌স্‌ওয়ার্দি-ও'নীলের নাটক যদি নাটক হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের নাটককেও কেন নাটক বলা হইবে না?

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ॥

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও যৌবনে অনেকগুলি কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কাব্যধর্ম, নাট্যধর্ম ও গীতিধর্ম (music) একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। কৈশোর জীবনের 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) এবং যৌবনের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) এবং পরিপক্ব জীবনে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪). 'কাহিনী' (১৯০০) —এ সমস্তই কখনও নাট্যধর্মী কাব্য, কখনও কাব্যধর্মী নাটক, কখনও বা গীতিনাট্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য, নাটকের মতো পাত্রপাত্রী থাকিলেও সঙ্গীতের বাহনেই এই নাটকের শুভযাত্রা। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে এবং বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলের' প্রভাবে রচিত। এই নাট্যাভিনয় সে যুগে শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকাভিনয় দেখিয়া উচ্ছ্বাসের বশে একটা কবিতাই

লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। 'মায়ার খেলা' সম্পূর্ণরূপে কবিকল্পনাসৃষ্ট গীতিনাট্য—প্রেমের ব্যর্থতা এবং তাহা হইতে মুক্তি, মায়ার যাদুস্পর্শে সেই সমস্ত বিচিত্র বিড়ম্বনার কথা গানের মালা গাঁথিয়া বলা হইয়াছে।

তাঁহার নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে 'রুদ্রচণ্ড' পুরাপুরি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত হইলেও ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘটনাসংবেগ এবং স্নেহপ্রেমের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাইবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'* মানুষের জীবনবিরহিত মুক্তি-সাধনার ব্যর্থতা ও স্নেহভালবাসার মধ্যে মুক্তির পরম আস্বাদন এবং 'বিদায় অভিশাপে' মহাভারতের কচ ও দেবযানীর কাহিনীকে দুইটি চরিত্রের উক্তির মারফতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'কাহিনী'তেও প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাস ও মহাকাব্যের প্রাধান্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'র বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ একদা এই নাটকের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের তথাকথিত দুর্নীতি লইয়া প্রচুর আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। দেবতার বরে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা এক বৎসরের জন্য অপরূপ লাবণ্য লাভ করিল এবং তাহার সাহায্যে অর্জুনের চিত্তকেও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিল। কিন্তু সে মনে তৃপ্তি পাইল না ; ইহা তো পরের কাছ হইতে পাওয়া ছদ্মবেশ মাত্র। অর্জুনেরও অলস, বিলাসী জীবনে ভোগার্ত অবসন্নতা আসিতেছিল। দেব-বরে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার লাবণ্য বর্ষশেষে কিংশুকমঞ্জরীর মতো ঝরিয়া পড়িল, অর্জুনও লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে সহধর্মিণীকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন। এই কাহিনীটি চিত্রাঙ্গদার দিক হইতে একটি আশ্চর্য মানসিক সংকটের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুই-এক স্থলে দেহসচেতন আদিরসের ইঙ্গিত থাকিলেও সূক্ষ্ম কাব্যধর্ম তাহাকে স্থূলতার পীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল একদা অনাবশ্যক, অহেতুক, অনর্থক উত্তেজনার বশে 'চিত্রাঙ্গদা'য় অশ্লীলতা আবিষ্কার করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নিয়মানুগ নাটক ॥

ইহার পর নিয়মানুগ নাট্যরীতি অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯)—এই নাটকগুলিতে একটু ঘনিষ্ঠভাবে নাট্যসূত্র অনুসৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, নাট্যক্ষেত্রে কবি প্রথমে গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাতে সঙ্গীতের সুরমাধুরী এবং গীতিকবির আবেগোচ্ছ্বাস প্রাধান্য পাইয়াছিল এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার পর 'রাজা ও রানী' হইতে 'প্রায়শ্চিত্ত' পর্যন্ত যে নাটকগুলি রচিত হইল, গঠন-তন্ত্রের দিক হইতে তাহাতে তিনি প্রচলিত নাটকের রীতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

* রবীন্দ্রনাথের ভাবের সংহতি ও রচনাকৌশল সর্বপ্রথম এই নাট্যকাব্যে পরিপক্বতা লাভ করে।

অবশ্য আইডিয়া বা তত্ত্বপ্রাধান্য হ্রাস পায় নাই ; কবি যে সকৌতুকে সমালোচকদের পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন,

কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লীরিকের বড় বাড়াবাড়ি।

তাহা খুব যে অযথার্থ, তাহা মনে হয় না। তবে এই পর্বের নাটকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের আঙ্গিক অনুসৃত হইয়াছে এবং লীরিক ও তত্ত্ববাদের প্রাধান্য সত্ত্বেও নাট্যধর্ম খুব বেশি ব্যাহত হয় নাই। বিশেষতঃ গঠনতন্ত্রে তিনি পরিমিত নীতিনিয়ম যথাসম্ভব মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মতো বিশুদ্ধ গীতিকবির পক্ষে নাট্যশাস্ত্রের জটিল নিয়ম মানিয়া চলাই বিস্ময়কর। তবু তিনি যে যৎকিঞ্চিৎ নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহার জন্যই তিনি প্রশংসার্হ। 'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডি—বিক্রম ও সুমিত্রার দাম্পত্যসম্পর্কের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংকীর্ণ সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার পীড়ন হইতে নিজেকে এবং স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য সুমিত্রার রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান এবং পরিশেষে চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্যে আত্মদান এই নাটকের সমাপ্তিকে দুঃসহ বেদনায় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। সেই যুগের নাটমঞ্চের উত্তেজনা, রক্তপাত, আত্মহত্যা প্রভৃতির কোলাহল কবিকেও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করিয়াছিল ; ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া সুমিত্রার সভাকক্ষে প্রবেশ এবং প্রাণত্যাগ অত্যন্ত অতিনাটকীয়, অস্বাভাবিক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। অবশ্য ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। কবি এই নাটকের দুর্বলতা সম্বন্ধে পরে অবহিত হইয়া ইহার সংস্কার করিয়া গদ্যে 'তপতী' (১৯২৯) নাটক রচনা করেন। তত্ত্বপ্রধান নাটক হিসাবে 'তপতী' উৎকৃষ্ট ; কিন্তু 'রাজা ও রানী'র সঙ্গে কাহিনীর সাদৃশ্য থাকিলেও তত্ত্ব ও প্রকাশরীতির দিক হইতে 'তপতী' সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নাটক হইয়াছে।

'বিসর্জন' নাটকেও পঞ্চাঙ্ক রীতি অনুসৃত হইয়াছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ঘটনাকে নাটকের উপযুক্ত করিয়া রূপান্তরিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমের প্রতীক রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও ব্রাহ্মণ্য দম্ভের প্রতীক রঘুপতির বিরোধের চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই বিরোধে রঘুপতির স্নেহাস্পদ পালিতপুত্র জয়সিংহ প্রাণ দিয়া অমর প্রেম ও কল্যাণের বাণী সপ্রমাণ করিল। প্রথার চেয়ে হৃদয় বড়, দম্ভের চেয়ে আত্মনিবেদন সার্থক, সংস্কারের চেয়ে প্রাণ দুর্জয়—এই তত্ত্বকথাটি বিসর্জনের মূল তাৎপর্য। রঘুপতির চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য অহংকার ও তাহার শোচনীয় পরাজয় এবং সেই পরাজয়ের মধ্য হইতে অপার করুণা ও বেদনার আবির্ভাব অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অবশ্য লীরিক ও তত্ত্বের বাহুল্য যে নাটকীয় কাহিনীকে কিঞ্চিৎ দুর্বল করিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রঘুপতির শেষ দৃশ্যের পরাজয়টি যথার্থ নাটকীয় হইতে পারে নাই—তত্ত্বের প্রতি কবির অতি-আসক্তিই তাহার কারণ। 'মালিনী'তে

প্রথার সঙ্গে প্রেমের, কর্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের, সুপ্রিয়ের সঙ্গে ক্ষেমংকরের দ্বন্দ্ব এবং মালিনীর চরিত্রে প্রিয়সঙ্গলোভাতুর নারীহৃদয়ের আবির্ভাব এই নাটকটিতে অনবদ্য হইয়াছে। আমাদের তো মনে হয়, নাটকীয় মুহূর্ত ও ঘটনার পরিণতি বিচার করিলে 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' অপেক্ষা 'মালিনী' অনেক বেশি সংহত আকার লাভ করিয়াছে। ইহাতেও 'বিসর্জনে'র অনুরূপ তত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু সে তত্ত্বের সঙ্গে মানবহৃদয় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার অভিনয়মূল্য ও পাঠমূল্য উভয়েরই গৌরব স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ক্ষেমংকর চরিত্রের কর্তব্যকঠোর পৌরুষ এমন একটা দীপ্ত গৌরব লাভ করিয়াছে যে, মানবিক অভিব্যক্তি কিঞ্চিৎ বাধা পাইলেও রঘুপতি অপেক্ষা তাহার চরিত্র অনেক সুষ্ঠু হইয়াছে। 'মুকুট' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় এক ধরনের নাটক। বোলপুরের আশ্রম-বালকদের জন্য রচিত 'মুকুট' খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে নাই। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটক বিশুদ্ধ নাটক হিসাবে যাহাই হউক না কেন, ইহাতে তিনি উগ্র স্বাদেশিক আদর্শের হানিকর অপঘাতের রূপটি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। পরবর্তীকালে 'প্রায়শ্চিত্ত' ভাঙিয়া তিনি 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন মনোধর্ম অনুসারে 'পরিত্রাণ' তত্ত্বপ্রধান নাটক হইয়াছে। কিন্তু নাটকীয়তার সহজ গতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'নটীর পূজা' (১৯২৬) উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৌদ্ধ যুগের আত্মত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে অনেকটা গ্রীক ট্রাজেডির আঙ্গিকে ইহা রচিত হইয়াছে। নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকিলেও ইহার তীব্রতীক্ষ্ন ঘটনাসংবেগ, গ্রন্থনকৌশল এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিস্ময়কর।

রঙ্গনাট্য ॥

গীতিকবিরা আবেগের দ্বারা চালিত হন বলিয়া প্রায়ই রঙ্গরহস্য ও প্রহসনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। কারণ হাস্যরসাত্মক নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের অসঙ্গতি-জনিত কৌতুকপ্রবণতা প্রধান হইয়া ওঠে। উপরন্তু হাস্যরস 'রস' নহে, বুদ্ধির অসঙ্গতি হইতে জাত বিশুদ্ধ মানসিক বৃত্তিবিশেষ। আবেগ হাস্যরসের বড় শত্রু। কাজেই গীতিকবিরা হাস্যরসাত্মক নাটকে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে সবই সম্ভব। তাঁহার 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)[৫], 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯৩৬)[৬] বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে বাংলার রঙ্গমঞ্চে রঙ্গব্যঙ্গ প্রহসন খুব জমিয়া উঠিয়া-ছিল বটে, কিন্তু ভাঁড়ামির হাস্যপরিহাস, ব্যক্তি বা সমাজকে লইয়া ব্যঙ্গ ও গালিগালাজ মার্জিতরুচির জনসাধারণকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলিতে

৫. ১৯২৮ সালে ইহা 'শেষরক্ষা' নামে পুরোপুরি নাটকীয় আকারে এবং অভিনয়যোগ্য সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়।

৬. ১৯০৮ সালে ইহা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে এবং উপন্যাসের আকারে বাহির হইয়াছিল।

একটা ভদ্র মার্জিত রুচির উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ন হাস্যকৌতুক প্রাধান্য পাইল। অবশ্য শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক নাটকের গৌরব নির্ভর করে ঘটনা ও চরিত্রের উপর। বিশেষতঃ ঘটনাসংস্থানের সকৌতুক বয়নকৌশল এই জাতীয় নাটকের প্রাণস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যের ঘটনাগ্রন্থন এবং চরিত্র-চিত্রণ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রঙ্গনাট্যের সমকক্ষ নহে। তিনি ঘটনা ও চরিত্রের বক্রতা বাদ দিয়া সংলাপের কৌতুকজনক পরিস্থিতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার রঙ্গনাট্যে কথা বা 'উইটে'র মারপ্যাঁচ অধিক। হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি বা কৌতুকজনক কাহিনী নির্বাচন বা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে-উজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি ততদূর সফল হন নাই। 'চিরকুমার সভা'য় চিরকুমারদের কঠোর প্রতিজ্ঞা এবং তাহা হইতে সহজেই স্খলন—এই ঘটনায় অসঙ্গতির সুরটি ততটা কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ 'চিরকুমার সভা'র ঘটনার গতি এত মন্থর এবং ইহাতে এত বেশি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আমদানি করা হইয়াছে যে, ইহার পাঠমূল্য যেমনই হউক না কেন, অভিনয়ে ইহার বহু অংশ ক্লান্তিকর মনে হয়। 'শেষরক্ষা' বা 'গোড়ায় গলদ' হাস্যরসে সমুজ্জ্বল এবং সেইজন্য ইহার অভিনয়-মূল্যও অধিক। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা ছোট ছোট কৌতুক-নাটিকাগুলিতে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিস্ময়কর, কিন্তু ঘটনাগ্রন্থনে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবু তৎকালীন স্থূল রঙ্গরসের অমার্জিত প্রহসনে যাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলিতে যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রূপক ও সাংকেতিক নাটক ॥

রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলি তাঁহার নাট্যপ্রতিভার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষে নহে, ভারতবর্ষের বাহিরে পাশ্চাত্ত্য জগতেও তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি অতিশয় জনপ্রিয় ; সাংকেতিক নাটকগুলি অনূদিত হইয়া বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে সাংকেতিকতার স্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ; তাঁহার বহু কবিতা সাংকেতিকতা ও রূপকধর্মের আশ্রয়ে নবরূপ লাভ করিয়াছে।

অরূপ, চিন্তাগ্রাহ্য, নির্বিকল্প চেতনা, বস্তু বা ব্যাপারকে রূপকের সীমার বন্ধনে বাঁধিয়া রূপময়, ইন্দ্রিয়গোচর এবং বস্তুপ্রত্যক্ষ করিয়া তোলা রূপকের ধর্ম। প্রাচীন যুগ হইতেই ধর্মে, আচারে, আচরণে, শাস্ত্রে রূপকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বেদ, বাইবেল, কোরান সর্বত্রই রূপকের প্রাধান্য। প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্যেও রূপকের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইবে। গ্রীক ও ল্যাটিন রঙ্গনাট্যের অনেকটাই রূপকধর্মী। দান্তের (১২৬৫-১৩২১) 'দিভিনা কোমেদিয়া', বেনিয়নের *Pilgrim's Progress*, স্পেন্সরের *Faery Queen*, প্রাচীন ভারতের কৃষ্ণমিশ্র রচিত, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত রূপকনাটক, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বদলেয়রের *Less Fleurs*

du Mai (1857)[৭], সুইফটের *Tale of Tub* এবং কবি ইয়েটস, রিল্‌কে এ্যাশ্‌ডবেলি, ঔপন্যাসিক টমাস ম্যান, আনাতোলা ফ্রাঁস্‌, নাট্যকার ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, হপ্টমান্‌, স্ট্রিণ্ড্‌বার্গ এবং যুদ্ধোত্তরকালীন ফরাসী সুররিয়ালিস্ট গোষ্ঠী বা পরা-বাস্তববাদী এবং অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ (কামু, সার্ত্র, প্রুস্ট্‌, মার্শেল ইত্যাদি) রূপক-সাঙ্কেতিক সাহিত্যের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী সাঙ্কেতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবের পর রূপক ও সাঙ্কেতিকতার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়াছে। রূপকের ধর্ম রূপময় করা, স্পষ্ট করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা রহস্যের সমাধান করা ; তাই রূপকে বস্তুরূপ ও নিহিতার্থের মধ্যে একাত্মতা প্রয়োজন। অপরদিকে সাঙ্কেতিক সাহিত্যে শুধু অরূপ রহস্যকেই আরও রহস্যময় করিয়া তোলা হয় ; সৃষ্টির চরম তত্ত্ব এবং চূড়ান্ত রূপকে রূপকের সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই সংকেত আভাস, ইঙ্গিতের সাহায্যে শুধু রহস্যই ঘনীভূত হইয়া ওঠে। সঙ্কেতের ইঙ্গিত ও তাৎপর্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিল্পীর মনে একই সঙ্কেতের প্রতীক পৃথক ধরনের ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। আধুনিক সমালোচকগণ মনে করিতেছেন যে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সমস্ত শিল্পসাধনা ও সাহিত্য অদূর ভবিষ্যতে সাঙ্কেতিকতার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সাঙ্কেতিক নাটকের আদর্শ কোথা হইতে পাইলেন তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে রূপক নাটক আছে, কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটক আধুনিক ব্যাপার। 'রাজা' (১৯১০),[৮] 'অচলায়তন' (১৯১২),[৯] 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯১৬) এবং 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)—রবীন্দ্রনাথের এইগুলি সাঙ্কেতিক নাটক। 'শারদোৎসব' (১৯০৮) বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটক না হইলেও ইহার তত্ত্বের মধ্যে সঙ্কেতের স্পর্শ আছে। মরিস মেটারলিঙ্কের সাঙ্কেতিক নাটকসমূহ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ মেটারলিঙ্কের (১৮৬২-১৯৪৯) বিখ্যাত সাঙ্কেতিক নাটকগুলি—*Les Sept Princesses* (*1891*), *Pelleas et Melisande* (*1892*), *Monna Vanna* ' (*1902*), *Interieur* (*1892*), *L'Osieu bleu* (*1908*)[১০] রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক রচনার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল এবং ইংরাজীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জেরহার্ট হপ্টম্যান (১৮৬২-১৯৪৬), জোহান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) প্রভৃতি নাট্যকারদের সাঙ্কেতিক নাট্যসমূহও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ সাঙ্কেতিক আদর্শটি য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটক

৭. অর্থাৎ *Flowers of Evil*

৮. ইহার অভিনয়যোগ্য সংস্করণ—'অরূপরতন' (১২৯০)

৯. ইহার অভিনয়যোগ্য সংস্করণ—'গুরু' (১৯১৮)

১০. অর্থাৎ *The Blue Bird*

হইতে লাভ করুন, অথবা নিজ চেতনা হইতেই সংগ্রহ করুন—এই শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে তাঁহার নাটকের রীতিমত পার্থক্য আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য সাঙ্কেতিক নাটকে ব্যাখ্যাতীত দুর্জ্ঞেয় রহস্যই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, সংশয়-দ্বিধা মানবচৈতন্যকে গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে আস্তিক্যবাদী ভারতীয় মন এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের জয় সূচিত হইয়াছে। তাই তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকে সংশয়ের দুশ্ছেদ্য যবনিকা তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরে নাই; নাটকের সমাপ্তির মুখে নাট্যকার তাঁহার অন্তরবাসী অনির্বাণ সত্যের উজ্জ্বল দীপশিখায় জগৎ ও জগদাতীতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকের অন্তে সব রহস্যের অবসান হইয়াছে বলিয়া, কেহ কেহ তাঁহার এই শ্রেণীর নাটককে পুরাপুরি সঙ্কেতধর্মী বলিতে চাহেন না। বরং রূপক নাটকের সঙ্গেই যেন তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকের অধিকতর সম্পর্ক। কথাটা অযথার্থ নহে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে সর্বসংশয়াতীত আস্তিক্যবুদ্ধি, প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবমুক্তির জয় ঘোষিত হইয়াছে; এরূপ মানসিক গঠন কখনও সংশয়ী চেতনার তমোগহ্বরে আত্মগোপন করিতে পারে না। ফলে সমস্ত সমস্যা, সংশয় ও বৈরাগ্যের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ পরম 'এক' ও অকূল শান্তির দুর্লভ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটক কোন কোন দিক হইতে রূপকের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে।

'রাজা' (১৯১০) নাটকের কাহিনী বৌদ্ধ 'কুশজাতক' হইতে গৃহীত। কুরূপ রাজা ও সুন্দরী রাণীর বিড়ম্বিত জীবন কেমন করিয়া সুস্থ স্বাভাবিক হইল, তাহা এই জাতকে বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রাজা, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার চিত্র অঙ্কন করিয়া এই কাহিনীটিকে নিজ তত্ত্বদর্শনের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাণী সুদর্শনা অন্ধকারের রাজাকে রূপের মধ্যে, সীমার মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই দারুণ বিড়ম্বনা ভোগ করিলেন; তারপর তাঁহাদের মোহ টুটিল, আসক্তি ঘুচিল, সীমার সঙ্কীর্ণতা দূর হইল। তিনি অসীমের মধ্যে সীমাকে উপলব্ধি করিলেন, অরূপসাগরে গাহন করিয়া রূপচেতনাকে অপরূপের মধ্যে সঁপিয়া দিলেন। অন্ধকারের লীলা শেষ হইল; উদার সূর্যোদয়ের পটভূমিকায় উভয়ের মিলন হইল। 'অচলায়তনে'ও প্রাচীন কালের মহাযান ও তন্ত্রযানের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের পীড়নে মানবাত্মার স্বাধীন বৃত্তির বিলোপ আশ্চর্য তথ্যবহ ঘটনার সাহায্যে সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থহীন আচার-বিচারের হাস্যকর বিড়ম্বনা যখন আকাশ-চুম্বী হইয়া ওঠে, তখন প্রাচীর ভাঙিয়া গণ্ডি ডিঙাইয়া বাধা টুটিয়া ঝড়ের দূতের বেশে গুরুর আবির্ভাব হয়। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক পরিচিত সাঙ্কেতিক নাটক। বিদেশেও ইহার অনুবাদ (*The Post Office*) বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। রোগার্ত বালক অমলের পথে বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষাই ইহার মূল কথা। প্রাণেশের ডাকঘর এই পৃথিবী; ইহার গাছপালা, ঋতুসৌন্দর্যের ডাক-হরকরাগণ প্রেমের চিঠি লইয়া

আসিতেছে। ব্যাধিজর্জর অমল সেই চিঠি পাইয়াছে ; দেহের সীমা পার হইয়া সে রাজার সান্নিধ্য পাইল। ইহাতেও অমলের মধ্যে নিখিল মানবাত্মার বন্ধনজর্জর প্রাণের মুক্তিকামনা সূচিত হইয়াছে ; যে মুক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়া লাভ করিতে হয়, অমল তাহাই পাইয়াছে। চরিত্র, ঘটনার ইঙ্গিত, সংকেতের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা—সর্বোপরি মানববেদনার এমন নিগূঢ় আবেগ পৃথিবীর খুব অল্প প্রতীকধর্মী নাটকেই মিলিবে।

'ফাল্গুনী'তে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জরা ও যৌবন—এই দ্বৈতসত্তা মূলতঃ একই সত্যের ভিন্নরূপ মাত্র। যাহারা জরাবৃদ্ধকে ধরিবে বলিয়া পণ করিয়াছিল, তাহারা গুহার ভিতর হইতে যখন সেই নাম-না-জানা বৃদ্ধকে বাহিরে আনিল তখন তাহারা দেখিল, সে তো বৃদ্ধ নহে, জরাগ্রস্ত নহে—সে চিরজয়ী, চিরজীবী যৌবন।

'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা'—তিনখানি রূপক-সাংকেতিক নাট্যই আধুনিক জীবনের উৎকট সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর দাঁড়াইয়া আছে। 'মুক্তধারা'য় দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদ ও যন্ত্রবিদ্যা হাত মিলাইয়া মানুষের তৃষ্ণার জল রোধ করিতে যায়। তখন ঝরণাতলা হইতে কুড়াইয়া-পাওয়া রাজকুমার অভিজিৎকে প্রাণ দিয়া ঝরণার যান্ত্রিক বাধা বিলুপ্ত করিতে হয়, এবং প্রমাণ করিতে হয়—যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়ো। 'রক্তকরবী' আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মানসিক অশান্তি ও সংকটের পটভূমিকায় পরিকল্পিত হইয়াছে। যক্ষপুরীর অন্ধকারে মানুষে শুধু কাজ করিয়া যায়, সোনার তাল তোলে। সেখানে আলো নাই, আনন্দ নাই। সর্দারের নির্দেশ মতো সবই নীরবে বিনা প্রতিবাদে চলে। অপরদিকে এই যক্ষপুরীর রাজা নিজেকে একটা দুশ্ছেদ্য জালের অন্তরালে বন্দী করিয়া শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্যে উল্লাস বোধ করিতে চাহে। পীতাভ ধাতুর স্থানে রক্তকরবীর কঙ্কণপরা নন্দিনী এই যক্ষপুরীতে প্রাণের অবারিত ঐশ্বর্য আনিল ; রাজা ব্যর্থ বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইয়া শক্তি ও ঐশ্বর্যকে নিজ হাতে চূর্ণ করিয়া প্রেমকে উপলব্ধি করিলেন। পঙ্গু, জরাজীর্ণ ও অবহেলিত মানবসত্তার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—বিশুদ্ধ রূপকের ছলে 'কালের যাত্রা' নামক ক্ষুদ্র নাটিকায় এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নাটিকা হিসাবে ইহার খুব বেশি মূল্য নাই। এই নাটিকাগুলির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যাইবে যে, একমাত্র 'ডাকঘর' ব্যতীত প্রত্যেকটি নাটকের সঙ্গে একটা তীব্র গতিমুখর ঘটনাসংবেগ আছে। 'ডাকঘরে'র মধ্যে ঘটনায় চেয়ে গীতিকাব্যোচিত মাধুর্য ও মীস্টিক চেতনার ধ্যানস্তব্ধতা বেশি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে আইডিয়া বা তত্ত্বের প্রাধান্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি আছে একটা স্পষ্ট ঘটনার তীব্রবেগ।

শেষযুগে তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট নৃত্যনাট্য ('তাসের দেশ'—১৯৩৩, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'—১৯৩৬, 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'—১৯৩৭, 'শ্যামা'—১৯৩৯) রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সঙ্গীত ও নৃত্যের মারফতে সমস্ত ঘটনাকে সজীব করিয়া

তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের স্রষ্টা না হইলেও ইহার পরিপোষ্টারূপে সম্মান পাইবার যোগ্য।

তাঁহার 'শোধবোধ' (১৯১৬), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'বাঁশরী' (১৯৩৩) যদিও শেষ বয়সে রচিত, তবু কোন কোন দিকে ইহার নূতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। 'গৃহপ্রবেশ' গল্পগুচ্ছের একটা গল্পের নাট্যরূপ ; ইহাতে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের করুণ বেদনাকে সাংকেতিকতার সাহায্যে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'শোধবোধ'ও গল্পগুচ্ছের একটি গল্পের নাট্যরূপ। কেবল 'বাঁশরী' পৃথক্ মর্যাদা দাবি করিতে পারে। ইহাতে অতি-আধুনিক অভিজাত সমাজচিত্রকে অবলম্বন করিয়া তাত্ত্বিকতা, দুরূহ দার্শনিকতা এবং গভীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতাকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তত্ত্বের দুরূহতা এবং সংলাপের কৃত্রিমতার জন্য নাট্যরস প্রায় কোথাও ঘনীভূত হইতে পারে নাই। এই নাটকেই বুঝা যাইতেছে, রবীন্দ্র-নাট্য-প্রতিভা অস্তমিতপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে অসীম বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়, বক্তব্যের বক্রতা বিস্ময়কর ; তত্ত্বপ্রধান হইয়াও এগুলি কেবলমাত্র তাত্ত্বিক হইয়া উঠে নাই, নাটকগুলির মধ্যে অভিনয়কলার অভিনব বৈচিত্র্য আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটক, বিশেষতঃ সাংকেতিক নাটক দীর্ঘজীবী হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ : উপন্যাস-গল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ

বহুযুগ পরেও রবীন্দ্রপ্রতিভা সর্বজননন্দিত হইবে। তাহার কারণ তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, উপলব্ধির গাঢ়তা ও প্রকাশভঙ্গিমার বৈচিত্র্য। একই ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিভার সমন্বয় ইতিপূর্বে বড়ো একটা দেখা যায় না। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা কাব্য ও নাটকের পরিচয় দিয়াছি। শুধু কাব্য-নাটকেই নহে, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধনিবন্ধ—কোন বিষয়েই তাঁহার ক্লান্তি নাই, ভীরুতা-সংকোচের লেশমাত্রও নাই। অবশ্য গীতিকবি উপন্যাস রচনা করিতে বসিলে তাঁহার ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা প্রধান হইয়া উঠিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে এরূপ যে হয় নাই, তাহা নহে। তাঁহার উপন্যাস ও গল্পে বস্তু-অনুসরণের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত মনন, ভাবনা, আবেগ ও দার্শনিক প্রত্যয় বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। ফলে কোন কোন স্থলে উপন্যাসের বস্তুপ্রধান পটভূমিকা কিঞ্চিৎ খর্ব হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাঁহার উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

উপন্যাস

নিতান্ত তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'করুণা' (১৮৭৭-৭৮) নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ইহা একবৎসর ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসরের অধিক নহে। 'করুণা'র মধ্যে একটি অতি সাধারণ কিশোরী-জীবনের করুণরসাত্মক কথা বর্ণিত হইয়াছে। গল্পকাহিনী জমাইবার মতো আখ্যানের বাস্তবতা ইহাতে নাই, এবং নাই বলিয়া উপন্যাস হিসাবে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কবিও সেইজন্য কৈশোরকালে-রচিত উপন্যাসখানিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবির পক্ষে অনেক সময় উপন্যাস নামক বাস্তব জীবনচিত্র অংকন করা কিছু দুরূহ হইয়া পড়ে। অবশ্য অধুনা উপন্যাসের যেরূপ অদ্ভুত রূপান্তর হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, বাস্তব জীবনচিত্র, চরিত্রদ্বন্দ্ব, চরিত্রবিকাশ, মনস্তত্ত্ব—এ সমস্ত বাহিরের আঙ্গিক ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবে এবং লেখকচিত্তের দার্শনিক ধ্যানধারণা এবং সাংকেতিক ধরনের কাহিনী-পরিকল্পনা (যেমন, আলবেয়র কামুর উপন্যাসসমূহ) উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ ও অনুভূতি প্রভাব বিস্তার করিলেও এগুলি যে উপন্যাস হিসাবে অভিনন্দিত হইবার যোগ্য, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ইতিহাস ও রোমান্স-আশ্রয়ী উপন্যাস ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর উপন্যাসচেতনা বোধহয় ইতিহাস ও রোমান্সকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর স্বস্তি বোধ করিত। উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব এইরূপেই হইয়া থাকে। স্থলেজলে-মিশ্রিত পৃথিবীর মতো প্রথমে উপন্যাসে রোমান্স ও বাস্তব জীবনকথা একসঙ্গে মিশিয়া থাকে। ইতিহাস রোমান্সের স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কাজেই প্রথম যুগের উপন্যাসে ইতিহাস ও রোমান্স বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) প্রধানতঃ ইতিহাস অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সুপরিচিত কাহিনী তাঁহার 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু কবির ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাসের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দুস্তর। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটে মানুষের গভীরতর আবেগ ও স্নেহপ্রেমের লীলাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। 'বউঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের চরিত্র শ্রদ্ধা উদ্রেক করে না; উদ্ধত অবিনয়ী প্রতাপাদিত্য জীবনের চেয়ে কুটিল রাজনীতিকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া জানিতেন; রাজনীতির কাছে তাঁহার স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি মানবধর্ম দাঁড়াইতে পারিত না। অপরদিকে তাঁহার খুড়া বসন্ত রায়কে মানবধর্মের প্রতীকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, এবং এই দুই বিপরীত মেরুতটে আহত হইয়া প্রতাপাদিত্যের পুত্র-কন্যা উদয়াদিত্য ও বিভার জীবন কীভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার করুণরসার্দ্র চিত্রটি অপরূপ বেদনামণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনেই যে জীবন-সত্য সম্বন্ধে একটা সুদৃঢ় দার্শনিক প্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং যাহা পরবর্তী কালে আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা 'বউঠাকুরাণীর হাট' হইতে বুঝা যাইবে। অবশ্য ইহার কাহিনী কোন কোন স্থলে শিথিল, চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র লক্ষণীয় নহে, অনেকেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যহীন টাইপে পরিণত হইয়াছে—সর্বোপরি কোন চরিত্রেই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক রোমান্স হিসাবে এই উপন্যাস খুব একটা সার্থক হয় নাই। তবু রবীন্দ্রনাথের মনের গড়নটির পরিচয় পাইতে হইলে এই উপন্যাসের মধ্যে তাহার প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ত্রিপুরার রাজবংশের একটি সত্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানেও ইতিহাস নামমাত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষাংশে কবি ইতিহাস ও ঘটনার বিবৃতি দিয়াই কাহিনী সমাপ্ত করিয়াছেন। গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, রঘুপতির ব্রাহ্মণ্য আচারনিষ্ঠা ও দম্ভ এবং সর্বশেষে বাৎসল্য রসের মধ্য দিয়া এই উদ্ধত ব্রাহ্মণের চরিত্রে মানবরসের উদ্বোধন এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। স্নেহ-প্রেম, মানুষের ভালবাসা, সংসার-সমাজ

—ইহারা মানুষের ক্ষমতার দম্ভ ও আচার-বিচারের ঔদ্ধত্যকে পরাভূত করিয়া মানুষকে উদারতর মানবধর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে—এই উপন্যাসে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। একটিও বয়স্ক স্ত্রীচরিত্র না থাকিলেও উপন্যাসটি 'বউঠাকুরাণীর হাট' অপেক্ষা অনেক বেশি সার্থক হইয়াছে, এবং রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যটিও অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস ॥

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুইখানি উপন্যাসের পর দীর্ঘ বিরতির পরে ১৩০৮-১৩০৯ সনের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে আর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইল, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা শুধু নূতন দিগন্ত আবিষ্কার করিল না, বাংলা উপন্যাসেরও নবজন্ম হইল। 'রাজর্ষি' প্রকাশের যোল বৎসর পরে ১৯০৩ সালে 'চোখের বালি' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অবশ্য এই ষোল বৎসরের মধ্যে তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প রচিত হইয়াছিল। তিনি বোধ হয় পূর্বতন উপন্যাস দুইটিতে খুব বেশি আশান্বিত হইতে পারেন নাই; হয়তো মনে করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার মতো আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবির পক্ষে ছোটগল্পেই অধিকতর মুক্তির স্বাদ পাইবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা'য় তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি এই ছোটগল্পের কোন কোনটিতে চরিত্র বিশ্লেষণ-শক্তির আশ্চর্য পরিচয় দিয়া (বিশেষতঃ 'সাধনা'র গল্পগুলিতে) মানবচরিত্র সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। 'চোখের বালি'র নিশ্ছিদ্র কাহিনীগ্রন্থনের নিপুণতা, চরিত্রসৃষ্টির প্রশংসনীয় সাফল্য এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও মনোবিশ্লেষণের অভিনব প্রয়াস বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তাহার মানসিক প্রদাহ এই উপন্যাসে যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী ব্যতীত আর কোন উপন্যাসের চরিত্রে সেরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী—এই চারিজনের জীবনের জট পাকাইয়া-যাওয়া সমস্যার গ্রন্থিমোচন, পরিশেষে বিপুল বেদনার মধ্যে সমস্ত কিছুর সমাপ্তি আশ্চর্য বিশ্লেষণকুশলতার সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী'তে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূচনা করেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে তাহাকে বাস্তবতার দিক হইতে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা উপন্যাসের যে নূতন গতিপথ নির্দেশ করেন, পরবর্তী কালের অর্ধশতাব্দী ধরিয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিক সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন।

'চোখের বালি'র কয়েক বৎসর পরে ১৯০৬ সালে 'নৌকাডুবি' (১৩১০-১২ সনের 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত) প্রকাশিত হয়। রমেশ নামক এক যুবক নৌকাডুবি হইতে

আকস্মিকভাবে রক্ষা পাইল, আর পাইল পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা কমলা নাম্নী এক অপরিচিতা নববধূকে। ইতিপূর্বে সে হেমনলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কমলা তাহাকে স্বামী বলিয়া জানিল; কিন্তু রমেশ আসল রহস্য না ভাঙিয়া কমলার নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। পরে নানা ঘটনার পরে কমলার প্রকৃত স্বামীর পরিচয় পাওয়া গেল। এই কাহিনীধর্মী দুর্বল উপন্যাসটি 'চোখের বালি'র পর কি করিয়া যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হইল তাহা এক সমস্যার ব্যাপার। বিশুদ্ধ রোমান্সের অসম্ভাবিত কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র পর 'মৃণালিনী'তে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় নাই, তেমনি 'চোখের বালি'র পর 'নৌকাডুবি' রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথও উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার শেষ জীবনে এইরূপ পারিবারিক মনোদ্বন্দ্ব লইয়া 'যোগাযোগ' (১৯২৩) রচিত হইয়াছিল ('বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৪-৩৫ সনে 'তিনপুরুষ' নামে প্রকাশিত)। মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং সন্তানসম্ভাবনায় সেই অশান্তির দ্রুত অপসরণ—ইহাই উপন্যাসটির প্রধান আখ্যান। হঠাৎ ধনাগমে উদ্ধত মধুসূদন এবং স্নিগ্ধ আভিজাত্যের সংযমের মধ্যে বর্ধিত কুমুদিনী—উভয়ের মনের সংঘাত যখন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তখন বাহির হইতেই যেন বিধাতার অঙ্গুলিসংকেতে সেই সংঘাত সহসা মিলাইয়া গেল—যখন কুমুদিনী জানিতে পারিল যে, সে সন্তানসম্ভবা। উপন্যাসটি পরবর্তী কালের রচনা হইলেও কবি সমস্ত চরিত্রের উপর সুবিচার করেন নাই, এবং মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে একতরফাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মানসিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত 'নষ্টনীড়' গল্পটি অনেকটা উপন্যাসের লক্ষণ পাইয়াছে। আকারে ইহা প্রায় ছোটখাট উপন্যাসের মতোই; কিন্তু ইহাতে ঘটনার জটিলতা অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বই জটিলতর হইয়াছে; এবং ইহার মূল বক্তব্যটি উপন্যাসের মত দীর্ঘায়িত নহে, ছোটগল্পের মত একমুখী ও সংহত। তাই 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্পের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই বর্গের উপন্যাসগুলিতে নরনারীর হৃদয়সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং কবি এখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস ॥

রবীন্দ্রনাথ শুধু নরনারীর দাম্পত্যসমস্যা ও প্রেম-অনুরাগসমস্যার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখিলেন না, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপন্যাসকে মুক্তি দিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ লইয়া বাঙালীর মনে নানা দ্বিধাসংশয় ও দ্বন্দ্বসংঘাত ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সেই উদার বিশাল পটভূমিকায় তাঁহার তিনখানি উপন্যাস ('গোরা'-১৯১০, 'ঘরে বাইরে'-১৯১৯, 'চার অধ্যায়'-১৯৩৪) রচিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের

উগ্রতার ফলে একটা সংকীর্ণ দাম্ভিক স্বাদেশিক মনোভাব শিক্ষিতমহলে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। 'গোরা' উপন্যাসে হিন্দুসমাজের সেই সংকীর্ণ অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করিয়া সর্বভারতের বৃহৎ মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে। 'গোরা' যখন তাল ঠুকিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল, তখন জানিত না যে, সে আইরিশ সন্তান, ভারতীয়ই নহে। এই আবিষ্কার তাহার সংকীর্ণ চেতনা ও উগ্র দম্ভকে বিনাশ করিয়া জাতিসম্প্রদায়হীন উদার ভারতের মহৎ আদর্শের মধ্যে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় ভারতীয় জীবন ও সাধনা, বিশেষতঃ বিশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয় জীবনের গভীর তাৎপর্যের মধ্যে এই উপন্যাস পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। কাহিনীর বিশালতা, চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ও বি-সম ভাবাদর্শকে একটা মহৎ সত্যের অভিমুখে চালিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসকে বিশ্ববাসীর কাছেও বিস্ময়কর করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাংলাদেশে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। নিজ দেশ সম্বন্ধে দাম্ভিক অহংকার এবং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যে-কোন অন্যায় কাজ সমর্থন রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নাই। তাই তিনি পরবর্তী কালে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত ষড়যন্ত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেও ইহার প্রতিক্রিয়া কবির মনে দুরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি করিল। তাহারই চিহ্ন 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়ে' (১৯৩৪)। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তাহার স্বামী নিখিলেশ ও স্বামীর বন্ধু সন্দীপ—এই ত্রিভুজ লইয়া 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে। চলিত ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তির ঢঙে লেখা এ উপন্যাস একটা অদ্ভুত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিখিলেশের শান্ত-সংযত আদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পাতিব্রত্য অকস্মাৎ বাধা পাইল স্বদেশসেবী বলিয়া পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, উদ্ধত, আবেগ-উন্মত্ত সন্দীপ স্বদেশী আদর্শের ছদ্মবেশে বিমলাকে উত্তপ্ত আবিলতার মধ্যে টানিয়া আনিল। বিমলাও অজগরের মায়াবী-চোখে-বন্দিনী হরিণীর মতো সন্দীপের উন্মত্ততা ও লোলুপতার বিষাক্ত আলিঙ্গনে ধরা দিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। উপন্যাসটির রচনারীতির তীক্ষ্ণতা, বাগ্‌ভঙ্গীর অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠতা এবং তথাকথিত স্বদেশ-সেবার অন্তরালবর্তী লোলুপতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কবির বিস্ময়কর শক্তিকেই প্রমাণিত করিতেছে। কবির অন্তরে জঙ্গী স্বাদেশিকতার প্রতি বিরূপতা জাগিতেছিল। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাহার স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ, 'চার অধ্যায়ে' তাহা চূড়ান্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'চার অধ্যায়' পুরাপুরি উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। জীবনের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক বিকাশকে স্বাদেশিক উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদী বিকারের দিকে ঠেলিয়া দিয়া মানুষ জীবন-সত্যকে অস্বীকার করে, আত্মার অপঘাত ঘটায়—'চার অধ্যায়ে' অতীন্দ্র-এলাকে আঁকিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাই যেন নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য উপন্যাস

হিসাবে 'চার অধ্যায়' অসম্পূর্ণ ও শিথিল। একটি বিশিষ্ট আইডিয়াকে রূপ দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলিকে মতবাদের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। সর্বোপরি তিনি ইহাতে যে পটভূমিকা ব্যবহার করিয়াছেন, পরিবেশ অংকন করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ও তথ্যসঙ্গত হয় নাই। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার বিরূপ মনোভাব অনেক সময় যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের বিকারের দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়া এবং তাহার মহত্তর ত্যাগের দিকটিকে উহ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়ে' পরিমাণসামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অতীন্দ্র-এলার জীবন, সংলাপ, আদর্শ প্রভৃতি যেমন অস্পষ্ট, কৃত্রিম, কাব্যধর্মী, ঠিক তেমনি উপন্যাসের সন্ত্রাসবাদী চিত্র রোমান্টিক, অবাস্তব ও অযৌক্তিক হইয়াছে। উপন্যাসের সমাপ্তি যে-পরিমাণে অতি-নাটকীয় হইয়াছে, সেই পরিমাণে সুসঙ্গত হইতে পারে নাই।

মীস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস ॥

রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র রচনারীতির অধিকারী ছিলেন, 'চতুরঙ্গ' (১৯২৬) ও 'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯) তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিবে। 'চতুরঙ্গে' শচীশ ও দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় না। চেতন মনের অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের আউল-বাউল-সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুবক লীলানন্দ স্বামীর নিকট সেই রসের দীক্ষা লইয়া রূপজগৎকে অরূপ জগতের অঙ্গীভূত করিয়া দিল। অপর দিকে দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়া কামনা করে। এই বিচিত্র মনোদ্বন্দ্ব আশ্চর্য তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তাই ইহাতে মীস্টিক বা ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার অধিকতর প্রাধান্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। তখন রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। তখনও যেন তাঁহার মধ্যে যৌবনের উচ্ছল জীবন, প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার অপরূপ বর্ণ-বিলাস অটুট রহিয়াছে। 'শেষের কবিতা'কে পুরাদস্তুর উপন্যাস বলা যায় না। প্রচুর কাব্যধর্ম ও রোমান্সের উচ্ছ্বাস উহাকে ক্ষণে ক্ষণে গদ্যকাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছে। অমিত ও লাবণ্যের প্রেম এই উপন্যাসের মূল বিষয় হইলেও ইহার একটা গভীরতর তাৎপর্য আছে। দৈনন্দিন বৈবাহিক জীবনের কর্তব্যপীড়িত গতানুগতিকতা এবং প্রেম ও রোমান্সের স্বপ্নাভিসার—এ দুয়ের মধ্যে মিল ঘটান দুঃসাধ্য। তাই অমিত ও লাবণ্য পরস্পরের প্রেমকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়নার দ্বারা মলিন করিল না ; অমিত কেটী মিত্রকে এবং লাবণ্য শোভনলালকে সামাজিক বিবাহ করিয়া চিরাচরিত কাজকর্ম করিয়া যাইতে লাগিল। ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মিটিল, কিন্তু সমুদ্রজলের অশ্রুলবণাক্ত আস্বাদ উভয়ের মনে জন্মান্তরীণ সুখ-স্মৃতির মতো বাঁচিয়া রহিল। ইহার তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, এরূপ অপূর্ব কাব্যধর্মী বর্ণনা, তির্যক বাগ্‌বিন্যাসের বিস্ময়কর নিপুণতা, প্রেম ও

সৌন্দর্যের স্বর্গলোক রচনা এবং তাহা হইতে স্বেচ্ছানির্বাসনের সকরুণবেদনা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিপুলপ্রসারী শক্তিকেই প্রমাণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি ক্ষুদ্রাকার উপন্যাস 'দুইবোন' (১৯৩১) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) আকারে-প্রকারে উপন্যাসের গৌরব দাবি করিতে পারে না। নারী দুইরূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে—প্রিয়ারূপে আর জননীরূপে; প্রধানতঃ এই তত্ত্বকথাটি 'দুইবোনে'র শর্মিলা, ঊর্মিমালা ও শশাঙ্কের কাহিনীর মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্যাই আর একটু ভিন্ন দিক হইতে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা এবং আদিত্যের জীবনে অঙ্কিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য এই আখ্যান দুইটি অনেকটা ছোটগল্পের ধরনে বর্ণিত হইয়াছে; উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগত জটিলতা নাই বলিয়া ইহাদিগকে পুরা উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি; বিশিষ্ট ভাবরসেই তাঁহার আত্মার মুক্তি। ঔপন্যাসিকের যে ধরনের বাস্তব তন্ময়তা প্রয়োজন, গীতিকবিদের মনোভাব সেরূপ নহে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসে বাস্তব চিত্রগুলি কবিচেতনার রঙে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য বাংলার উচ্চ স্তরের পাঠক-পাঠিকারা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস লইয়া যতই গৌরব বোধ করুন না কেন, সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেরূপ মুগ্ধ হন, তাঁহার উপন্যাসে ততটা আবেগ অনুভব করেন না। ইহার অন্যতম কারণ, উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের অনাবশ্যক প্রাধান্য। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কিরূপ ব্যাপক, বিচিত্র ও বহুবিস্তারী—তাহা তাঁহার উপন্যাস হইতে বুঝা যাইবে।

ছোটগল্প

বাংলা নাটক ও উপন্যাসের মতো ছোটগল্প পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই জন্মলাভ করিয়াছে। অবশ্য পশ্চিমেও ছোটগল্প খুব বেশি পুরাতন নহে। এক শতাব্দীর পূর্বেও ও-দেশের লেখক ও সমালোচকগণ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি লইয়া কলহ করিতেন এবং এখনও সব কলহের অবসান হয় নাই। বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষ গল্প বলিয়াছে, শুনিয়াছে—কিছু কিছু গল্প লেখাও হইয়াছে। সংস্কৃত, লাতিন ও ইতালীয় সাহিত্যে খুব প্রাচীনকালেও গল্পকাহিনী লেখা হইয়াছিল; প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিককালে যাহাকে ছোটগল্প বলে তাহা এ যুগের ব্যাপার। ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method." এই সংজ্ঞায় দেখা যাইতেছে, ছোটগল্পের সংহত পরিধিতে বাহুল্যবর্জিত সীমার মধ্যে কোন ঘটনা বা ঘটনার অংশ, চরিত্র বা চরিত্রের বিশেষ অংশ ফুটাইতে হইবে।

অনেকের ধারণা ছোটগল্প ও উপন্যাস একই বস্তু; গল্পকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বড় করিলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিলে ছোটগল্প হয়—এ মত একেবারে ভ্রান্ত। ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বস্তু। উভয়ই মানবজীবনের গল্প এবং উভয়ই গদ্যে রচিত হয়—এইটুকুই মাত্র সাদৃশ্য। মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের যে সম্পর্ক, উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের সম্পর্কটা কতকটা সেই জাতীয়। উপন্যাসে মানবজীবনের দীর্ঘ জটিল কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়; তাহার অসংখ্য গলিঘুঁজি, নানা শাখা-প্রশাখা, বিপুল বিস্তার। অপরদিকে ছোটগল্পে বাহুল্য-বর্জিত জীবনের একাংশ অতিশয় স্বল্পায়তনের মধ্যে চকিতে ফুটিয়া ওঠে। তাই ছোটগল্পের বিষয়বস্তু জটিল, মিশ্র বা দীর্ঘায়িত হইবার উপায় নাই। ইহাতে একটি মুহূর্তে একটি জীবনের একাংশ বিদ্যুতের মত ঝলসিত হইয়া ওঠে। অন্ধকার ঘরের ছিদ্রপথে আলোক প্রবেশ করিলে ঘরখানার সামান্যতম স্থান আলোকিত হয়, সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা থাকে। ছোটগল্পেও ঐ একটি বিন্দুই আলোকিত হয়, বাকী অংশ অনুদ্‌ঘাটিত থাকিয়া যায়। তাই ইহাতে নাটকীয় ঘটনার আকস্মিকতা, গীতিকবিতার ব্যক্তিগত ভাব এবং সাংকেতিকতার ব্যঞ্জনা—এই তিনটি কৌশল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের নিবিড় সম্পর্ক। গীতকবি যেমন জগৎ ও জীবনকে নিজের অন্তরে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের একটা ব্যক্তি-ভাবরঞ্জিত (Subjective) মূর্তি ফুটাইয়া তোলেন, তেমনি ছোটগল্পের লেখকও সমস্ত কিছুকে তাঁহার ব্যক্তিগত মনের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া নিজের ধারণাটিকে (Impression) রূপায়িত করেন। তাই কেহ কেহ বলেন, উপন্যাস বস্তুপ্রধান (Objective), আর ছোটগল্প লেখকপ্রধান (Subjective)। অর্থাৎ উপন্যাসে লেখক ঘটনা ও চরিত্রকে বাহিরের দিক হইতে উপস্থিত করেন। আর ছোটগল্পের লেখক নিজের উপলব্ধি, ধারণা ও চেতনার পরিমণ্ডলে কাহিনী বা চরিত্রকে স্থাপন করেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল এত অদ্ভুত ধরনের ছোটগল্প রচিত হইতেছে যে, হয়তো কালক্রমে ছোটগল্প ও লিরিক কবিতা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যাইবে। কাহারও কাহারও মতে আধুনিক কালে মানুষের জীবন এত কর্মমুখর হইয়া পড়িয়াছে যে, টলস্টয়ের *War and Peace*-এর মতো বিরাট উপন্যাস পড়ার সময় কমিয়া যাইতেছে। আজ স্বল্প অবকাশে ছোটগল্প পড়িবার যুগ; তাই পৃথিবীর সর্বত্র ছোটগল্প অন্যান্য সাহিত্যশাখাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ মত মানিয়া লইতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে। আধুনিক কাল যদি কেবল ছোটগল্পেরই যুগ হয়, তাহা হইলে এখনও য়ুরোপে বিশালকায় 'এপিক নভেল' রচিত হইতেছে কেন? দীর্ঘ-বিলম্বিত কাহিনী ও চরিত-সম্বলিত উপন্যাসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কোন দিনই হ্রাস পাইবে কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, আধুনিক কালে ছোটগল্পের চাহিদা যে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, গীতিকবিরা বস্তুগত কাহিনী, বাস্তব ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘাত ফুটাইতে গিয়া অসুবিধা বোধ করিয়া থাকেন ; তাই আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিদের উপন্যাসে অনেক সময় লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা অধিক প্রাধান্য পায় ; ফলে ঔপন্যাসিক তাঁহার রচনার মারফতে পাঠকের মধ্যে নামিয়া আসেন না ; পাঠককে চেষ্টা করিয়া লেখকের নাগাল ধরিতে হয়। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের যুগে শরৎচন্দ্র অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। উপন্যাস রচনায় তাঁহার যে বাধাগুলি ছিল, ছোটগল্পে তাহাই মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। গীতিকবিদের সঙ্গে ছোটগল্প-লেখকের বেশ সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ তাই ছোটগল্পে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রকৃত স্রষ্টা। তাঁহার পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্রের গল্পে ছোটগল্পের ঈষৎ আভাস থাকিলেও তখনও ছোটগল্পের শিল্পকলা যথার্থ রূপ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছোটগল্পের বিশেষ প্রকরণটিকে প্রথম অনুসরণ করিলেন। ছোটগল্পের একমুখীনতা ও গীতিকবির ব্যক্তিগত impression তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকে পরিণত করিয়াছে। 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসে তিনি খ্যাতি লাভ করিলেও মনে মনে তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। প্রায় এই সময়ে তিনি 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামক যে দুইটি গল্প রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও আসলে উহারা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র জাতি। যাহা হউক 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকরূপে যোগদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পদ্মাতীরে জমিদারি কর্মোপলক্ষে বাস করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ বাংলার পল্লীজীবনের পরিচয় পাইলেন, মাটির মানুষের অন্তরের সুর শুনিলেন ; বাংলার গ্রাম্যজীবন, একান্নবর্তী পরিবার, স্বার্থবিরোধ, আত্মত্যাগ, প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-জড়িত সুখদুঃখের নিরুত্তপ্ত দিনগুলি কবিকে মুগ্ধ করিল।

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে যেন তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে, মানুষ, প্রকৃতি এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃত চেতনা—

এই প্রভাবগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের ছবি, বৃহৎ পরিবারের নানা সমস্যা, মামলা-মোকদ্দমা, অভিজাত বংশের ক্ষীণায়ু অবস্থা, সামান্য মানুষের সুখ দুঃখের সংসার—এই সমস্ত পরিচিত ঘটনা কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 'পোস্ট মাস্টার,' 'কাবুলিওয়ালা,' 'রাসমণির ছেলে,' 'ছুটি,' 'দিদি,' 'ঠাকুরদা,'—এই সমস্তই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি ; কবির আনন্দরসে সিক্ত হইয়া দৈনন্দিন জীবন গল্পগুলিতে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রেমের গল্পগুলি নানা দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে ঃ 'একরাত্রি,' 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী,' 'দুরাশা,' 'শেষের রাত্রি,' 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পে প্রেমের দুর্নিবার গতি, অপার্থিব ব্যঞ্জনা এবং সংসার-জীবনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত জীবন-নির্বাহের চিত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান। ইহার মধ্যে 'নষ্টনীড়' একটি আদর্শ ছোটগল্প বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অমল ও চারুর সম্পর্কটিকে লেখক এমন নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমন ধীরে ধীরে জট ছাড়াইয়াছেন যে, ছোটগল্পের সূক্ষ্ম আঙ্গিকের দিক হইতে গল্পটি অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে প্রেমের অনাহূত আবির্ভাব প্রচণ্ড আবেগরূপে প্রায়ই গণ্য হইতে পারে না ; কাজেই যেখানে তিনি প্রেমের পাত্রপাত্রীকে দৈনন্দিন জীবন হইতে মুক্তি দিয়াছেন, সেখানে তাহা অপূর্ব বর্ণসুষমা লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি যে জড়প্রকৃতি নহে, মানবমনের সঙ্গে তাহার যে গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। তবে এই ধরনের গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকা কখনও কখনও চরিত্রের আকারে দেখা দিয়াছে ; তখন পাত্রপাত্রীর জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রকৃতির লীরিক সৌন্দর্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে ব্যাখ্যাতীত ভয়ালমধুর সম্পর্ক রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সেই ধরনের রহস্যাতুর ব্যঞ্জনা বেশি ফুটিতে পারে নাই। তবে তাঁহার অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। আমাদের দেশের অতিপ্রাকৃত গল্প প্রায়ই ভৌতিক বা লোমহর্ষক উদ্ভট গল্পের ধার ঘেঁষিয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, কখনও-বা অশরীরী পাত্র-পাত্রী আমদানি করিয়া অতিপ্রাকৃত ভৌতিক গল্পকেও একটা অদ্ভুত রস-রূপ দান করিয়াছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' ইত্যাদি গল্পগুলি আমাদের সাধারণ ভৌতিক সংস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে কদাচিৎ বস্তুগত ভৌতিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি তৃষাতপ্ত জীবনের অপার রহস্যকে এমনভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন যে, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প লিখিয়াছিলেন ('রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি')। তাহাতে আধুনিক জীবন-সমস্যার নিপুণ বিশ্লেষণ থাকিলেও বক্তব্যের বক্রতাই কবির অধিকতর কৌতূহল

আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই এই গল্পগুলিতে তাঁহার মনের সজীবতা ও আধুনিকতা সুপ্রমাণিত হইলেও গল্পগুলি খুব বেশি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তাঁহার ছোটগল্পগুলি বিশ্বের গল্পের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দাবি করিতে পারে। বাঙালী-জীবনের আধারে ইহাতে সর্বমানবের মনের কথাই বিবৃত হইয়াছে। টলস্টয়, মোপাসাঁ বা চেকভ বা আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় গল্পের পাশে তাঁহার গল্পগুলি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। তাঁহার গল্পগুলি বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র হইলেও তাঁহার এবং মোপাসাঁ প্রভৃতি য়ুরোপীয় গল্পলেখকের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য আছে। মোপাসাঁ মানুষের কবোষ্ণ শোণিতলিপ্ত হৃদয়টিকে দু' হাতে স্পর্শ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ মানুষের বুকে কান পাতিয়া হৃদস্পন্দনটুকু শুনিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাস্তবতা তাঁহারই চিত্ত হইতে উদ্ভূত বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের দেখা জীবন এবং প্রাকৃত জীবন—উভয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম যবনিকার ব্যবধান আছে। উপরন্তু কোন কোন স্থলে অনাবশ্যক লীরিক উচ্ছ্বাস ('মেঘ ও রৌদ্র', 'পোস্ট মাস্টার') এবং অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার বহুবিস্তার তাঁহার কোন কোন ছোটগল্পের সংহতি নষ্ট করিয়াছে। তবে এরূপ গল্পের সংখ্যা বেশি নহে। সে সব বাদ দিয়াও তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে যে বিচিত্র বিস্ময় ও নানারূপ জীবন-চিত্র আছে, এখনও পর্যন্ত কোন-একজন বাঙালী লেখকের মধ্যে তাঁহার আংশিক প্রতিফলনও সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের একক প্রতিভার দ্বারা ছোটগল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী কালে বাংলা ছোটগল্প এরূপ পরিপূর্ণ আর্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের পর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য ও মননশীল রচনার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলার চিন্তাশীল সাহিত্যকে অতি দ্রুতবেগে সুগঠিত করিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার কোন কোন সাহিত্য-শিষ্য তথ্যানুসন্ধিৎসার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাহিত্যরসও পরিবেশন করিয়াছিলেন। যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে, অর্থাৎ যাহাতে বিষয়গৌরবের চেয়ে বিষয়ী-গৌরবই বেশি, সেইরূপ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ('কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য') এবং চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধকে পুরাপুরি শিল্পবস্তু করিয়া তুলিলেন, আবার তথ্য ও তত্ত্বকেও খর্ব করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উত্তরাধিকারী হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে বিপুলায়তন গদ্যগ্রন্থ রচনা করিলেন, তাহার বিষয়বৈচিত্র্য যেমন অভিনব, তেমনি গহনগম্ভীর চিন্তাশীলতায়ও তাঁহার মৌলিকতা সহজেই লক্ষ্যগোচর হইবে।

মাত্র পনের বৎসর বয়সে কিশোরকবি প্রাবন্ধিকের বেশে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাংলা ১২৮৩ সনে (১৮৭৬ সালে) রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইল—'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। সে সময় গীতিকাব্য হিসাবে বিখ্যাত তিনখানি কাব্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং নিজ মন্তব্যজ্ঞাপনে এই কিশোরকবি যে বিস্ময়কর বুদ্ধি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত, বিশ্বসাহিত্যেও বোধহয় বড় বেশি পাওয়া যাইবে না। বয়োধর্মগুণে রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে অনাবশ্যক আবেগ ফুটিয়া উঠিলেও প্রবন্ধটি সাহিত্যবিচারমূলক, এবং সেই বিচারে কবি যথাসম্ভব যুক্তিবুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কবিতায় যখন তিনি অস্ফুটবাক, গদ্যে তখন তিনি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিমা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এই প্রবন্ধটি লইয়া তখনকার শিক্ষিত মহলে রীতিমতো আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ কিশোর সমালোচক 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা' কাব্যটিকে মহিলা-কবির রচনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনুমান মিথ্যা নহে ; পরে প্রমাণ হইল 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা' কোন স্ত্রীলোকের রচিত নহে—সে যুগের খ্যাতিমান কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা !* সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কবি সেই অল্প বয়সেই কিরূপ তীক্ষ্ম সাহিত্যবিচারের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিশোরকালে রচিত তাঁহার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ হইতে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স অনধিক ষোল বৎসর। বাল্যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মতো একখানি গুরুভার কাব্যের বোঝা তাঁহার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল ; ফলে এই মহাকাব্যের প্রতি কিশোর কবির বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। সেই বিতৃষ্ণাই তীক্ষ্ম তীব্র আক্রমণমূলক সমালোচনার জন্মদান করিল। তিনি ইহার কয়েক বৎসর পরে ('ভারতী'—১২৯৪) আরও একবার 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সমালোচনা প্রসঙ্গে অধিকতর সুষ্ঠু ও যুক্তিসমন্বিত প্রবন্ধ রচনা করেন। বলাই বাহুল্য এই প্রবন্ধ দুইটির মূলে কবির রুচিগত বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লুকাইয়া ছিল। তাই সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষতঃ মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁহার কিশোর বয়স ও প্রথম যৌবনের চিন্তাপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয় হইলেও, তিনি আলোচনায় স্থিতধী বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই অনাবশ্যক উত্তপ্ত সমালোচনার জন্য উত্তরকালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজের তরুণবয়সের অবিনয়ের জন্য লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, 'মেঘনাদবধে'র প্রতি অকারণ এবং অযৌক্তিক বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি ইহাতে এমন কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সমালোচক-সুলভ তীক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যবিচারের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, কবি প্রথম

---

* এখানে স্মরণীয় যে, উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কাব্যখানি যে স্ত্রীলোকের রচনা, এমন কোন কথা বলেন নাই। পরবর্তী কালে 'জীবনস্মৃতি'তেই এবিষয়ে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যৌবনে সেই আদর্শের কতকটা অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম সমালোচনার মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরিণত বয়সের জন্য এই প্রবন্ধগুলি বহু স্থলে ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে কোন কোন স্থলে বিচার-ভ্রান্তিও ঘটিয়াছে। তবু কবির প্রথম দিকের গদ্যরচনার সাবলীলতা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের প্রশংসা করিতে হইবে।

পনেরো বৎসর বয়সে তিনি গদ্যপ্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪১ সালের বৈশাখ মাসে 'সভ্যতার সংকট' নামক জন্মদিনের শেষ ভাষণ দেন। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া তিনি যে কত বিচিত্র ধরনের গদ্য লিখিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একাধারে বিষয়বৈচিত্র্য, বক্তব্যের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষমতা এমন একটা প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, যে-কোন গীতিকবির পক্ষে এইরূপ মননশীল রচনায় আধিপত্য লাভ আশ্চর্য শ্লাঘনীয় গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহাকে ভারতবাসীরা শুধু কবি বলিয়াই শ্রদ্ধা নিবেদন করে নাই, গুরু বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছে। তাহার কারণ তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধে নিষ্ঠা, নূতন পথের দিশা এবং সংকটমোচনের আত্মিক ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সাধারণ-অসাধারণ—সকলেরই তিনি গুরুদেব। যুগসমস্যার তরঙ্গবিক্ষোভের তিনিই কাণ্ডারী। পাশ্চাত্ত্য জগৎও তাঁহাকে শুধু গীতি-কবি বলিয়াই স্বীকার করে নাই, প্রাচ্য সংস্কৃতির মহান প্রচারকরূপে সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। কারণ তাঁহার প্রবন্ধসমূহে (ইংরাজীতে যাহার খুব সামান্যই অনূদিত হইয়াছে) গভীর চিন্তা, অভ্রান্ত বিচারবোধ, সুদূরপ্রসারী মননশীলতা—সর্বোপরি মানবজীবন সম্বন্ধে বিশালতাবোধ আধুনিক মানবসমাজকে আলোড়িত করিয়াছে, আত্মস্থ করিয়াছে, সর্বনাশা ঝড়ের মধ্যেও আস্তিক্যবাদী জীবনের হাল ধরিয়া রাখিতে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে।

তাঁহার প্রবন্ধের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও শিল্পগুণ এমন বিস্ময়কর যে, এই স্বল্প আলোচনায় তাহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। এখানে শুধু প্রবন্ধগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর দিক-নির্দেশ করা যাইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধনিবন্ধকে আমরা মোটামুটি এই কয় শাখায় বিভক্ত করিতে পারি : সাহিত্য-সমালোচনা ; রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা ; ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা ; ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরী।

সাহিত্য-সমালোচনা ॥

সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বহু আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৮), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৩৫০) পুস্তক-পুস্তিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক, ভারতীয় ও বিদেশী, সাহিত্যবস্তু ও সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্য-সংক্রান্ত অনেক মৌলিক প্রশ্ন

উত্থাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে সমালোচনার ধারাটিকে পূর্ণতর করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচিন্তায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিলেও প্রথম দিকে তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। রবীন্দ্রনাথও কতকটা সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের মনোভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। তুলনামূলক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অধিকতর গৌরব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সাহিত্যের মূল রহস্যের উৎস সন্ধানে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক সাহিত্যবিচার করেন নাই, প্রীতিনিষিক্ত ব্যক্তিগত আনন্দটুকুকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার 'সাহিত্যে' তিনি সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য-দর্শনের বাতায়ন হইতে সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্যবিচারে তিনি দার্শনিক গভীরতার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে 'সাহিত্য' এবং অনেক পরে রচিত 'সাহিত্যের পথে' হইতে। শেষোক্ত গ্রন্থখানিও সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা, কিন্তু ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বকথা, বিশেষতঃ ঔপনিষদিক তত্ত্ববাদ সাহিত্য-বিচারকে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়া ইহাতে সাম্প্রতিক কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্বহীন মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। 'আধুনিক সাহিত্যে' আধুনিক যুগের বাংলা ও বিগত যুগের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ আছে। যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক দৃষ্টি, সর্বোপরি সৌন্দর্য-রসিক উদার রসভোগের রুচি রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাটিকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'লোকসাহিত্যে' অজ্ঞাত ছড়া ও কবিগান সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা ও বিচার লক্ষ্য করা যাইবে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' শেষজীবনে রচিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—ইহাতে আলোচনা অপেক্ষা বক্তব্যের অভিনব বক্রতা অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। শুধু সাহিত্যবিচারে নহে, ব্যাকরণ ('বাংলাভাষা পরিচয়'—১৯৩৮), 'ছন্দ' (১৯৩৬), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯)—প্রভৃতি নীরস ব্যাপারকেও সরস করিয়া তুলিবার দুর্লভ শক্তি রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যকেই সপ্রমাণ করিয়াছে। সাহিত্যালোচনায় বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে রসভোগ ও সৌন্দর্যবিশ্লেষণের চেষ্টাই সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য।

রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা ॥

রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক আন্দোলন ও আবেগের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের পরিবারেও স্বাদেশিকতার হাওয়া বহিত। 'হিন্দুমেলা' নামক স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে বালক রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতাও পাঠ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলন ('বঙ্গভঙ্গ'), রাখী-উৎসব, শিবাজী-উৎসব, স্বদেশী শিল্পপ্রসার প্রভৃতি ব্যাপারে

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ স্মরণীয়। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক অধিকার বলিতে তিনি শুধু রাষ্ট্র আন্দোলন নির্দেশ করেন নাই। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা—সর্ববিভাগেই জাতির প্রাণস্ফূর্তিকেই তিনি রাজনীতি বলিয়া মনে করিতেন এবং পশ্চিমের হীন অনুকরণে পরিকল্পিত সর্বগ্রাসী 'ন্যাশনালিজম্'কে তিনি কোন দিন প্রীতির দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজনীতিপ্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনকে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আধুনিক কালের ইতিহাসে তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজ ও শিক্ষা যে রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান উপাদান, তাহা তিনি নানা আলোচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), স্বদেশ' (১৯০৮), 'পরিচয়' (১৯১৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-সমাজ ও শিক্ষা-বিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সমাজ—সর্বত্র তিনি মহৎ মনুষ্যত্বকেই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলির তত্ত্ব, তথ্য ও তাৎপর্য চিন্তাশীল মানুষের পরম সম্পদ তো বটেই, ইহার ভাষা ও রচনা-ভঙ্গিমাও বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে কর্মভীরু ও অলস চিন্তাবিলাসী ছিলেন না, তাহা এই গ্রন্থগুলি হইতেই জানা যাইবে।

ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ ॥

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবির যে-জাতীয় মনোদর্শন থাকা স্বাভাবিক, তাঁহারও জীবনদর্শন সেই প্রকার। কোন বিশেষ চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম, দার্শনিকতা বা আচার-আচরণের সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কবি রবীন্দ্রনাথের উদার চিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। বাল্যে তিনি পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, কৈশোর ও যৌবনে উপনিষদ-আশ্রয়ী আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও বাউল সাধনার সঙ্গেও পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন দার্শনিক সূত্রের দ্বারা রবীন্দ্র-জীবনধারা ও উপলব্ধির বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে উপনিষদের আনন্দবাদ, হিন্দুপুরাণের লীলাবাদ এবং বৈষ্ণব বাউলের প্রেমতত্ত্ব তাঁহার কবি-মানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তবু তিনি জাতি-সম্প্রদায়হীন বিশ্বমানবধর্মে বিশ্বাসী। এই অভিমত দার্শনিক চিন্তার রূপ ধারণ করিয়াছে 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬) এবং 'মানুষের ধর্মে' (১৯৩৩)। তন্মধ্যে 'শান্তিনিকেতনে' তাঁহার দীর্ঘ দিনের ভাষণ ও ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান সংকলিত হইয়াছে। দুরূহ, গভীর ও বিপুলপ্রসারী চিন্তাধারা এবং আত্মোপলব্ধি এই 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-একদিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ইহার তত্ত্ব ও দার্শনিকতাকে শুধু মননের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই, জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে দার্শনিক সত্য এক হইয়া গিয়াছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কীয় আলোচনা এত

অপূর্ব। আমাদের মনে হয়, ইদানীং ধর্ম ও দর্শনকে ঠিক এই দিক হইতে আর-কেহ বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ॥

রবীন্দ্রনাথ গুরুতর তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধ রচনা করিলেও সমস্ত রচনাতেই একটি অনুভূতিপ্রবণ উদার হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে এবং তাই প্রবন্ধের নিরেট বস্তুসত্তা ক্ষণে ক্ষণে কবির ব্যক্তিসত্তার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া পরম রমণীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত চিন্তাশীল রচনাতেই ব্যক্তিমনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রভৃতি রচনায় ব্যক্তি-বঙ্কিমের মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। গীতিকবিরা প্রবন্ধ রচনা করিতে গেলে প্রায়ই তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রবন্ধের বস্তুভারকে লঘু করিয়া ফেলে। ফলে তাহাতে প্রবন্ধের সাহিত্যরস আস্বাদনের যোগ্য হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মদর্শন-সম্পর্কিত সমস্ত প্রবন্ধে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মনের দিক হইতে রচিত তাঁহার 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' (১৯০৭) এবং 'লিপিকা'র (১৯২২) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ 'লিপিকা'কে গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। 'লিপিকা'র কিছু কিছু রচনা ছোটগল্পের অনুরূপ হইলেও গ্রন্থটির মূল সুর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমধর্মী। কিন্তু 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধরূপেই গণনীয়। 'পঞ্চভূত'কে মানুষ বানাইয়া, ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের বিতর্কসভা বর্ণনা এবং কবিরও তাহাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ—ইহার ফলে রচনাটি বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জগৎ, জীবন, সৌন্দর্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের দিক হইতে যাহা ভাবিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন, পঞ্চভূতের সরস পরিহাসমুখর 'ভৌতিক' আলাপ-আলোচনায় তাহার গুরুতর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু কোথাও গুরুমহাশয় হইয়া নীতি-উপদেশ দেন নাই।

'বিচিত্রপ্রবন্ধ' অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টীল-অ্যাডিসন-গোল্ডস্মিথ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর চার্লস্ ল্যাম্বের আদর্শে রচিত হইলেও উহাতে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও দার্শনিক চিন্তাই প্রধান। ইহার বহুস্থান গদ্যকাব্য বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের পটে জগৎ ও জীবন যে ছায়া ফেলিয়াছে, মনের বীণায় যে সুর বাজাইয়াছে, 'বিচিত্রপ্রবন্ধে' তাহার বিচিত্র পরিচয় রহিয়াছে। এই গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা গদ্যপ্রবন্ধ হইয়াও রসলোকের সৌন্দর্যের আকাশে উধাও হইয়াছে। তাঁহার চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, ডায়েরী, ভ্রমণকাহিনী—সর্বত্র এই ব্যক্তিগত সুরটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৩), 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'ছিন্নপত্র', 'চিঠিপত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার জীবনকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'জীবনস্মৃতি,' 'ছিন্নপত্র' ও

'রাশিয়ার চিঠি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জীবনস্মৃতি' কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবন নহে, কবির কবিজীবন বুঝিবার জন্য জীবনের যে অংশগুলি প্রয়োজন, 'জীবনস্মৃতি'তে কেবল তাহাই স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে সমস্ত কবিতা অস্ফুটতার জন্য তেমন সার্থক হইতে পারে নাই 'জীবনস্মৃতি'তে ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের সাহায্যে কবি সে অভাব পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কবিজীবনে একটা অসঙ্গতির বেদনা ও সমন্বয়ের অভাব জাগিয়াছিল; ঐ পর্যন্ত কবির অন্তরঙ্গ জীবনকথা 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত হইয়াছে। 'ছিন্নপত্র' তাঁহার কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশ। ইহাও তাঁহার কবিজীবন ও অন্তর্জীবনের ইতিহাস। কিন্তু চিঠিগুলি অনেক ছাঁটিয়া-কাটিয়া মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে বাস্তব ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা একটা রোমাণ্টিক কবিচেতনাই অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাশিয়ার চিঠি' রুশদেশের ভ্রমণকথা, এই দেশের নূতন জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সহৃদয় ব্যাখ্যা—যাহা ব্রিটিশশাসিত যুগে দুঃসাহসের ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। 'জাপানযাত্রী,' 'পথের সঞ্চয়' ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনীতে শুধু ভ্রমণের বর্ণনা নহে, একটা দেশ ও জাতির সঙ্গে নূতন পরিচয় স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী-গুলিকে নিছক রম্যরচনার পর্যায়ে নামাইয়া দেয় নাই।

স্বল্পপরিসরে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক, অবগাঢ় ও সুদূরবিস্তারী প্রতিভার আংশিক পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নহে। তাই এখানে তাঁহার বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে দু-একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-জয়ন্তীসভার অভিনন্দনে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

সূচনা ॥

সাহিত্যে যুগধর্ম প্রভাব বিস্তার করিলেও সেই যুগধর্মের অন্তরালে কোন কোন সময়ে একটি ব্যক্তিসত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যেমন বঙ্কিমপ্রভাব বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র প্রাণরসে ভরিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক (১৯০০-১৯৩০) রবীন্দ্রপ্রতিভার দিব্য কিরণচ্ছটায় আলোকোজ্জ্বল ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশে অতি দ্রুতবেগে বিস্ময়কর খ্যাতি লাভ করিলেন। ইতিপূর্বে স্বদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সাহিত্যিক উত্থিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল—ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বাগ্‌ভঙ্গিমা ও কাব্যের নৈতিক আদর্শ লইয়া কবিকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে নব্যহিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের সুযোগে একপ্রকার রক্ষণশীল, অযৌক্তিক অন্ধ স্বাদেশিক মূঢ়তা অনেক সাহিত্যিকের বিচারবুদ্ধিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যকে কোন কোন পাঠকের নিকট বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূক্ষ্ম কলারূপ, প্রতীক-কল্পনা এবং তাৎপর্যের সুগভীর ব্যঞ্জনা বিশ শতকের প্রথম দিকে অনেকের নিকট হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরাসরি দুইটি অভিযোগ আনিয়াছিলেন—একটি অস্পষ্টতা, আর একটি নৈতিক স্খলন। তাঁহার মতে, 'সোনার তরী' হইতে 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'-'গীতিমাল্য' পর্যন্ত কাব্যের মধ্যে ভাবের অস্পষ্টতা ও প্রকাশের দুর্বলতা রবীন্দ্রকাব্যের মারাত্মক ত্রুটি ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র নির্জলা দেহবাদ এবং 'চিত্রাঙ্গদা'য় দুর্নীতির অকুণ্ঠ সমর্থন দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ইতিপূর্বে ১৩১১ সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক সংকলন-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনীটি লিখিয়াছিলেন, তাহাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্র আক্রমণ শুরু করিলেন। দ্বিজেন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকা বাঙালী সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ও মুদ্রাযন্ত্র

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছে, পালন করিয়াছে এবং শক্তিশালী করিয়াছে। অবশ্য অতিশয় প্রাচীনপন্থী বলিয়া 'বঙ্গবাসী'-গোষ্ঠী বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আধুনিকতাকে অভ্যর্থনা করিতে পারে নাই। বরং এই সাপ্তাহিককে কেন্দ্র করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুসম্প্রদায় ক্রমেই প্রাধান্য পাইতেছিল। 'হিতবাদী' প্রথমে উদারতর সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও প্রসন্নমনে এই পত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 'হিতবাদী'র মধ্যে নানারূপ সংকীর্ণ মতবাদ প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। পাঠকসমাজে 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী'র চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিও অল্পবিস্তর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপরদিকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা গ্রহণ করিয়া যাহা কিছু সনাতন হিন্দুসংস্কার, তাহাকেই প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতেছিল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হইলেও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার তখনও পাঠকসমাজে অপ্রতিহতভাবে আসীন ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হইয়াছিল। সে যুগে অনেক শিক্ষিত মার্জিত রুচির ব্যক্তিও রবীন্দ্রসাহিত্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির পর সমস্ত প্রতিকূলতা যেন 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' ফণা অবনত করিল। অবশ্য তাহার পরেও কবিকে একাধিকবার মতামতঘটিত বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং নবীনতর অনেক সাহিত্যিক রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে হইল সাহিত্যতত্ত্ব ও আদর্শগত বিরোধ। তাহা রবীন্দ্রপ্রভাবকে আচ্ছন্ন বা খর্ব করিতে পারে নাই। পরে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব অযুত শাখাবিস্তারী হইল।

'মানসী', 'ভারতী', 'প্রবাসী', প্রভৃতি পত্রিকাকে ঘেরিয়া যে সমস্ত সাহিত্যগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে, তাঁহারা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন; বিশেষতঃ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 'ভারতী'-গোষ্ঠী একদা রবীন্দ্রানুরাগীদের প্রধান মিলন-তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীও ক্রমে প্রাধান্য অর্জন করিল; তাঁহার বালিগঞ্জস্থিত বাসভবন নবীন সাহিত্যিক ও ঐতিহ্যকামী ব্যক্তিদের সত্যকারের 'সালোঁ'তে পরিণত হইল। রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় অবস্থানকালে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবন' কিছুকাল সাহিত্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রভাব এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বে রক্ষণশীল মতাবলম্বী সাহিত্যিকগণ যে রবীন্দ্র-প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে, অবলুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য ১৯৩০ সালের পর হইতেই রবীন্দ্রপ্রভাব হ্রাস পাইল, তাহা

নহে ; তবে প্রায় এই সময় হইতে রবীন্দ্র-আদর্শ ত্যাগ করিয়া আরও নূতন দিকে সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা, তাহা লইয়া নানা পরীক্ষা শুরু হইল। ১৯৩০ সালের পূর্ব হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ সূচনা হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকা, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'কালিকলম' এবং ১৯২৭ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রে প্রথমে ঈষৎ ছদ্মবেশে, তারপরে প্রকাশ্যেই রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া ভিন্নতর পথে যাত্রা করিবার আহ্বান ধ্বনিত হইল। ১৯৩০ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং ১৯৩২ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' প্রকাশিত হইলে কাব্য-ক্ষেত্রে সাড়ম্বরে নবীনের আবির্ভাব ঘোষিত হইল এবং মোটামুটিভাবে ১৯৩০ সাল হইতেই রবীন্দ্র-উত্তরকালীন সাহিত্যের সূচনা হইল ; তাহার দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগে এই শেষোক্ত দল ও মতের মধ্যে অধিকতর অগ্রগতি প্রবেশ করিল, বাংলা সাহিত্য যথার্থই যুগান্তরের সম্মুখে দাঁড়াইল। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমকালীন পর্বের কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই যুগলক্ষণটির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কাব্য ও কবিতা

রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত এবং রবীন্দ্র-স্নেহলালনে বর্ধিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তরুণ বয়সেই বিশেষ কবিখ্যাতি লাভ করেন ; তাঁহার প্রথম পরিণত মনের কাব্য 'বেণু ও বীণা' ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হইবার পরে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা স্বাতন্ত্র্যের পথ পাইল। বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে আরও কয়েক জন রবীন্দ্রানুরাগী কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের মতো মৌলিকতা দেখাইতে না পারিলেও স্বল্পপরিমিত কাব্যে কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। সে স্বাক্ষর খুব স্পষ্ট নহে, অনেক সময়ে ঐতিহাসিকের গবেষণার ব্যাপার ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। বাহিরের দিকে রবীন্দ্রনাথকে যতই বিরোধের সম্মুখীন হইতে হউক না কেন, তাঁহার চারিদিকে যে একটি ভক্ত কবিগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন অপ্রধান গীতিকবির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

অপ্রধান কবি ॥

বিংশ শতাব্দীর একেবারে আরম্ভ হইতে কাব্যক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের মধ্যে কয়েকজন গীতিকবি রবীন্দ্রপ্রতিভার ছায়াতলে বসিয়া সাদা সুরে গান গাহিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ তখনও পুরাতন মন ও মেজাজ পুরাপুরি ছাড়িতে পারেন নাই ; কিন্তু তখনই রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে তাঁহারা পাখার মধ্যে মুক্তির ঝাপটানি উপলব্ধি করিতেছিলেন। কেহ-বা রবীন্দ্রচেতনার উত্তরাধিকার লাভ করিতে

না পারিলেও বাক্‌রীতি ও চিত্রকল্পের সুষ্ঠু অনুসরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৯০০), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮৪-১৯০৪), রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০)—ইঁহারা সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী, কেহ কেহ কবিগুরুর বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথের 'মাধবিকা' (১৩০১) এবং 'শ্রাবণী' (১৩০৪) নামক কবিতাসংগ্রহে কয়েকটি উৎকৃষ্ট সনেট সংগৃহীত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধগুলি যেমন চিত্ররীতি ও ভাস্কর্যরীতিতে উজ্জ্বল, তেমনি সনেটগুলি গাঢ়বন্ধ। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' (১৩০৭) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুচিস্নিগ্ধ রমণীহৃদয় এবং আর্ত মাতৃহৃদয়ের ব্যথাবেদনা এত নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোন মহিলাকবির মধ্যে এতটা সার্থক হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সনেটরচনার মতো দুরূহ কাব্যরীতিটি প্রিয়ম্বদা অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'পত্রলেখা' (১৯১০) এবং 'অংশু'তে (১৯২৭) তাঁহার কবিখ্যাতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছিল।

রমণীমোহন ঘোষ ও ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রমণীমোহনের বাক্‌রীতি কিছু উচ্ছ্বসিত এবং ভুজঙ্গধরের রচনারীতি কিছু সংযত—ক্লাসিক ধরনের। কিন্তু উভয়ের চিত্ততটে যে রূপ ও রসের তরঙ্গ আহত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাগর হইতেই উত্থিত। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য তরুণ কবি সতীশচন্দ্র রায় অল্পবয়সে লোকান্তরিত হইলেও প্রকৃতি ও জীবনকে যে নিবিড়ভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন, এবং জীবনের সর্বপ্রধান সৌভাগ্যের মধ্যে রবীন্দ্র-স্নেহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতেন, সে মনোভাব তাঁহার প্রাণরসপরিপূর্ণ কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে আরও দুই-একজনের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা রবীন্দ্র-প্রভাবে বর্ধিত হইয়াও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪১), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) এবং অতুলপ্রসাদ সেনের (১৮৭১-১৯৩৪) কথা স্মরণীয়। প্রমথনাথ রবীন্দ্রভাবরসে সিক্ত হইয়াও রচনা ও মননে এক প্রকার শান্ত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মা' (১৮৯৮), 'দীপালি' (১৯০১), 'আরতি' (১৯০২) প্রভৃতি কাব্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ প্রধানতঃ গীতিকার। রজনীকান্তের 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), এবং অতুলপ্রসাদের একখানি গীতিসংগ্রহ 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) মৌলিক কাব্যের মতোই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অতুলপ্রসাদের নিরাভরণ ভাষা ও সহজরসের সুর সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। রজনীকান্তের বহু গান এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাঁহার গানের অতিরিক্ত একট কাব্যসৌন্দর্য আছে, যাহা অতুলপ্রসাদের গানে ততটা নাই। সুরের অবলম্বন না পাইলে অতুলপ্রসাদের গানের ভাষা ঝিমাইয়া পড়ে। কিন্তু

রজনীকান্তের প্রেম, ভক্তি, স্বাদেশিকতার আবেগ ও নিষ্ঠা তাঁহার গানগুলিতে সার্থক-ভাবে গীতিকবিতার ধর্ম ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল একদা ঘোরতর রবীন্দ্রবিরোধিতা করিলেও মন ও মেজাজের দিক হইতে রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য। দুইখণ্ড 'আর্যগাথা' (১ম—১৮৮২, ২য়—১৮৯৩), 'আলেখ্য' (১৯০৭), 'ত্রিবেণী' (১৯১২) এবং 'মন্দ্রে' (১৯০২) যে সমস্ত গীতিকবিতা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মূল বিষয়—প্রেম, দেশপ্রেম ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ 'মন্দ্রে'র উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান ও কবিতার স্বতন্ত্র মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাক্‌রীতির দিক হইতে কিছু দুর্বলতা থাকিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল সহজ সরল প্রাণের কথা অনেক কবিতায় ফুটাইতে পারিয়াছেন। তবে গুণগত উৎকর্ষ বিচার করিলে তাঁহার সমসাময়িক অনেক কবিই উৎকৃষ্টতর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—যেমন প্রিয়ম্বদা দেবী ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। অবশ্য এই সময় দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের অনেক কবিতা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং তাঁহারাও রবীন্দ্রপ্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে যাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের কাব্যসাধনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া আমারা ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এবার আমরা কয়েকজন প্রধান কবির পরিচয় লইব। রবীন্দ্রভাবমণ্ডলে যাঁহারা বিশেষভাবে লালিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়, (গ) মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইস্‌লাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এই তালিকার 'গ' বর্গের কবিত্রয় একই ভাবমণ্ডলে বর্ধিত হইলেও তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাদর্শ ও ভাবজীবন ছাড়িয়া ভিন্নতর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন—যদিও বাক্‌রীতির দিক হইতে তাঁহারা প্রায়ই রবীন্দ্রানুসারী। নিম্নে ইঁহাদের কবিধর্মের সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ করা যাইতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ॥

রবীন্দ্র-জ্যোতিষ্কদের মধ্যে বয়সে নবীন হইলেও যিনি অজস্র কাব্য-কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভাস্বর রেখায় মুদ্রিত করিয়াছেন, তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে (চল্লিশ বৎসর) তাঁহার মৃত্যু না হইলে বাঙালী কাব্যরসিক বঙ্গ-ভারতীর নূপুরশিঞ্জন আরও কিছুকাল ভাবমুগ্ধ চিত্তে শুনিতে পাইত। সত্যেন্দ্রনাথ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, কাজেই তিনি রোমাণ্টিক কবিপ্রকৃতির সঙ্গে সংযত জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মননধর্মিতা ও ক্লাসিক মনঃপ্রকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যগুলির মধ্যে 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮—অনুবাদ কবিতা), 'তীর্থরেণু' (১৯১০—অনুবাদ কবিতা), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২),

'অভ্র ও আবীর' (১৯১৬) এবং 'হসন্তিকা' (১৯১৭—ব্যঙ্গ কবিতা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একখানি উপন্যাস[১] ও নাটক[২] রচনা করিয়াছিলেন। ছন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্য, বাক্‌রীতির অভাবনীয় বিস্ময়, ইতিহাস-পুরাণ-প্রত্নতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মন্থন করিয়া কাব্যামৃতলাভ, প্রেম, সৌন্দর্য, স্বাদেশিক আবেগ, নিসর্গের রোমাণ্টিক মাধুরী এবং পরিচিত দৃশ্য—সত্যেন্দ্রনাথ যেন চল্লিশ বৎসরের আয়ুষ্কালের মধ্যে সমস্ত কিছুকে নিঙড়াইয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্র-স্নেহলালনে বর্ধিত হইয়া তিনি কবিতার আর একটি বিচিত্র স্বাদ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ জীবনকে প্রত্যক্ষবৎ রাখিয়াও তাহাতে রোমাণ্টিক সৌন্দর্য সঞ্চার, লীরিক আবেগের সঙ্গে ক্লাসিক গাঢ়বদ্ধ ভাবকলা এবং তীক্ষ্ম মননের দীপ্তি তাঁহার বহু কবিতাকে এমন একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়াছে যে, একদা পাঠক-সমাজের একটা বড় অংশ রবীন্দ্রনাথকে ভক্তিভরে দূরে সরাইয়া রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোবিলাসী কবিতার নিক্কণে কান-প্রাণ ভরিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদ লাভ করিলেও কবিগুরুর গভীর আত্মসচেতন প্রকৃতিটি সত্যেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে নাই। তাই তরুণ কবি জগৎ-নাটমঞ্চের বাহিরেই রহিয়া গেলেন। প্রাণরঙ্গের রূপরস, উল্লাস, ঝঙ্কার, নৃত্যচপল ছন্দ তাঁহার ইহমুগ্ধ চেতনাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; প্রাণের অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া অন্তরলক্ষ্মীর প্রসাদ যাচিবার কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের মতো প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ময় জগতের শিল্পী। যেখানে ভাষা প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, প্রাণ আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, চেতন-অচেতন চিত্তপ্রবাহের পার্থক্য যেখানে ঘুচিয়া গিয়া একটা অপূর্ব তন্ময়ীভূত রসচেতনা জাগিয়া ওঠে, সেখান হইতে সত্যেন্দ্রনাথের চিরনির্বাসন। ভাষার চমকপ্রদ আকস্মিকতা, ছন্দের সজ্ঞান কারুকলা, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচুর সঞ্চয় সত্যেন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিকে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের অজস্রতায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু পুঞ্জীভূত উপাদান প্রায়শঃই রসে পরিণত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, সত্যেন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির মধ্যে এরূপ দুর্বলতা থাকিলেও বাণী-সৌকুমার্য ও চিত্রকল্পের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যে তিনি এক যুগের পাঠকের হৃদয় লুঠ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস ॥

এই কবিচতুষ্টয়কে এক পংক্তিতে বসাইয়া আলোচনা করিবার কারণ ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়াতলেই শুধু বর্ধিত হন নাই, কবিগুরুর ছায়া ত্যাগ করিয়া

১. 'জন্মদুঃখী' (১৯১১)। ইহা নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie-এর *Livsslaven* উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।

২. 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩)। ইহা কয়েকটি বিদেশী নাটকের অনুবাদ। ইহাতে মেটারলিঙ্কের *The Sightless* নাটকটি 'দৃষ্টিহারা' নামে অনূদিত হইয়াছে।

স্বকীয় কায়া ধরিতেও বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। বাক্‌রীতি, রূপকল্প, ছন্দপ্রকরণ, ভাবাবেগ—গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে ইঁহারা আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইঁহাদের কবিকৃতি অধিকাংশ স্থলে 'সূর্য'করদীপ্ত বলিয়া এই আলোকের উজ্জ্বলতা ইঁহাদের ততটা নিজের বলিয়া মনে হয় না।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহাদের মধ্যে করুণানিধান (১৮৭৭-১৯৫৫) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিখ্যাতি অচিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। করুণানিধানের 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০), 'ধানদূর্বা' (১৩১৮) এবং কাব্যসঙ্কলন 'শতনরী' (১৩৩৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবির একটি বিশিষ্ট রসদৃষ্টি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। করুণানিধান বিশুদ্ধ প্রেমপ্রীতির আসক্তির রসে রঙিন করিয়া জীবনকে দর্শন করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়িত ভঙ্গিমা, শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের অনায়াসলভ্য অজস্রতা এবং বাস্তবানুসারী রোমান্টিক কবিবাসনা অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁহার ছন্দ ও বাক্‌রীতিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অধিকতর লক্ষ্যগোচর হইবে। কোন দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মীয় চিন্তা বা বিবিধ সামাজিক সমস্যা স্বপ্নাভিসারী কবির দূরবিসর্পিত দৃষ্টিকে প্রত্যহের জগতে টানিয়া আনিলেও প্রত্যহের সমস্যা-জর্জর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। করুণানিধান বাস্তব জগৎকে স্বীকৃতি দিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই একটা অপাপবিদ্ধ গন্ধর্বলোক বা যক্ষপুরী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—কবি যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৮-১৯৪৮) প্রায় একই সময় কাব্যসাধনা আরম্ভ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া কবি-যাত্রায় বাহির হন। তাঁহার 'অপরাজিতা' (১৮১৯), 'নাগকেশর' (১৯১৩), 'নীহারিকা' (১৯১৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৯) একদা কাব্য-পিপাসু পাঠক-সমাজে সুপরিচিত ছিল। ইঁহার কবিদৃষ্টি কবি করুণানিধানের অনুরূপ হইলেও কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইতিহাস-চেতনা এবং বৃহৎ ভারতের সঙ্গে প্রাণের উদার অনুভূতির যোগাযোগ যতীন্দ্রমোহনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁহার 'মহাভারতী' এ-বিষয়ে একটি স্মারক কাব্য। মহাকাব্য ও পুরাণের চরিত্রগুলিকে নূতন আলোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের নিকটেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জগৎ প্রেম, প্রীতি ও সৌন্দর্যের জগৎ। তবে সে সৌন্দর্য একেবারে কল্পজগতের অস্পষ্ট মাধুরী মিশ্রিত নহে ; দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও তাহার যোগ রহিয়াছে। তিনি যেন প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের সঙ্গে খানিকটা সন্ধি করিয়াছেন,—করুণানিধানের মতো সূক্ষ্ম তিরস্করিণীর মধ্য হইতে জগৎকে

না দেখিয়া মাটির পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু চোখের স্বপ্নাঞ্জন মুছিয়া যায় নাই, বা কোন সমাজসচেতন অনুভূতি বা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়া কবির ধ্যানদৃষ্টিকে প্রখর প্রশ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস—কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) এবং কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) দুইজনেই লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু কাব্যরসে-উৎসুক পাঠকের চিত্তে বাঁচিয়া আছেন। পল্লীসাধক এবং বৈষ্ণবরসে আকণ্ঠতৃপ্ত কুমুদরঞ্জন অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'অজয়' (১৯২৭), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮)—এইরূপ ছোট ছোট অনেকগুলি সঙ্কলনে তাঁহার মনের প্রীতিস্নিগ্ধ গ্রামীণ রূপ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ শহরবাসী পাঠককেও একটা প্রসন্নতৃপ্ত জীবনের স্বাদ আনিয়া দেয়। অবশ্য কুমুদরঞ্জনের কবিতার বাক্‌নির্মিতি বহু স্থানে অযত্নচেষ্টাপ্রসূত; চিত্রকল্পও প্রায়শঃই গতানুগতিক। ফলে তাঁহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে সামান্যই কাব্য-রসিকের ভোগে লাগিবে।

কবিশেখর কলিদাস রায় মহাশয়ও কুমুদরঞ্জনের সমানধর্মা; তবে তিনি ততটা পল্লীগতপ্রাণ নহেন—যদিও তাঁহার বহু কবিতায় রাঢ়ের পল্লীশ্রীটি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি কাব্য ('পর্ণপুট'—১৯১৪, 'ব্রজবেণু'—১৯১৯, 'বল্লরী'—১৯১৫, 'বৈকালী'—১৯৪০) এখনও পাঠকসমাজে অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই; বৈষ্ণবরসে তিনিও আকণ্ঠমগ্ন, এবং প্রেমপ্রীতিকেই কাব্যজীবনের নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার বহু কবিতায় একটা চেষ্টাকৃত শিল্পাদর্শ অনুসরণের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার কয়েকটি কবিতা নিবিড় আস্বাদনের রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজেও একজন চিন্তাশীল রসপ্রমাতা, ফলে তাঁহার কবিতার কলারূপ কোন কোন স্থলে নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্যন্ত আমরা যাঁহাদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম, তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্রালোকে পথ চলিয়াছেন। একটু-আধটু গলিপথে দু-একজন যে চলিবার চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে (যেমন—কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়); কিন্তু নূতন পথ কাটিয়া চলার আনন্দবেগে পাথেয় ক্ষয় করিবার মতো দুঃসাহস ইঁহাদের কাহারও নাই। সেই দুঃসাহসের অধিকারী হইলেন তিন জন—মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মোহিতলাল, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ ॥

সূর্যালোকে গাহন করিয়াও সহস্রাংশুবর্ষী ভর্গদেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া নিজ প্রাণকে বহ্ন্যুৎসবে সমর্পণ এবং তাহার আলোকে নিজ ভস্মাবশেষ দেখিয়া চমকিয়া ওঠার বিচিত্র কাব্যরহস্য এই কবিত্রয়ের কাব্যে পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্বে আমরা যাঁহাদের কথা

বলিয়াছি তাঁহারা রবীন্দ্রপ্রতিভার দিব্যালোক হইতে আপনাদের অন্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথের বাক্‌রীতি ও চিত্রকল্প স্বীকার করিয়াও কবিগুরুর প্রেমপ্রীতি, বিশ্বচেতনা অখন্ড সৌন্দর্যপিপাসা এবং সংশয়-বিরহিত আস্তিক্যবাদকে অবহেলা করিয়াছেন এবং নূতন কাব্যপ্রত্যয়, প্রাণের রক্তিম-আবেগ এবং বুদ্ধির প্রখর জিজ্ঞাসাকে উদ্দীপিত করিয়া নবতর কাব্যরূপ সৃষ্টিতে সার্থকতার সন্ধান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তরুণদলের মুখপত্র 'কল্লোল (১৯২৩) প্রকাশিত হইলে ইঁহাদের কেহ কেহ এই পত্রিকায় নবলব্ধ আবেগ ও প্রত্যয়কে রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন। রবীন্দ্রযুগে বসিয়া অন্য সুরের সাধনা করিয়া এই তিন কবি বাংলা কাব্যে যুগান্তরের ইঙ্গিত দিয়াছেন। পরবর্তী দশকে যাঁহারা আধুনিক কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কারণ তাঁহাদের পূর্বে মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আধুনিক কবিদের মাঙ্গলিক গাহিয়াছেন। সে সুরের মধ্যে কিছুটা অবিনয় ছিল, সৌরকরদীপ্তিকে ম্লান করিয়া দিবার দুঃসাধ্য প্রয়াসও যে ছিল না, তাহা নহে,—কিন্তু বাংলা-কাব্যে নূতন সুর-সংযোজন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই তিনজন কবি বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রানুকরণের ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২)—পূর্বোল্লিখিত কবিত্রয়ের মধ্যে মোহিতলাল সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল ম্যাথু আর্নল্ডের মতো কবি ও সমালোচক। জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি মৌলিক ধারণা ছিল ; জগতের প্রতি একটা নাস্তিক্যবাদী দেহচেতন সৌন্দর্যবোধ সহ, তান্ত্রিকসুলভ মৃদ্‌ভান্ডকে চিদ্‌ভান্ডে পরিণত করিয়া এবং প্রকৃতির কটাক্ষ-ঈক্ষণে মুগ্ধ হইয়া তিনি কবোষ্ণ কামনারসে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোহিতলাল জীবনবাদী। জীবন-রঙ্গনটীর ললাম লীলাবিলাস তিনি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়াছেন ; আবার পরক্ষণে শোপেন-হাওয়ারের মতো সমস্ত সৃষ্টিসত্যের অন্তরালবর্তী মায়াবিনী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন। তাঁহার 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১) এবং 'ছন্দচতুর্দশী' (১৯৫১) বাংলার কাব্যরসিক সমাজে সুপরিচিত। প্রেমকে দেহের সহিত অন্বিত করিয়া, এবং জীবনকে অধ্যাত্মপিপাসার বাতায়নে বসিয়া উপভোগ না করিয়া কামনার জ্বলন্ত জ্বালা বুকে বহিয়া মোহিতলাল অভিনব কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনার গূঢ় নির্যাসকে অন্তরদেবতার চরণে উপহার দিয়া মোহিতলাল রবীন্দ্রযুগে বলিষ্ঠ প্রাণবোধ ও উত্তপ্ত দেহচেতনার অতৃপ্ত রসায়ন পান করিয়া যে বিষামৃত পরিবেশন করিয়াছেন, এখনও অনেকে তাহারা যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মোহিতলালের জীবনধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের মধ্যে মৌলিক

পার্থক্য ছিল ; তাই মোহিতলালের গদ্য সমালোচনার অনেক স্থলে রবীন্দ্রভাবাদর্শের প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মা ও বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ মর্মাহত হইয়া মোহিতলালের কাব্যরূপ ও কবিপ্রকৃতিকে ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিতেই চাহেন না। ইদানীং কেহ কেহ প্রথম হইতেই কোমর বাঁধিয়া মোহিতলালের কবিকর্মের অকারণ নিন্দায় মত্ত হইয়াছেন। মোহিতলাল প্রথম জীবনে স্কুলমাস্টার ছিলেন, ফলে কোন কোন সমালোচকের মতে, মোহিতলাল সাহিত্যে স্কুলমাস্টারী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, "তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম ইহার জন্য কম দায়ী নয়।" ঢাকায় গিয়া মোহিতলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। এই জন্যও তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, "ঢাকায় গিয়া তাঁহাকে অধ্যাপনাসূত্রে পাঠ্যগ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইত। তাহা হইতে তিনি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়েন। তাঁহার এই সমালোচনা প্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাতরণের ভেলা হিসাবে উপযোগী নিশ্চয়ই, কিন্তু সাহিত্যসমালোচনা হিসাবে সেগুলি খুব মূল্যবান নয়।" এই সমস্ত উক্তির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচার কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় তাহারই একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া। যেখানে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ সমালোচকগণ এইরূপ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন, সেখানে মোহিতলালের অভিনব কাব্যরীতি, রূপ ও মননের বৈশিষ্ট্য অর্বাচীন সমালোচকের নিকট কিরূপ 'হাড়ির হাল' হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাব্যরসভোগের জন্য পূর্বতন বাসনা-সংস্কার প্রয়োজন। তাহা না হইলে কোন-এক সমালোচকের কাছে মোহিতলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিখুঁত কবিতা 'পান্থ' সম্বন্ধে মনে হইবে, "কবিতাটির মূল আইডিয়াটি দুর্বল ··· এই ব্যথাবেদনার অভীপ্সা একটা ভঙ্গিমা মাত্র। ইহাকে বলিতে পারি ড্রয়িংরুমের দুঃখবাদ অর্থাৎ দুঃখবিলাসিতা।" এই সমস্ত মতামত যে কতদূর অযৌক্তিক, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মোহিতলালের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, রোমাণ্টিক দৃষ্টি এবং ভাষা, ছন্দ ও বাক্‌রীতির নিটোল সংযত ক্লাসিক রূপকল্প ও ভাস্কর্যরীতি—সমস্ত কিছু মিলিয়া মিশিয়া যে কবিপ্রকৃতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ এমন অনন্যসাধারণ যে, প্রবীণ ও অর্বাচীন উভয় শ্রেণীর সমালোচক মোহিতলালের কবি-প্রতিভা বিচারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মর্ত্যজীবনের আনন্দবেদনারসে আকণ্ঠমগ্ন কবি মোহিতলালের স্বগত-ভাষণের কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইতেছে :

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন, বৈকুণ্ঠ স্বপন ?
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।

এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচি, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত নয়ন।

কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) নজরুল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কয়েক বৎসর তরুণ বাঙালী সমাজে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, এই সময় কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর হইয়াও শুধু প্রাণে অগ্নি দেবতার আশীর্বাদ এবং দেহে-মনে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ লইয়া তিনি ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বিদ্রোহী কবি ধূমকেতুর মতো নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। কবি কিছুকাল সামরিক আবহাওয়ায় বাস করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ে ফারসী ভাষাও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাব প্রধান হইয়া তাঁহার কবিমানসকে নূতন সৃষ্টির উল্লাসে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কবি 'লাঙল', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি বিপ্লববাদী ও সাম্যবাদী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ দুর্দম উন্মাদনা, অসহিষ্ণু প্রাণবেদনা, বীররস ও রৌদ্ররস, উৎসাহ-উদ্দীপনার অগ্নিপ্রবাহ, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের এরূপ নিগূঢ় উপলব্ধি—সর্বোপরি বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য নবজীবনের স্বপ্নদর্শন বাংলা কবিতায় একেবারে অভিনব ব্যাপার। সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে কাজি অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিলেন; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নবযৌবনের পূজারী নজরুলকে সস্নেহে উৎসর্গ করিলেন। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া নজরুল নব আদর্শে পরিকল্পিত পত্রিকাটিতে রুদ্ররস ভরিয়া দিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল কবি মোহিতলালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। একমাত্র গজল গানগুলি ছাড়া মোহিতলালের কোন স্থায়ী প্রভাব তাঁহার কবিতায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল তাঁহার প্রেমের কবিতায় যে তীব্র আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'স্মরগরলে'র কবির প্রভাবে পরিকল্পিত হইতে পারে। তবে মোহিতলালের জীবন-দর্শনের গভীরতা, ক্লাসিক বাক্‌নির্মিতি, হেডোনিজ্‌ম্ ও এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম্‌কে মিলাইয়া দিবার দুর্লভ শক্তি এবং জীবনের দুই প্রান্তকে মিলাইতে না পারার জন্য আত্মার আর্তনাদ নজরুলের চঞ্চল, তরল, আবেগবেপথু কিশোরসুলভ উচ্ছ্বসিত চিত্তে খুব একটা গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। নজরুলের 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) বিদ্রোহের ঋক্‌সংহিতা। আশ্চর্য আবেগ, প্রাণসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অসহিষ্ণু উত্তাপ, বিপ্লবের অশনিসঙ্কেত, হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে বিধৃত করিবার অন্তর্দৃষ্টি নজরুলকে একদিনেই অমরত্বের অধিকার দান করিল। তাঁহার 'ভাঙার গান' (১৩৩১), 'বিষের বাঁশী' (১৩৩১)-তেও রৌদ্ররসের প্রচুর সমারোহ। কিন্তু নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবি নহেন—তিনি প্রেমিক কবি, ভক্ত কবি। প্রেমকে

কখনও দেহের তীরে দাঁড় করাইয়া, কখনও বা সূক্ষ্ম বিরহের বাতায়ন হইতে দর্শন করিয়া নজরুল প্রেমের কবিতায় একসঙ্গে প্যাসন ও ইমোশন ভরিয়া দিয়াছেন। সর্বশেষে তাঁহার শ্যামাসংগীত ও ইসলামি সঙ্গীতগুলি তাঁহাকে বাংলাদেশে দীর্ঘজীবী করিবে। তবে এই প্রসঙ্গে নজরুল-প্রতিভার সীমাটুকু জানিয়া রাখা ভালো।

কাজির যে পরিমাণে আবেগ ছিল, সেই পরিমাণে সংযম ও শুচিতা ছিল না ; শুচিতা বলিতে আমরা কাব্যের সংযমজনিত পরিপূর্ণ বিকাশধারাকে নির্দেশ করিতেছি। তাই হঠাৎ মধ্যরাত্রে প্রবল অগ্নিবর্ষণ করিয়াই তিনি প্রেম ও ভক্তির কবিতার মধ্যে হারাইয়া গেলেন। নজরুলের অবেগ একমাত্র 'অগ্নিবীণা'র গুটিকয়েক কবিতায় খানিকটা কায়ালাভ করিতে পারিয়াছে। তাঁহার সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা 'বিদ্রোহী'র কেন্দ্রীয় বিষয়ে সংহতি নাই।* সুরের মধ্যে এমনভাবে বিমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, ইহাতে একমাত্র নির্জলা উত্তেজনা ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর রসমূর্তি লক্ষ্য করা যাইবে না। একমুখী বিপ্লবী ও উল্লাস একটু পরেই বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে ; তখন পাঠক বিপ্লবী কবিকে ভুলিয়া যায়। নজরুলের সম্পর্কেও তাহাই হইয়াছে ; আমাদের মনে হয় তিনি প্রেমের গান, গজল এবং ভক্তিসঙ্গীত রচনা না করিলে এতদিন পাঠক সমাজে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। আবেগের উদ্দাম প্রাচুর্য এবং মননের কিঞ্চিৎ দীনতা তাঁহাকে সার্থক কবি হইতে বাধা দিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)—মোহিতলালের মতোই কবি যতীন্দ্রনাথ নূতন পথের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। বৃত্তিতে তিনি ইঞ্জিনিয়ার ; ইট-কাঠ-পাথর-লোহা লইয়াই তাঁহার কারবার, নির্মিতি-কৌশল তাঁহার হস্তামলক। ফলে জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা বুদ্ধিদীপ্ত নির্মোহ জ্ঞানবাদ তাঁহার কবিজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যবাদের বিরুদ্ধেই যেন ঈষৎ অম্লাক্ত দৃষ্টিভঙ্গিমার অবতারণা করিয়া যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। দুঃখ, নৈরাশ্য, ব্যর্থতাকে আবাহন করিয়া এবং সৃষ্টির অর্থহীন অভিব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমার দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া যতীন্দ্রনাথ বেসুরা বীণায় যে কর্কশ সুর তুলিলেন, তাহা চারিদিকে ভাঙাচোরা, বিবর্ণ, অর্থহীন জীবনটাকে পশুকঙ্কালের মতো সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

প্রথমে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনা এবং অপার্থিব প্রেমের তুরীয় আনন্দকে তীক্ষ্ম কটাক্ষে বিব্রত করিয়া তুলিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিত্তে ও চিন্তনে দুঃখবাদী নৈরাশ্য-তত্ত্ব জাগিয়া উঠিল। 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮), 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) এবং 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬—কাব্যসঙ্কলন)—যতীন্দ্রনাথের মোট কাব্যফসল। পরিমাণে সুপ্রচুর নহে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে প্রায়

* এই কবিতার মূল নাকি মোহিতলালের কোনো এক গদ্যনিবন্ধের ছায়াতলে নিহিত।

মোহিতলালের সমকক্ষ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছে, প্রথমটা রোমান্টিক আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ার বশেই তিনি শুষ্ক যুক্তিবাদ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রকৃতি ও প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মধুলোভী কবিবৃন্দ জগৎ, জীবন, সৌন্দর্য, প্রেম ও ভক্তির জয়গান গাহিতেছেন বটে, কিন্তু আসলে এ সমস্তই প্রকাণ্ড ফাঁকি। বঞ্চনার ইতিহাসই প্রেম ; আমাদের মূঢ় বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকৃতিকে রমণীয় ও ভগবানকে শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তোলে। ছলনাময়ী প্রকৃতি মানুষকে নিদারুণ দুঃখ দিবার ছলে মোহজাল বিস্তার করে, প্রেম শুধু অন্তর্জ্বালাময় কামায়ন এবং স্থূল 'অহং'-এর জান্তব পীড়ন মাত্র, ভগবান একজন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী স্বেচ্ছাচারী জিউয়স—কবির এ সমস্ত তত্ত্বই একটা দুঃখ-দার্শনিকতা—যে দার্শনিকতা বাহ্যতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক হইলেও আসলে আবেগের উল্টা পিঠ মাত্র। অবশ্য বাংলা কাব্যে এ দুঃখবাদ অভিনব হইলেও খুব একটা মৌলিক ব্যাপার নহে।[৪] ইংরাজ 'মেটাফিজিকাল' কবি (তাত্ত্বিক কবি) ডানের[৫] দ্বারা যতীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন—এমনকি আক্ষরিক প্রভাবও আছে। তাই আমাদের মনে হয় যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অনেক সময়ে একটা ভঙ্গী মাত্র ; দর্শন, হৃদয় ও মননের খুব গভীর স্তরে এই দুঃখবেদনা পেঁছায় নাই। এই দুঃখবাদ কবির আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইলে, তিনি আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে দুঃখের দেবতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। দুঃখবাদ তাঁহাকে নৈরাশ্যবাদী করিলেও নাস্তিক করিতে পারে নাই। বরং তিনি যত দুঃখ পাইয়াছেন, ততই দুঃখের নির্মম বন্ধুকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং সেইজন্যই এই রন্ধ্রপথ দিয়া কবি আবার প্রেম ও সৌন্দর্যের জগতে ফিরিবার আহ্বান উপলব্ধি করিলেন 'সায়ম', 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'র মধ্যে। গ্রীক অদৃষ্টতত্ত্বের মতো দুঃখবাদের দানব কবিকে যে সারা-জীবন মরীচিকার সন্ধানে ঘুরাইয়া মারে নাই, ইহাতেই কবিসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। মোহিতলাল তৎসম শব্দকে রোমান্টিক চেতনা-বিকাশে প্রয়োগ করিয়া একটা প্রশংসনীয় কাব্যকলা সৃষ্টি করিয়াছেন ; যতীন্দ্রনাথ সে পথে না গিয়া তদ্ভব, দেশজ—এমন কি, 'স্ল্যাং' শব্দকেও চকিত চমকের মতো ব্যবহার করিয়া বাস্তব জীবনের বেদনা ও ব্যঙ্গকে স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি দান করিয়াছেন। তাঁহার মনোভাবটি নিম্নলিখিত ছত্র কয়টিতে চমৎকার ফুটিয়াছে :

কোথা সে অগ্নিবাণী—
জালিয়া সত্যে, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তি খানি।
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো।

---

৪. ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' দ্রষ্টব্য।

৫. John Donne (1573-1631).

খেলোয়াড়ি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
চর্ম ভেদিয়া মর্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্মব্যথা ?
এ কথা বুঝিব কবে—
ধানভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকিয় রবে ?

পরবর্তী কালে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা কাব্যে যে নূতন কাব্যকলা ও কবিপ্রতীতির আবির্ভাব হইল, যাহা ১৯৩০ সালের দিকে যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কবিতার অনুকরণে নূতন পথের সন্ধান দিল, তাহার প্রথম সূচনা করিয়াছেন মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ। এই কবিত্রয় যেন রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

নাটক ও নাট্যসাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দুইজন নাট্যকার বাংলার নাটমঞ্চকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গম্ভীর রসের নাটক ও হাল্কা চালের প্রহসনের জনপ্রিয়তা, বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের খ্যাতি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। এখন দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের নাটক আধুনিক রুচিকে ততটা আনন্দ দিতে পারে না, কিন্তু আবেগময় ভাষায় রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের বীররসাত্মক ঐতিহাসিক নাটক এখনও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলশ্রেণীর দর্শককেই প্রচুর আনন্দ দিয়া থাকে। ১৯০৫ সালের পূর্বেই বাঙালীর মন দাহ্য পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কার্জনের বঙ্গবিভাগ তাহাতে একটু অগ্নি-কণিকা নিক্ষেপ করিল—যাহার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান, ব্রহ্মবান্ধবের অগ্নিস্রাবী প্রবন্ধ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটক বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)॥

দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চশিক্ষিত। অধ্যয়নের জন্য কিছুকাল পাশ্চাত্যে বাস করিয়া পশ্চিমের সাহিত্য, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি সুপরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। প্রথম যুগে কিছু কিছু কাব্যানুশীলন করিলেও নাটকেই তাঁহার প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে; গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের প্রভাব হইতে বাংলা নাটককে রক্ষা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও স্বদেশপ্রেমের অধিকতর বাস্তব ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্র ও কাহিনীকে টানিয়া আনিয়াছেন। নাটকে বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য আঙ্গিক অনুসরণ তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৫] এবিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে প্রধানতঃ ব্যঙ্গ, রঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটক লইয়া সাহিত্য-

৫ দ্বিজেন্দ্রলাল ইবসেনের অনুসরণে নাটক হইতে স্বগতোক্তি তুলিয়া দেন।

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রভৃতি প্রহসনগুলি একদা প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হইলেও প্রহসন হিসাবে বিশেষ সার্থক হয় নাই। একমাত্র 'কল্কি অবতারে'র ব্যঙ্গ এবং 'বিরহে'র রঙ্গরস খানিকটা সহনযোগ্য। যিনি হাসির গানে এত বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তিনি রঙ্গনাট্যে সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) তাঁহার একটি বিশেষ কলঙ্ক। এই সময়ে হঠাৎ তিনি অনাহূতভাবে বাংলা সাহিত্যের নৈতিক বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকারণে বিদ্বিষ্ট হইয়া অভব্য ভাষায় তাঁহাকে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। এই রঙ্গনাট্যে বিষোদ্গার চূড়ান্ত কটূকাটব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক আদর্শ এবং রবীন্দ্রানুরাগীদের বিরুদ্ধে তিনি কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ্য এই অশিষ্টতার জন্য তিনি উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছিলেন। অভিনয়ের রাত্রিতে প্রেক্ষাগৃহে রঙ্গ দেখিবার জন্য স্বয়ং নাট্যকারও উপস্থিত ছিলেন। দর্শকবৃন্দ কয়েকটি দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে এবং নাট্যকারকে চূড়ান্ত অপমান করিতে অগ্রসর হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি শারীরিক নিপীড়ন হইতে কোনও প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রদর্শকের কঠোর ভৎর্সনা এবং 'বীরবলে'র (প্রমথ চৌধুরী) বিদ্রূপের চাবুক হইতে রক্ষা পান নাই। প্রহসন হিসাবে 'আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনখানি পৌরাণিক নাটক ('পাষাণী'—১৯০০, 'সীতা'—১৯০৮, 'ভীষ্ম'—১৯১৪) পুরাতন কাহিনীকে নূতনরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পাশ্চাত্য ভাবরসমুগ্ধ চিত্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। এই নাটকত্রয়ের কাহিনী-উপস্থাপনে ও চরিত্রের তির্যকতা সৃষ্টিতে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যরস খুব গাঢ় হয় নাই বলিয়া এগুলি অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের আদর্শে 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) রচনা করিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য সামাজিক নাটকে তিনি কোনওরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। খুন-জখম, পিস্তল-বন্দুক, হত্যা-ফাঁসি প্রভৃতি চমকপ্রদ লোমহর্ষক ঘটনা পুরাতন বেশেই তাঁহার নাটকে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা ও খ্যাতি নির্ভর করিতেছে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপর। ইতিপূর্বে প্রায় সকল নাট্যকার কিছু কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রও স্বাদেশিক আন্দোলনের আবেগতপ্ত পরিবেশে ঐতিহাসিক নাটকের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ইতিহাসকে যথাযথভাবে নাটকে ব্যবহার করিতে পারেন নাই; অলৌকিকতা, অবাস্তবতা ও অনৈতিহাসিকতা তাঁহার নাটকগুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যপ্রতিভার প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়াছেন। প্রধানতঃ মুঘলযুগ এবং অংশতঃ হিন্দুযুগের কাহিনী

অবলম্বনে তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। মুঘলযুগের ইতিহাস রক্তরঞ্জিত, ষড়যন্ত্রমুখর, ভ্রাতৃঘাতী এবং পিতৃদ্রোহী কর্কশ কোলাহলে উচ্চকিত। তাহাতে নাটকীয় ঘটনা-সংবেগের উদ্দামগতি আছে বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মুঘলযুগ ও রাজপুত বীরত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রচনা করেন 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), ও 'সাজাহান' (১৯০৯)। হিন্দুযুগ অবলম্বনে রচিত হয় 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) এবং 'সিংহল-বিজয়' (১৯১৫)। তন্মধ্যে 'সিংহল-বিজয়' দুর্বলতম রচনা। তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান', নূরজাহান' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' একদা বাংলার রঙ্গমঞ্চকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইতিহাসের অস্ত্র-ঝনঝনা ও শাঠ্যষড়যন্ত্রের মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে, নাট্যকার এই সমস্ত নাটকে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। 'সাজাহানে' পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্ব এবং 'নূরজাহানে' নারী-প্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সার সংঘর্ষ চমৎকার ফুটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে পাশ্চাত্য রীতিকে সাক্ষাৎভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই নাটকগুলি। জীবনের এমন বিপুল গতিবেগ, স্বাদেশিকতার এমন বলিষ্ঠতা এবং মহত্তর আদর্শের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ বাংলা নাটকে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। পরবর্তী কালের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি তাঁহার নাটক লইয়াই জনচিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি বাংলার বাহিরেও ডি. এল. রায়ের নাটকের প্রচুর সমাদর লক্ষ্য করা যাইবে। হিন্দী নাটকের একটা বড় অংশ দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় তাঁহার অনেক নাটক অনূদিত হইয়া বাঙালীর নাট্যপ্রতিভাকে সর্বভারতীয় জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সর্বভারতীয় সাহিত্যসত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল—ইঁহাদের গ্রন্থই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, "কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চরিত্রচিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের কিছু মাত্র মর্যাদা রাখিতে চেষ্টা করেন নাই।" তাঁহাদের মতে 'সাজাহান' নাটকের নাম 'জাহানারা' হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত। এসব মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। 'সাজাহান' নাটকের নাম 'জাহানারা' হইলেই যদি চলিত, তাহা হইলে শেকস্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সিজারে'র নাম 'ব্রুটাস' হইলেই-বা কি ক্ষতি হইত। আদিকবি বাল্মীকি 'রামায়ণে'র নাম কাটিয়া 'শূর্পণখা-নাসিকা-সংহারম্‌' রাখিতে পারিতেন কি? দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাস লঙ্ঘিত হইয়াছে, ইহা কখনও সত্য নহে। নাট্যকার যতদূর সম্ভব ইতিহাস মানিয়া চলিয়াছেন। একমাত্র 'সিংহল-বিজয়ে' ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবের জন্য তাঁহাকে কিংবদন্তীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকে তিনি ইচ্ছা করিয়া কাহিনীকে বিকৃত করেন নাই। তবে শুষ্ক ইতিহাসকে নাটকের 'পঞ্চসন্ধি' বা 'ঐক্যত্রয়ে'র (Three Unities) মধ্যে আনিতে গেলে কখনও কখনও কাহিনী বা চরিত্রের ঈষৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে; দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রয়োজনস্থলে সেইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন। সেরূপ স্বাধীনতা যে-কোন নাট্যকারেরই আছে। ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী যে কিরূপ জীবনরসে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মধ্যে উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি বাংলা নাটকের রূপ ও রীতি সংশোধনের ব্রত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মুখ চাহিয়া নাটক লিখিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি স্বাধীনভাবে নিজে মনোমত আদর্শ অনুসারে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজ অর্ধশতাব্দী পরেও তাঁহার নাটকের জনপ্রিয়তা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহাতেই তাঁহার নাট্যপ্রতিভার ঐশ্বর্য প্রমাণিত হইতেছে।

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের নানা গুণ সত্ত্বেও কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে—যাহার জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। অতিনাটকীয়তা ও গুরুগম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষা তাঁহার নাটকের নাটকত্ব অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সংলাপ নাটকের প্রধান অঙ্গ। তাহাতে তিনি কবিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, বক্তৃতার ঢঙে ভাষাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করিতে পারেন নাই। উপরন্তু তিনি মানুষের বাস্তব চরিত্রকে বাদ দিয়া উচ্চতর আদর্শলোকের মহিমান্বিত রূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শূন্যগর্ভ বাক্যবীর চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। মনে হয় তাহারা যেন নাট্যকারের ধমক খাইয়া পড়া বুলি মুখস্থ বলিয়া যাইতেছে। ভাষার এই কৃত্রিমতা তাঁহার অধিকাংশ নাটকের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তিনি শেক্সপীয়র অপেক্ষা জার্মান নাট্যকার শীলারের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শীলারের দোষগুণ উভয়ই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পরিলক্ষিত হইবে। গিরিশচন্দ্রের নাটক খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও তাহাতে কৃত্রিমতা নাই, ভাষার আলঙ্কারিক বাড়াবাড়ি নাটকীয় রসকে নষ্ট করিয়া দেয় নাই। সে যাহা হউক ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তার দিক হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য সকল নাট্যকারকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এখনও তাঁহার নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) ॥

একদা ক্ষীরোদপ্রসাদ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ প্রভাব এবং দর্শকমহলে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আলিবাবা', 'কিন্নরী', 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'রঞ্জাবতী', 'বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য' বোধহয় এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও জনতার দাবি মানিয়া লইয়া প্রয়োজনস্থলে কিছু নিম্নগ্রামে সুর বাঁধিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অবশ্য তাঁহার মনটি অতিশয় উদার ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো পবিত্রতার শুচিবাতিক ছিল না। কাজেই তিনি রচনাভঙ্গিমা, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীগ্রন্থনে কখনও রবীন্দ্রনাথ, কখনও-বা শরৎচন্দ্রের

প্রভাব স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নাটকসমূহ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক, রোমান্টিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য' (১৮০৩), 'আলমগীর' (১৯২১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য' স্বাদেশিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ; কাজেই অনৈতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র এবং স্বাদেশিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস ইহাতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতাপকে জাতীয় বীর করিয়া তুলিবার জন্য বিংশ শতকের গোড়াতেই অনেক ঐতিহাসিক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; মুঘলের বিরুদ্ধে ধূমঘাটের যে বীর-বাঙালী সংগ্রাম করিয়া পরাভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাহিনী বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই স্বদেশী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তাঁহার 'আলমগীর' নাটকে ঔরংজেবের বিচিত্র চরিত্রদ্বন্দ্ব আচার্য শিশিরকুমারের অভিনয়-দক্ষতার গুণে অদ্যাপি খ্যাতি বজায় রাখিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কোন বৃহৎ আদর্শবাদ ক্ষীরোদপ্রসাদের কল্পনার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই বলিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস রূপকথায় পরিণত হইলেও বিশেষ কোন কৃত্রিমতা কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে ভাবরাজ্যের অশরীরী জীবে পরিণত করে নাই। কিন্তু যাহাকে নাট্যচেতনা বলে, ক্ষীরোদপ্রসাদের চিত্তে তাহা ততটা তীব্র ছিল না ; উপরন্তু অতিনাটকীয়তার বাড়াবাড়ি তাঁহার নাটকের অনেক সংকটমুহূর্তকে (climax) নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের ছিল ; এইজন্য তাঁহার অনেক নাটক অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও সাহিত্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহে।

তাঁহার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) উল্লেখ করা যায়। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য, ইহাতে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসের প্লাবনের অল্পতা বা অভাব। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের চারিদিকে এমন একটি ভক্তি ও করুণ রসের আবরণ টানিয়া দিয়াছিলেন যে, নাটকের পরিবেশ হইতে পুরাণের দেশ ও কাল বহুস্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ যথাসম্ভব পুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে চরিত্রগুলিকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দ্বারা আন্দোলিত করিয়া নাট্যরস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'নরনারায়ণে'র কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং 'ভীষ্মে'র অম্বার প্রতিহিংসাময়ী নারীচরিত্রের অভিনবত্বে একযুগের দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ একদা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও নাট্যরচনার কলাকৌশল কখনও মন দিয়া অনুশীলন করেন নাই। মোটামুটি চরিত্রদ্বন্দ্ব বা ঘটনার নাটকীয় গতিবেগ সম্বন্ধে অবহিত হইলেও তিনি কোন নাটকেই পূর্ণ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও অক্ষমতা এত চরমে উঠিয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের রীতিমতো বিরক্তি সঞ্চারিত হয়। 'ভীষ্ম' পুরাপুরি যাত্রার ঢঙে লেখা ; ভাষা ও ঘটনাপরিস্থিতিকে চিত্তাকর্ষী করিতে গিয়া তিনি অত্যন্ত নিম্নস্তরের সস্তা

চটুলতা আমদানি করিয়াছেন। 'নরনারায়ণে'র কোন কোন অংশ নিতান্ত মন্দ নহে, অবশ্য অনুসন্ধান করিলে এই নাটকের কর্ণ-চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদে'র ছায়া লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু শেষ-রক্ষা হয় নাই। শেষ পর্যন্ত 'নরনারায়ণে' চরিত্রদ্বন্দ্ব অপেক্ষা অবাঞ্ছিত ভক্তিরস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের হালকা চালের কাল্পনিক নাটকগুলি সত্যই প্রশংসা দাবি করিতে পারে। 'আলিবাবা'র (১৮৯৭) মতো জনপ্রিয় গীতিমুখর নাটক বাংলাদেশে দুর্লভ। এই একখানি নাটক লিখিয়াই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হইয়া পড়েন। 'কিন্নরী'র (১৯১৮) অতিরোমান্টিক কল্পনা একযুগের দর্শকদের মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কৌতুকরসে ক্ষীরোদপ্রসাদের বেশ অধিকার ছিল। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে কৌতুকরস প্রয়োগ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার 'আলিবাবা'র মতো লঘু তরল নাটকে সঙ্গীত-আধিক্যের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত কৌতুকরস পরম উপভোগ্য হইয়াছে। আমাদের দুঃখ, ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা'র মতো বেশি নাটক রচনা করেন নাই। তিনি তথাকথিত পুরাণ-ইতিহাস লইয়া অতটা মাতামাতি না করিয়া 'আলিবাবা'র মতো একাধিক নাটিকা লিখিলে দর্শক ও পাঠকের আনন্দ বৃদ্ধি পাইত। ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের মতো উচ্চশ্রেণীর নাটক লিখিবেন বলিয়া পণ করিয়া আসরে নামেন নাই, পেশাদার নাট্যকার হিসাবেই তিনি নাটক ও প্রহসন রচনায় অগ্রসর হন। সে দিক দিয়া তিনি সার্থক। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ নাটক সাহিত্যহিসাবে যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকখানি উপন্যাস (যেমন 'গুহামধ্যে') সুখপাঠ্য। তিনি উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই; কোথাও-বা তাঁহার রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের প্রভাব পড়িয়াছে।

ক্লাসিক থিয়েটারের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) নাটমঞ্চের জঠর পূর্তির জন্য কয়েকখানি গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য এবং *Hamlet* অবলম্বনে 'হরিরাজ' রচনা করিয়াছিলেন।* এই সমস্ত নাটক-নাটিকার মধ্যে কোন্‌খানি তাঁহার প্রকৃত রচনা এবং কোন্‌খানি অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত রচনা শুধু জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়াছে।

সমসাময়িক নাট্যসাহিত্য ॥

ইতিপূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে কবিগুরুর নাট্যসাহিত্যকে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিয়াছি। তাঁহার নাটকের বিচিত্র কারুকলা, রচনারীতির অভিনবত্ব এবং বিষয়বস্তুর চমকপ্রদ নূতনত্ব শিক্ষিত বাঙালীর মন জয় করিয়াছিল; কিন্তু অভিনয়ে তেমন উতরায় নাই, বা জনপ্রিয় হয় নাই। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তাঁহার 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'চিরকুমার সভা' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইলেও তাঁহার অন্যান্য

* কেহ কেহ মনে করেন, 'হরিরাজ' নাকি তাঁহার রচনা নহে।

নাটক সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—তাহা জনসাধারণের ভোগে লাগে নাই। হয়তো রবীন্দ্রনাট্যের সূক্ষ্ম ভাবরস, নাটকীয় ঘটনাসংবেগের স্বল্পতা এবং উচ্চতর মানসিক আবেদনের জন্য জনসাধারণ রবীন্দ্রনাটকের রস গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাজেই শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী এবং কলিকাতার অভিজাত পল্লীর সৌখীন রঙ্গালয় ভিন্ন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বা কলিকাতার বাহিরের রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাটক সে যুগে বড় একটা অভিনীত হইত না। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যাঁহারা আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু রায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ বসু এবং প্রমথনাথ বিশীর নাম উল্লেখ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চলে নাই। ইঁহাদের নাটক না হইলে বাংলার রঙ্গমঞ্চ প্রাণরসহীন হইয়া পড়িত ; এইজন্য আধুনিক রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই নাট্যকারগণ নিশ্চয় শ্রদ্ধার আসন লাভ করিবেন।

অপরেশ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) দীর্ঘকাল নাটমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি নাটমঞ্চের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া 'আহুতি' (১৯১৪) 'রাখীবন্ধন' (১৯২০), 'অযোধ্যার বেগম' (১৯২১) রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু নাটমঞ্চের বাহিরে যে বিরাট সাহিত্যসমাজ রহিয়াছে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিবার অবকাশ পান নাই। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও (বাংলা ১২৯৩-১৩৪৮ অব্দ) অভিনেতা এবং নাট্যকার। তাঁহার 'সীতা' (১৯২৪), 'দিগ্বিজয়ী', 'বাংলার মেয়ে' (১৯৩৪) প্রভৃতি নাটকগুলি এই যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। যোগেশচন্দ্র নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন ; কাজেই তাঁহার নাটক শুধু অভিনয়েই শেষ হইয়া যায় নাই, অভিনয়ের অতিরিক্ত সাহিত্যগুণও অর্জন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় পৌরাণিক নাটকে ('দেবাসুর'—১৯২৮, 'কারাগার'—১৯৩০, 'অশোক'—১৯৩৪) নূতন রসসঞ্চারের চেষ্টা করেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি এক হিসাবে অভিনব। রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বমুখর চরিত্রসৃষ্টির বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়া রায়মহাশয় বাংলা পৌরাণিক নাটকের নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। পৌরাণিক নাটকের চিরাচরিত ভক্তিরস বাদ দিয়া তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবর্তকে এমন সুকৌশলে মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন যে, এই সংমিশ্রণ প্রভূত প্রশংসা দাবি করিতে পারে। এই দিক দিয়া 'কারাগার' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কংস-কারাগারের পটভূমিকায় একদিকে কংসহন্তার আবির্ভাব, এবং আর একদিকে কংসের বিচিত্র মনোদ্বন্দ্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি যে পুরাপুরি সফল হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিকতার স্বাদ পাল্টাইয়া মন্মথ রায় দর্শক ও পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২—) পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক ('গৈরিক পতাকা,—১৯৩০, 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'ধাত্রীপান্না', 'রাষ্ট্রবিপ্লব') এবং সামাজিক নাটক ('স্বামী স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি' 'নার্সিং হোম' প্রভৃতি) এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইতিহাসের মধ্যে প্রবল স্বাদেশিকতার সুর আমদানি করিয়া তিনি কোন কোন ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব নষ্ট করিয়াছেন। সংলাপ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা বহুস্থলে 'কালানৌচিত্য' দোষদুষ্ট (anachronsim) হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক এবং উগ্র আধুনিক সমাজসমস্যা তাঁহার সামাজিক নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই সমস্ত নাটকে আসলে ব্যক্তির সমস্যাই প্রকট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য 'মাটির ঘর,' 'মেঘমুক্তি', 'বিশ বছর আগে' প্রভৃতি সমাজ-পরিবেশের নাটক রচনা করিয়া বর্তমান যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সাধারণ দর্শকে যাহা চায়, গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে তাহাই পরিবেশন করিয়া বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন; বিধায়ক ভট্টাচার্যও সামাজিক ও পারিবারিক নাটকে ঠিক সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সুলভ রোমান্স, করুণরসের আতিশয্য, বাগ্‌ভঙ্গিমার চমকপ্রদ ও অভাবনীয় বৈচিত্র্য তাঁহার নাটকগুলিকে ইদানীং বেশ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আর একটু সংযত হইলে এবং রোমাণ্টিক অতিরেক বর্জন করিতে পারিলে বাংলা নাটকের নূতন পথ দেখাইতে পারিতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

বর্তমানকালে আরও অনেকে নাটক লিখিতেছেন বটে, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতি নিবদ্ধ। আধুনিক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের কলাকৌশলসমূহকে চোখের সামনে রাখিয়া ইঁহারা নাটক রচনা করিতেছেন। ফলে কলিকাতার বাহিরে খোলামাঠে এই সমস্ত নাটকের অভিনয় দুরূহ হইয়া পড়ে। উপরন্তু ইহার নাট্যলক্ষণ অল্প, সাহিত্যলক্ষণ আরও অল্প। তাই ইঁহাদের সম্বন্ধে সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে তিনজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য—'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), প্র. না. বি. (প্রমথনাথ বিশী) এবং মনোজ বসু। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৮) এবং 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১) শ্রেষ্ঠ জীবনীনাটক। আমাদের হতভাগ্য দেশে নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে বহু রজনী ধরিয়া অভিনীত হয়, কিন্তু 'বনফুলে'র এই উৎকৃষ্ট নাটক দুইটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইল না। এইরূপ উৎকৃষ্ট 'জীবনীনাট্য বাংলা সাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় সুরসিক ও সুপণ্ডিত হইলেও মাঝে মাঝে তাঁহার উপরে জি. বি. এস্.-এর প্রেতাত্মা ভর করে। তখন তিনি প্র. না. বি. হইয়া তীক্ষ্ণ ভাষায়, তীব্র ব্যঙ্গের খোঁচায় বাঙালীর স্থূল চর্মখানাকে ক্ষতবিক্ষত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার 'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩০), 'মৌচাকে ঢিল'

(১৯৩৮) ইত্যাদি ব্যঙ্গরঙ্গ নাটক অকালপ্রবীণ বাঙালীর মুখে বক্র হাসি ফুটাইয়াছে, চোখের জলে সিক্ত বাংলার নাটমঞ্চে প্রখর হাস্যের শুষ্কতা আনিয়া দিয়াছে। অবশ্য তাঁহার ব্যঙ্গের ঝাঁজ প্রায় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলে না বলিয়া সব সময় এই সমস্ত নাটকাভিনয় খুব নিরাপদ নহে।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু প্রধানতঃ কথাকার, তবু তাঁহার 'প্লাবন' (১৩৪৮), 'নূতন প্রভাত' (১৩৫০), 'রাখীবন্ধন' (১৩৫৬) প্রভৃতি নাটকে কিছু নূতন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। 'প্লাবনে' রমণীর হৃদয়দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটিয়াছে। 'নূতন প্রভাত' ও 'রাখীবন্ধন' বহু সখের দল অভিনয় করিয়াছেন। দেশপ্রেম, অবহেলিত মানুষের প্রতি মমতা প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ মনোজ বসুর মানববাদী চিত্তকেই প্রাধান্য দিয়াছে। অবশ্য স্থানে স্থানে নাট্যকলাগত যৎসামান্য ত্রুটি আছে, কাহিনীও কোথাও কোথাও আবেগ-অতিরেকের ফলে একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তবু বলিষ্ঠ আশাবাদ তাঁহার স্বল্পসংখ্যক নাটককে জীবনের উদ্দাম গতি দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়া অভিনয়যোগ্য নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) কয়েকটি লঘুতর 'মেলোড্রোমা' এখনও দর্শকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রচিত্রণ এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে যে কী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা উপন্যাসের মর্মজ্ঞগণ অবগত আছেন। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিপুল আবেগ এবং বৃহৎ মানব-আদর্শের এরূপ সমন্বয় ইদানীং বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, উপন্যাস রচনা করিতে গেলে কল্পনার যে বাস্তবতা ও নিঃস্পৃহতা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশুদ্ধ গীতিকবির পক্ষে তাহা বজায় রাখা অনেক সময় কণ্টকর হইয়া পড়ে। তাই নাটকের মতো উপন্যাসেও কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভাবকল্পনার প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে। অথচ তদানীন্তন সমাজ-জীবন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি অস্বীকার করেন নাই; বরং 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে' একটু বেশি পরিমাণে বাস্তব পটভূমিকা স্বীকৃত হইয়াছে। তবু তাঁহার উপন্যাস সাধারণ পাঠকের মন হরণ করিতে পারে নাই। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র ও ঘটনাকে কেমন যেন দূরের যাত্রী বলিয়া মনে হয়। তাই তাঁহার জীবিতকালে উপন্যাসে দুইজন লেখক পাঠকসমাজের প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার শিষ্যকল্প ব্যক্তি। আমরা প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত ও সাহিত্য-দর্শের কিঞ্চিৎ বিরোধিতা করিলেও তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াই বরণ করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটগল্প যে একটা নিখুঁত শিল্পবস্তু হইয়াছে,

তাহাও নহে। তবু তাঁহারা, বিশেষতঃ শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রযুগে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, একদল পাঠক ও ভক্ত তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র যে মানুষগুলিকে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের ব্যক্তিসত্তা লেখকের আরোপিত তত্ত্বাদর্শের চাপে রূপান্তর গ্রহণ করে নাই; সর্বোপরি কাহিনীর হৃদ্যতা, পরিচিত চরিত্রগুলির সহানুভূতিপূর্ণ বেদনামাধুরী ও কৌতুকরসের চিত্রায়ণ লেখককে পাঠকের নিবিড় সাহচর্য দান করিয়াছে। এই যুগের প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—বাংলা উপন্যাসের দুই দীপ্ত তারকার মধ্যে অবস্থান করিয়াও শুধু প্রসন্ন উদারতা ও রমণীয় রচনার গুণে প্রভাতকুমার স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকিরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, তখন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাংলার রসিকমহলে অতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছে, বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। সর্বোপরি শরৎচন্দ্র সুদূর প্রবাস হইতে কলিকাতায় আসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উপন্যাস লিখিলেন এবং বাংলার সাহিত্যসমাজে প্রবল আলোড়ন তুলিলেন। এইরূপ পরিবেশ সত্ত্বেও অসংখ্য গল্প ও কয়েকখানা মোটা মোটা উপন্যাস লিখিয়া প্রভাতকুমার পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করেন; সুতরাং তাঁহার প্রতিভার যে একটা সার্বজনীন আবেদন ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রভাতকুমার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু গদ্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যই যে তাঁহার প্রধান বিচরণক্ষেত্র, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বপ্রথম দেখাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং উপদেশে প্রভাতকুমার গল্প উপন্যাস রচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার ছোটগল্পের কথা একটু পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে সংক্ষেপে উপন্যাস সম্বন্ধে দুই-চারিকথা বলা যাক।

প্রভাতকুমারের মোট-উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দ।[৭] তন্মধ্যে 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'সিন্দুরকৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যাস একদা বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রভাতকুমারের

---

৭. উপন্যাসের তালিকা:—রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিন্দুরকৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), আরতি (১৯২৪), সত্যবালা (১৯২৫), সুখের মিলন (১৯২৭), সতীর পতি (১৯২৮), প্রতিমা (১৯২৩), গরীব স্বামী (১৯৩৮), নবদুর্গা (১৯৩৮), বিদায়বাণী (১৯৩৩)

উপন্যাসে পল্লীজীবন, নাগরিক জীবন, একান্নবর্তী পরিবার, বিরহমিলনের স্নিগ্ধমধুর বর্ণনা, বাৎসল্যরস এবং জীবনসম্বন্ধে লেখকের প্রসন্ন মাধুর্য সে যুগের পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগত ঠাসবুনানি ও রোমাণ্টিক কল্পনার দিগন্ত-প্রসারী চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের আত্মস্থ উপলব্ধির অতল অপার রহস্য, মানবজীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রের তীব্র সহানুভূতি—এ সমস্ত প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ততটা পাওয়া যাইবে না। জীবন সম্বন্ধে কোন উৎকট প্রশ্ন ও সমাজ সম্বন্ধে কোন বিতর্কসঙ্কুল সমস্যা তাঁহার চিত্তে ঠাঁই পায় নাই। তিনি যেন উপন্যাসগুলিতে কতকগুলি হাল্কা ধরনের রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন ; তাহাতে চিত্রশিল্পীর বর্ণবিলাস যেমন স্বল্প, তেমনি আলোকচিত্রের আলো-আঁধারের লীলাও খুব গাঢ় নহে। তিনি বাস্তব বাংলাদেশকে অবলম্বন করিয়া একটা প্রেমপ্রীতির জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন,—যেখানে যে-কোন ঘটনাই অবলীলাক্রমে ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিমা এমন স্বচ্ছ ও বেগবান যে পাঠক এই সমস্ত ত্রুটিসম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ পায় না। এক নিঃশ্বাসে উপন্যাস শেষ করিবার পর হয়ত সে পঠিত গ্রন্থের গুণাগুণ ভাবিতে বসে। যাহাতে তত্ত্ব নাই, তর্ক নাই, বিরহের হাহাকার নাই, মিলনের উল্লাস নাই, বিরাট আদর্শ নাই, ঘৃণ্য নীচতাও নাই,—এমন কাহিনী সাধারণ পাঠকের কাছে চিরকালই প্রীতিপদ হয়। সেইজন্য প্রভাতকুমারের উপন্যাস উচ্চশ্রেণীর না হইলেও সুখপাঠ্য বলিয়া সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের উপদেশেই গল্প-উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার উপন্যাসের গুণাগুণ যেরূপ হউক না কেন, তাঁহার ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সৃষ্টি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কেহ কেহ তাঁহাকে বাংলার 'মোপাসাঁ' বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পলেখক গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩) ও প্রভাতকুমারের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। মোপাসাঁর রচনাভঙ্গীর তীব্র, তীক্ষ্ন, তির্যকতা এবং অসঙ্কোচ-প্রকাশের দুর্নিবার সাহস প্রভাতকুমারের নাই। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মোপাসাঁর দার্শনিক প্রত্যয় ও জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিও প্রভাতকুমারের কৌতূহল নাই। তাঁহার সরসভঙ্গীতে বিবৃত হাল্কা গল্পকাহিনীর সঙ্গে মোপাসাঁর বাস্তবধর্মী উৎকৃষ্ট গল্পের সাদৃশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, শতাধিক[৮] গল্প লিখিয়া প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ গল্পকারের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই পালন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গহনার বাক্স' (১৯২১) প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন এক যুগের পাঠকের সুপরিচিত ছিল। প্রভাতকুমারের গল্পের মূল সুর তিনটি—বাঙালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি, শিক্ষিত যুবসমাজের বিড়ম্বনা এবং জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রীতিমধুর সম্পর্ক। তরল কৌতুকরস তাঁহার গল্পগুলিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতি,

৮ প্রভাতকুমারের গল্পসঙ্কলনগুলিতে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা—১১৪।

অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অবশ্য প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে আশা করা যায় না ; কিন্তু পরিমিত ক্ষেত্রে তাঁহার গল্পগুলি পরম উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ॥

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না, রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাস লইয়া সাধারণ পাঠক সন্তুষ্ট ছিল। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলপনা' (১৯১০), 'ঝাঁপি' (১৯১২), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শেফালী' (১৯১০), 'নির্ঝর' (১৯১১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ বা অনুদিত উপন্যাস ('মাতৃঋণ', 'বন্দী', 'অসাধারণ'), চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসঙ্কলন 'বরণডালা' (১৯১০), 'পুষ্পপাত্র' (১৯১০), 'সওগাত' (১৯৩১), 'ধূপ ছায়া' (১৯১২), উপন্যাস—'আগুনের ফুলকি' (১৩২১), 'পরগাছা' (১৯১৭), 'দুই তারা' (১৯১৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পসরা' (১৩২২), 'মধুপর্ক' (১৩২৪), প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন, রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাস, ('পাষাণের কথা', 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল') জলধর সেনের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের পাঁচালী—ইত্যাদি মধ্যমশ্রেণীর গল্প-উপন্যাস লইয়া সাধারণ পাঠক বেশ নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতেছিলেন। যাঁহারা উচ্চমার্গের অধিকারী ছিলেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মুগ্ধ হইতেন ; আর যাঁহারা শুধু গল্পরসের জন্যই গল্পকাহিনী পড়িতেন, তাঁহারা পূর্বোল্লিখিত গল্পকাহিনী পাঠ করিয়া একপ্রকার অলস শিথিল রোমাণ্টিক কাহিনীর মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। কেহ বা মহিলা-ঔপন্যাসিকদের স্নিগ্ধ ঘরোয়া গল্প অথবা পুরুষালি লেখার মধ্যেও আনন্দ পাইতেন। অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮) 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১), 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫), 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) প্রভৃতি গুরুগম্ভীর উপন্যাস পাঠকসমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইঁহার সহোদরা ইন্দিরা দেবীর (১৮৭৯-১৯২২) 'নির্মাল্য' (১৯১৫), 'কেতকী' (১৯১৫), 'ফুলের তোড়া' (১৯১৮), 'স্পর্শমণি' (১৩২৪-২৫) প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসের স্নিগ্ধমাধুর্য ও পাঠকসমাজের মন হরণ করিয়াছিল। নিরুপমা দেবীর (১৮৮৩-১৯৫১) 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১৭), 'শ্যামলী' (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাস আবেগপ্রবণ পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সহসা কি একটি ঘটিয়া গেল। নামধামহীন দরিদ্রের সন্তান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্মা মুলুক হইতে কলিকাতায় পদক্ষেপ করিয়াই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলিলেন। তখনও শীর্ষদেশে মাধ্যন্দিন রবি জাজ্বল্যমান, প্রভাতকুমার রচিত হাসি-অশ্রুমাখা জীবনচিত্রগুলিও মলিন হইয়া যায় নাই।

বাংলা ১৩১৯-২০ সনে 'যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের গুটিকয়েক গল্প প্রকাশিত হইল। কে জানিত, ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পের অখ্যাত লেখক পরবর্তী কালে রবির কিরণকেও ম্লান করিয়া দিবেন ? ১৯০৭ সালে 'ভারতী'

পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামক একটি বড় গল্প বাহির হইলে লোকে চমকিয়া উঠিল। এযে নূতন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র, বক্তব্যবিষয় প্রতিদিনের ম্লান বিবর্ণতা হইতে সংগৃহীত; অথচ এত অভূতপূর্ব বিচিত্র বলিয়া মনে হইতেছে কেন? কিন্তু গল্পকারের নাম ছাপা হয় নাই। সুতরাং মুগ্ধ পাঠক মনে করিল, রবীন্দ্রনাথই নাম গোপন করিয়া লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিলেন—ইহা তাঁহার রচনা নহে। কিন্তু গল্পটি যে একজন অসাধারণ লেখকের রচনা, তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার ভক্ত-গোষ্ঠীও বুঝিল। পরে ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল, শরৎচন্দ্র মেঘনির্মুক্ত সাহিত্যাকাশে সূর্যের পাশেই স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার জীবিতকালের শেষ উপন্যাস, বিপ্রদাস, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। মোট আটাশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্প-সঙ্কলন বাহির হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় দুইখানি উপন্যাস—'শুভদা' (১৯৩৮) এবং 'শেষের পরিচয়'[৯] (১৯৩৯) এবং একখানি গল্পসংগ্রহ ('ছেলেবেলার গল্প'—১৯৩৮)। ইহা ছাড়া নিজ উপন্যাসের নাট্যরূপ ('ষোড়শী'—১৯২৭, 'রমা'—১৯২৮, 'বিরাজ বৌ'—১৯৩৪, 'বিজয়া'—১৯৩৪) এবং কিছু কিছু প্রবন্ধ জাতীয় রচনা ('নারীর মূল্য'[১০]—১৯৩০, 'তরুণের বিদ্রোহ'—১৯২৯, 'স্বদেশ ও সাহিত্য'—১৯৩২ এবং কিছু বক্তৃতার সঙ্কলন[১১]) প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র তিরিশ বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যে এত-গুলি উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ রচনা শরৎচন্দ্রের অপরিসীম মানসিক শক্তি প্রমাণিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনকথা অনেকটা রহস্যাবৃত; তবু এখন এই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। বাঁধাপথের লেখাপড়ায় বেশি দূর অগ্রসর না হইয়াও তিনি আধুনিক জীবনের সমস্ত সংবাদই রাখিতেন। ভাবা-বেগের উচ্ছ্বাসে ভাসমান হইয়াও তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনের পরম ভক্ত হইয়া-ছিলেন। বৈষ্ণবীয় প্রেমরসে ডুবিয়া গিয়া এবং তন্ত্রাশ্রিত বীরাচারী সাধকপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র আমাদের কাছের মানুষ হইয়াও যেন কত দূরে সরিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সমালোচকদের মতে তাঁহার উপন্যাসের প্লটগঠন প্রশংসনীয় নহে, চরিত্রের আচার-আচরণেও সর্বদা সঙ্গতি ও পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, জীবন-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁহার কোন বৃহৎ দার্শনিক বোধ নাই, রচনারীতি যে নির্দোষ তাহাও নহে। টেকনিক বা আঙ্গিক বিচার করিলে তাঁহার গল্পগুলিতে অনেক ত্রুটি বাহির হইয়া পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, মানুষগুলির মধ্যেই-বা এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য আছে? না আছে রোমান্টিক উজ্জ্বলতা, আর না আছে আধুনিক মানুষের

৯. ইহা অসমাপ্ত রাখিয়া শরৎচন্দ্র লোকান্তরিত হন। পরে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ইহার বাকী অংশটুকু সম্পূর্ণ করেন।

১০. ইহা তাঁহার দিদি অনিলা দেবীর নামে প্রকাশিত হয়।

১১. ইহা ১৩৪৪ সালে "শরৎচন্দ্র ও ছাত্র সমাজ" নামে প্রকাশিত হয়

হাতিয়ারবদ্ধ জীবনসংগ্রামের রক্তাক্ত চিত্র। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্লীহা-ক্লিষ্ট কয়েকটি নরনারীর বিবর্ণ কাহিনী—ইহাই তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। সমালোচকদের এইসব মন্তব্য সত্য মিথ্যা—যাহাই হউক না কেন, এই চেনা মানুষগুলি এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণে টানিয়া রাখে কেন? এত বারবার পড়িয়াও পাঠকের তৃপ্তি হয় না কেন? আমাদের মনে হয়, তাঁহার আখ্যানে গ্রন্থনশিল্পের দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে, পরিচিত জীবনের আবেগ-তপ্ত কাহিনী এমন সহৃদয়তার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহাতে গল্পরস জমাইবার এমন দুর্লভ ক্ষমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এই কাহিনীগুলিতে অনেকটা ডিটেকটিভ গল্পের মতো আকর্ষণ জমিয়া ওঠে। আঙ্গিকের কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও গল্প জমাইবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের আখ্যানেও ততটা পাওয়া যায় না। অবশ্য শুধু বাস্তব জীবনের কাহিনী হইলেও তিনি এতটা জনপ্রিয় হইতে পারিতেন না। তাঁহার বহু পূর্বে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) 'স্বর্ণলতা'য় (১২৮১) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসার' (১২৮২) ও 'সমাজে' (১৮৯৪) বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম রোমান্সের বিস্ময়বোধ না থাকিলে শরৎচন্দ্র কিছুতেই অবলীলাক্রমে পাঠক-মন জয় করিতে পারিতেন না। বাস্তব জীবনের নিরাবরণ রূপটি জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কোন কোন গল্পে নির্মমভাবে ফুটিয়া উঠিলেও তাহার কাহিনী পাঠকের মনকে এমনভাবে টানিয়া লইয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র আদৌ বাস্তবধর্মী লেখক নহেন। প্রতিদিনের সঙ্গে দিনাতীতের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষের, বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের এমন বিস্ময়কর মিল ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সাধারণ কাহিনীও আমাদিগকে এত আকৃষ্ট করে। যেখানে তিনি ঘোরালো কাহিনীর প্যাঁচ কষিয়াছেন, সেখানে তাহা দুর্বল হইয়াছে; যেমন—'পথের দাবি', 'শেষ প্রশ্ন', 'বিপ্রদাস'।

শরৎচন্দ্র যে মানুষগুলিকে আঁকিয়াছেন তাহাদের চারিদিকে কিছুমাত্র বিস্ময়কর জ্যোতির রেখা নাই। তাহারা যেমন প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল নহে, তেমনি আবার গোরা, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, অতীন্দ্রও নহে। পুরুষ চরিত্রগুলি অধিকাংশ স্থলে কর্মভীরু, উদাসীন, নিরাসক্ত। নারীচরিত্রগুলি সেবাময়ী, ত্যাগব্রতী; দুঃখদহনে পুড়িয়া পুড়িয়া ভাস্বতী রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষের মধ্যে কেহ মদ্যপ, কেহ চরিত্রহীন, কেহ ভবঘুরে, কেহ গাঁজাখোর, কেহ-বা স্ত্রীলোকের অন্তঃস্থ পোষ্য-বিশেষ। নারীচরিত্রের মধ্যে কেহ একান্নবর্তী সংসারের দশের বোঝা বহিয়া যায়, কেহ রোখের মাথায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসে, এবং তাহার পর সারাজীবন চোখের জল ফেলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে। কেহ স্বৈরিণী, কেহ মেসের সামান্য দাসী। অকস্মাৎ কোথা হইতে কি হইয়া যায়। ভবঘুরে, দরিদ্র, বিবর্ণ পুরুষগুলি হঠাৎ ভস্মশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়; মধ্যবিত্ত বাঙালীঘরের মাতা-বধূ-

কন্যার মলিন রূক্ষ তনুটি যেন অগ্নিস্নান করিয়া নব কলেবর লইয়া বাহিরে আসে। তখন মনে হয়, ইহারা তো প্রতিদিনের তুচ্ছ পথযাত্রী নহে। মহাকাব্যের বিশালতা, রোমান্সের সূক্ষ্ম লাবণ্য এবং ট্রাজেডির ধীরমন্থর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পরিচিত ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অকস্মাৎ অপরিচয়ের দমকা হাওয়া উড়াইয়া দেয়।

শরৎচন্দ্র দৈনন্দিন মানুষের বুকে চিরকালীন মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন শুনিয়াছেন। সাংখ্যের নিরাসক্ত পুরুষ ও সিসৃক্ষু প্রকৃতি এবং তন্ত্রের পার্বতী-পরমেশ্বর যেন ভস্ম মাখিয়া নববেশে আবির্ভূত হন; শরৎচন্দ্র আইডিয়ালিস্ট, রোমান্টিক, তান্ত্রিক। ঔপন্যাসিকের বিচক্ষণ বাস্তব দৃষ্টি, কবির ভাবদৃষ্টি এবং নাট্যকারের দূরসন্ধানী ইঙ্গিত শরৎ-সাহিত্যে একসূত্রে মিলিত হইয়াছে।

তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস বিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকের সাধারণ বাঙালী পরিবারের চিত্র অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৭), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৫), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭)—এই সমস্ত বাংলাদেশের অতিপরিচিত ঘটনা। কেবল 'পল্লীসমাজে'র রোমান্সটুকু একটু অভিনব মনে হইতে পারে। নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনী ফাঁদিবার অপরাধে যতীন্দ্রমোহন সিংহ[12] প্রভৃতি রুচিবাগীশের দল তাঁহাকে গালি দিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত গল্প-উপন্যাসগুলি আমাদের পরিচিত সমাজ ও পারিবারিক জীবনকে আশ্রয় করিলেও তিনি কাহিনীর সঙ্গে সমান-তালে মানবরসপ্রধান আবেগ পরিবেশন করিয়াছেন। ইছামতী নদীর মতো এই গল্প-আখ্যান ও চরিত্রগুলি নিরুদ্বেগে বহিয়া যায়। মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির ফলে ভ্রাতৃবধূ ও দেবরের মধ্যে মন কষাকষি হয়, সৎমা ও সতীন-পুত্রের মধ্যে কলহ ঘনাইয়া আসে, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া ওঠে। তাহার পরে কিছুটা বর্ষণের পর আবার সব হালকা হইয়া যায়। সংসার যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলিতেছিল, সেইরূপেই চলিতে থাকে। বাঙালী পাঠক এই সমস্ত গল্পে নিজের জীবনটাকেই যেন মনের মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। তখন তাহার মনে হয়, "মমেতি ন, মমেতি চ"। এই বিস্ময়রসটুকু আছে বলিয়াই তাহার পাঁচাপাঁচি কাহিনী ও সাধারণ চরিত্র এখনও পর্যন্ত অজস্র পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শরৎচন্দ্রের নিন্দা ও খ্যাতি নির্ভর করিতেছে প্রধানতঃ এই উপন্যাসগুলির উপর: 'বড়দিদি' (১৯১৬), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'শ্রীকান্ত' (১ম-১৯১৭, ২য়-১৯১৮, ৩য়-১৯৩৩, ৪র্থ-১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১০), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ'

১২. যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" (১৯২২) নামক পুস্তিকায় অশুচি প্রেমের চিত্র অঙ্কনের জন্য শরৎচন্দ্রকে সুকঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি আচার্য শিশিরকুমারের 'সীতা' অভিনয়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিয়াছিলেন। কাশীধামে শিশিরকুমার 'সীতা' অভিনয়ে প্রস্তুত হইলে বাংলা সাহিত্যের "সানিটারি ইন্‌সপেকটার" সিংহ মহাশয় সেখানে সেই অভিনয় বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। তাঁহার প্রধান অভিযোগ—'সীতা'য় শিশিরকুমার হিন্দু ঐতিহ্যের সর্বনাশ করিয়াছেন।

(১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)। এই সমস্ত উপন্যাসে তিনি প্রথাসিদ্ধ চারিত্রনীতি, সংযম, সতীত্বকে যেন এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া বাঙালীর বহুকালাশ্রিত নীতিধর্ম ও চরিত্রাদর্শের তলে একটা বিরাট ফাটল সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিলেন—বলা ভুল। অনেক পূর্ব হইতে সে ফাটল সৃষ্টি হইয়াছিল ; সমাজনেতৃগণ মিষ্টবাক্য ও নীতিবচনের মাটি গুলিয়া সে ফাটল ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শরৎচন্দ্র যেন অদৃশ্যপ্রায় ক্ষতচিহ্নে আঙুলের আঘাত দিলেন। বহুপুরুষচারিণী গণিকাকেও তিনি স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দিলেন, মদ্যপ দুষ্ক্রিয়াসক্তকে স্নেহসিঞ্চনে ধন্য করিলেন এবং গলিতপ্রায় সমাজকে সুকঠোর ভর্ৎসনা করিয়া মানুষের বেদনার প্রতি সকলের দৃষ্টি ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সমাজের দুষ্ট ক্ষত দেখাইয়াছেন, ভালোই করিয়াছেন ; কিন্তু আরোগ্যের ঔষধ কোথায় ? সমস্যা সমাধানের পথ কোন্ দিকে ? এই মতে বিশ্বাসী পাঠকগণ শরৎ-সাহিত্যের মূল রস ধরিতে পারেন নাই। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সন্ধান এবং তাহা দূর করিবার উপায় নির্ণয় শরৎচন্দ্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে—বোধহয় কোন সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিকেরই সেইরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। শরৎচন্দ্র সমাজের পীড়নে ক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়বেদনাকে পাঠকের সহানুভূতির সামগ্রী করিতে চাহিয়াছেন। সামান্য অপরাধে বা কল্পিত অপরাধে নরনারীকে সারাজীবন যে গ্লানির বোঝা বহিয়া চলিতে হয়, শরৎচন্দ্র গুরুভারে-ন্যুব্জ সেই মানব-মানবীকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কি করিলে সেই ভার হ্রাস পায়, এবং সেই ভারের স্বরূপ বা কি, তাহার ব্যাখ্যান শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য বহির্ভূত। তিনি মানবজীবনের ব্যথা-বেদনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মানুষের প্রাণের কামনাকে মানুষের প্রাণে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, মানুষের অপরাধের জন্য যেন তিনি বিধাতার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছেন। সমাজের বৈষম্য অনাচার—এ সমস্ত তাঁহার কথাসাহিত্যের পটভূমিকা মাত্র। কিন্তু সে পটভূমিকা এমন জীবন্তভাবে অঙ্কিত যে, অনেক সময়ে চালচিত্রকে প্রতিমা বলিয়া ভুল হয়। তাঁহার চরিত্রগুলির কোনটাই বৃহৎ নহে। তাহারা তাহাদের দুর্বলতা ক্ষীণতা সত্ত্বেও আমাদের বড় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের প্রতি পাঠকের আকর্ষণের কারণ, শরৎচন্দ্র সামান্যের মধ্য দিয়া অসামান্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিচিতের মধ্য দিয়া অপরিচিতের রহস্য ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। অনেকটা হুইটম্যান ও ডস্টয়ভ্স্কির মতো শরৎচন্দ্র মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে আবেদন জানাইয়াছেন, সে আবেদন ততটা রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক নহে, যতটা বিশুদ্ধ মানবিক। এই অসীম সহানুভূতি শরৎচন্দ্রকে যেমন পাঠকের নিকট-প্রিয়জনে পরিণত করিয়াছে, তেমনি তাঁহার এই কাহিনী ও চরিত্রগুলি যেন তাহাদের শূন্য দুই কর পাতিয়া পাঠকের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে। এই দিক দিয়া তিনি বাংলার সমস্ত ঔপন্যাসিককে হারাইয়া দিয়া সাধারণ পাঠকের অন্তরে অক্ষয় মহিমা লাভ করিয়াছেন। অবশ্য বাঙালীর সমাজবন্ধন ও পরিবারের গঠন বদলাইয়া গেলে

শরৎচন্দ্রের মনোরম গল্প-উপন্যাসগুলির আবেদন খানিকটা ম্লান হইয়া যাইবে। কিন্তু সমসাময়িক বাঙালীজীবনের পটভূমিকা বাদ দিলেও তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসে দেশকাল-নিরপেক্ষ মানুষের একটা বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা তাঁহাকে দীর্ঘকাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

অবশ্য শরৎ-প্রতিভার কয়েকটি বিশেষ সীমা আছে, যাহার বাহিরে যাইতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের বহু স্থলে আবেগের অতিরেক গল্পকাহিনীকে কখনও কখনও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছে. কাহিনীগ্রন্থনের শিথিলতা তো আছেই। উপরন্তু যখন তিনি হৃদয় ছাড়িয়া বুদ্ধিজীবী intellectual উপন্যাস রচনায় মাতিয়াছেন, তখন তিনি স্বধর্ম ছাড়িয়া ভয়াবহ 'পরধর্ম' আশ্রয় করিয়া নিজ শিল্পাদর্শ ও সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়াছেন। যখন তাঁহার আবেগ যুক্তি মানে নাই, তখন ভরাডুবি হইয়াছে। 'পথের দাবি'তে উগ্র ইংরাজবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই জমিতে পারে নাই—না কাহিনীতে, না চরিত্রে। 'শেষ প্রশ্ন' খুবই তীক্ষ্ম, শরৎচন্দ্রের এক-প্রকার আশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসটিতে বুদ্ধির চমক দিতে গিয়া লেখক চরিত্র-সৃষ্টির স্থলে গ্রামোফোনের রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। চমকপ্রদ যুক্তিতর্ক একতরফা হইয়াছে। কাহিনী, চরিত্র সবই যেন যুধিষ্ঠিরের রথ—মাটি ছুঁইয়া চলে না। 'বিপ্রদাস' আরও দুর্বল, আরও নিকৃষ্ট রচনা। ইহার কাহিনী ও চরিত্র—কোনোটিতেই পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। বন্দনা-বিপ্রদাস-দ্বিজদাসের ত্রিভুজ সময়ে সময়ে হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। বোধহয় সব দিক বিচার করিলে 'গৃহদাহ'ই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এরূপ নির্মম, বিষণ্ন, নিরাভরণ জীবন-ট্রাজেডি বাংলা সাহিত্যে আর একখানিও নাই। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসেই টমাস হার্ডির সঙ্গে একাসনে বসিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। মানুষের আদিম আবেগের তীব্রতা, নারীর নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও দাহ এবং গ্রীক নাটকের *Nemesis*-এর মতো নিয়তির নিঃশব্দ পদসঞ্চার অচলা-মহিম-সুরেশকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়াছে। অথচ বাহ্যতঃ মানুষের আচরণই তাহাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শিল্পকুশলতা এই উপন্যাসে রচনাগত বিশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের অভাব অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছে। নবীন পাঠক হয়তো সাম্প্রতিক উপন্যাসে অধিকতর বিস্ময় বোধ করিবেন, বিদগ্ধ পাঠক হয়তো ফরাসী ও মার্কিন মুল্লুকের অদ্ভুত উদ্ভট গল্পকাহিনী পড়িয়া রসবোধ চরিতার্থ করিবেন, এমন কি বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ ইতিহাসকার[১৩]

১৩. কোন কোন সমালোচক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন। যেমন—বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র সাদৃশ্য, 'দেবদাসে'র আদর্শ—'রজনী'; 'পল্লীসমাজে'র বাল্যপ্রেমের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের এবং 'চন্দ্রনাথে'র সঙ্গে 'ইন্দিরা'র সাদৃশ্য, 'গৃহদাহে' গোরা'র আভাস; সবচেয়ে কৌতুককর ব্যাপার—কোন এক সমালোচকের কাছে 'গৃহদাহে'র সুরেশ পাগলে পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি মনে করেন,—"সুরেশ সাধু নয়, পাষণ্ড নয়—হয়তো সে পাগল!……কিরণময়ী পাগল হইয়াছিল শেষে, সুরেশ প্রথম হইতেই।" বলাই বাহুল্য, এসব মন্তব্য বিবেচনার অযোগ্য।

অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিবেন, "তিনি ট্রাজেডির ধার দিয়াও যান নাই"। তবু বাঙালী পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘকাল নিকট-আত্মীয়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে ঘেরিয়া রাখিবে।

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক উপন্যাস ॥

উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিকের যেন বান ডাকিল। অন্ততঃ ষোলজন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার শরৎচন্দ্রের সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কাল—প্রায় বিশ বছর ধরিয়া যাঁহারা উপন্যাসে নব নব দিগন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অদ্যাপি যাঁহাদের অনেকের লেখনী বিরাম গ্রহণ করে নাই, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে : প্রমথ চৌধুরী, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), অন্নদাশঙ্কর রায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে আরও অসংখ্য কথাকার সাময়িকপত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কেহ-বা সাময়িকপত্রেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। এখানে আমরা শুধু সেই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলাম, যাঁহারা পরবর্তী কালে উপন্যাসে স্মরণীয় হইয়াছেন এবং প্রতিভার পরিচয় রাখিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী'-গোষ্ঠী এবং দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল'-গোষ্ঠী বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সাহিত্যসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সবুজপত্র-গোষ্ঠীর লেখকগণ প্রধানতঃ ছিলেন বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক। কথাসাহিত্য তাঁহাদের প্রধান এক্তিয়ার নহে। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অনেকেই কবি ও ঔপন্যাসিক। তবে রবীন্দ্রভারতীর পাদপীঠেই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর আবির্ভাব। মৌলিক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী বলিতে যাহা বুঝায়, 'ভারতী'র সভ্যগণ তাহার বিশেষ অধিকারী ছিলেন না—অন্ততঃ উপন্যাসের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের ছায়াতলে বসিয়া চিরাচরিত প্রেম-রোমান্স, আর না হয় পল্লী-বাংলা বা শহর-কলিকাতার রূপকথা রচনা—'ভারতী'-গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে 'ভারতী'র আসরে অবতীর্ণ হইতেন বটে, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে তাঁহার বড়ো একটা আসক্তির যোগ ছিল না। 'কল্লোল'-গোষ্ঠী 'কল্লোল' পত্রিকার সাহায্যে উপন্যাসে নূতন মতবাদ, কাহিনী ও চরিত্রে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়া বাংলা সাহিত্যকে শরৎচন্দ্রের কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র সমাজ ও নীতি সম্বন্ধে অনেক জটিল প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। অনেক মর্মগ্রাহী বাস্তবচিত্র অঙ্কন করিলেও তাঁহার দৃষ্টি রোমান্সের মায়াঞ্জন মাখিয়া বাস্তবক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার যুগেই একদল সাহিত্যিক কথাসাহিত্যে নূতনের অবতারণার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল (১৯১৮), মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইল (১৯২০), যুদ্ধান্তে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা এবং শিক্ষিত যুবসমাজে বেকার সমস্যা উৎকট আকারে দেখা দিল (১৯৩০ সালের কিছু পূর্ব হইতে)। মহাত্মাজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সত্ত্বেও বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পুরাদমে চলিতে লাগিল; রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অনেক কর্মনীতি অনুমোদন করিলেন না; সাম্যবাদী মত ও দর্শন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। জওহরলাল নেহেরু তখন বিদেশ হইতে ফিরিয়া মৃদুমন্দস্বরে সমাজতান্ত্রিক হুঙ্কার দিতেছেন এবং রাজনৈতিক 'এল-ডোরাডো'র স্বপ্ন দেখিতেছেন; আপসে-অনিচ্ছুক যুবসমাজ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নূতন কিছু করিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' লইয়া কংগ্রেস "না-গ্রহণ না-বর্জন" নীতি নামক 'দিল্লীকা লাড্ডু' মহানন্দে চর্বণ করিতেছে এবং সকলকে ধোঁকা দিতেছে। শাসক ইংরাজের হিন্দুসমাজের মধ্যেই ফাটল ধরাইবার অপচেষ্টা দেখিয়া বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা টাউন হলে ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রবাণী ঘোষণা করিলেন। মহাত্মাজীর অনশনে দারুণ সর্বনাশ কিয়দংশে স্থগিত রহিল বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিষে দেশের বাতাস দূষিত হইয়া পড়িল। এই বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক পটভূমিকায় উল্লিখিত নবীন ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব হইল।

গোষ্ঠিপতি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) মূলতঃ মননশীল প্রাবন্ধিক; যুক্তি তাঁহার একমাত্র অস্ত্র। চুলচেরা বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং সংস্কারহীন মতামত তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনিও কয়েকটি গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার 'চার ইয়ারি কথা' (১৯১৬) এবং আরও দু'একটি গল্প (যেমন—'আহুতি') শক্তির পরিচায়ক এবং তীক্ষ্ণতায় অতিশয় উজ্জ্বল। কিন্তু প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ-রীতি প্রধান হওয়ায় গল্পগুলি মনের গভীরে খুব একটা গভীর রেখাপাত করিতে পারে না। মনে হয়, লেখক যেন লীলাচ্ছলে গল্প লিখিবার সাধ মিটাইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমকালে যাঁহারা উপন্যাসে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল বিশুদ্ধ রোমান্স-লোকবাসী হইলেন, এবং আর একদল দৈনন্দিন জীবনের, বিশেষতঃ অবহেলিত মানুষের মলিন, বেদনা-দায়ক চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করিলেন। মণীন্দ্রলাল বসু বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর দ্বারা নাগরিক জীবনের উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীকে ঘেরিয়া স্বপ্নলোক রচনা করিলেন—'রমলা' (১৩৩০), 'সহযাত্রিণী' (১৯৪১)। তাঁহার কয়েকটি গল্পসংকলনেও এই রোমান্স ও অতিলৌকিকতা লক্ষ্য করা যাইবে। ('রক্তকমল'—১৯২৪, 'কল্পলতা'—১৯৩৫)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪-৭৬) 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁহার 'বেদে' (১৩৩৫) উপন্যাসে প্রথম প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া যায়। ভাষাভঙ্গিমায় রোমান্টিক উল্লাস, কখনও বা তীক্ষ্ণ বাগ্-ভঙ্গিমার নিরঙ্কুশ ব্যবহার এবং তাহার সঙ্গে কদাচিৎ বে-আব্রু দেহসম্পর্কের ব্রীড়াহীন প্রকাশ তাঁহার উপন্যাসকে একদা তরুণ সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'

(১৯৩১) অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হইলে তিনি প্রায় রাতারাতি খ্যাতিমান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার উপন্যাসকে ততটা প্রাণবান করিতে পারে নাই, যতটা গল্পগুলিকে অভিনব বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। রচনাশক্তির অসাধারণ অধিকারী হইয়াও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে শুধু চটকদারী চমক সৃষ্টি তাঁহার প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতকথা অবলম্বনে একপ্রকার সুলভ রোমান্টিক ভাগবতকথা রচনা করিয়া ভক্ত পাঠকের মন লুঠ করিয়া লইয়াছেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যিনি এতদিন ধরিয়া স্থূলজীবন ও আদিরসের গল্প লিখিয়াছেন, তিনি এইবার দিব্য জীবনের জ্যোতির্ময়-লোকের সন্ধান পাইয়াছেন। মানুষের জীবনের এরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসে মনে হইতেছে—'ভবী ভুলিবার নহে'। একদা তিনি কিছু কিছু উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিয়াছেন ; দুঃখের বিষয়, তিনি কথাসাহিত্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সে পথ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৯-১৯৮০) সম্বন্ধে দুই-এক কথা জানিয়া রাখা ভালো। বিচিত্র প্রতিভাধর 'বনফুল' বৃত্তিতে চিকিৎসক, কিন্তু রসসৃষ্টিতে বিশুদ্ধ শিল্পী। রঙ্গকবিতা, জীবননাট্য, ছোটগল্প, প্রহসন, বড় উপন্যাস—সর্ববিষয়ে অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অজস্রতা তাঁহার শিল্পীপ্রতিভার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর সেই অজস্রতার সঙ্গেই রহিয়াছে বৈচিত্র্য ও নির্মিতি-কৌশল। তাঁহার 'কিছুক্ষণ' শীর্ষক ছোটগল্পসংগ্রহ, 'স্থাবর' ও 'জঙ্গম'-শীর্ষক এপিকধর্মী উপন্যাস, আদর্শ ডাক্তারের মনোভাব হইতে লেখা 'তৃণখণ্ড' ও 'হাটেবাজারে', অন্যান্য বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে রচিত নানা উপন্যাস ('মৃগয়া,' 'বৈতরণীর তীরে', 'নির্মোক', 'রাত্রি' প্রভৃতি) বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে বিশেষ গৌরব দিয়াছে।

কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া অথচ রোমান্সের তরল ভাবালুতা আশ্রয় করিয়া ছোট-বড় অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সাড়া' (১৮৩০) একদা সত্যই সাড়া তুলিয়াছিল। 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৩৪০), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১), 'তিথিডোর, (১৩৪৯), 'কালো হাওয়া' (১৯৪২), 'মৌলিনাথ' (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাস নবীন পাঠক সমাজে সুপরিচিত। কৃত্রিম রোমান্টিক জীবন ও ড্রয়িংরুমের আলাপচারিতা, 'মর্বিড' বিষণ্নতা, এবং লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিকতা তাঁহার উপন্যাসগুলির বাস্তবধর্ম অনেক সময় নষ্ট করিয়া দিলেও কবিতার কলমে উপন্যাস লিখিয়া তিনি একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন—যদিও সে আদর্শ পরে অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার কোন কোন গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে, "বঙ্কিম থেকে আরম্ভ ক'রে মণীন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলাদেশে রোমান্টিসিজ্‌মের ভরা জোয়ার গেলো, এতদিন বোধ হয় রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর দিন এসেছে। এই নতুন দিন যাঁরা আনবেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু একজন।"

এই মন্তব্য যে অযৌক্তিক, তাহা সকলেই বুঝিবেন। রিয়ালিজ্‌ম্‌কে সভয়ে পাশ কাটাইয়া নিজ মনের কল্পনা, স্বপ্ন ও বিকারের ছায়াপটে তিনি কাহিনীর উপস্থাপনা করিয়াছেন। তা' ছাড়া তিনি এত বেশি লিখিয়াছেন যে, যাহা স্বল্প পরিসরে গভীর হইতে পারিত, তাহাই বিস্তৃত ক্ষেত্রে তরল ও অগভীর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কবিপ্রকৃতি, রোমান্সপ্রিয়তা ও প্রতীকদ্যোতনা উপন্যাস ও গল্পকে সার্থক শিল্প হইতে অনেক ক্ষেত্রে বাধা দিয়াছে।

এই যুগের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শৈলজানন্দের (১৯০১-৭৬) একটা বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে হইবে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র নিয়মিত লেখক ও 'কালিকলমে'র অন্যতম সম্পাদক শৈলজানন্দ গল্পে ও উপন্যাসে সম্পূর্ণ নূতন সুর আমদানি করিয়া উপন্যাসকে অসুস্থ রোমান্স্‌ এবং কৃত্রিম সমাজের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা করেন। প্রতিদিনের ম্লান জীবনের বিবর্ণ তুচ্ছ ঘটনা সুখদুঃখ, সাঁওতাল বা ঐ শ্রেণীর মানুষগুলির কালো দেহের অন্তরালে চিরকালীন মানুষের কামনা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি এমন সহৃদয়তার সঙ্গে আঁকিয়াছেন যে, বারবার শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। 'নারীমেধ' (১৩৩৫), 'বধূবরণ' ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে যে তীক্ষ্ন বাস্তবতার পরিচয় রহিয়াছে এবং যাহা মাঝে মাঝে নির্মমতার ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহা একপ্রকার অভিনব বলিতেই হইবে। তবে প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও প্রাণভরা সহানুভূতি সত্ত্বেও জীবন সম্বন্ধে কোন বৃহৎ ব্যাপক বোধের অভাব আছে বলিয়া তাঁহার উপন্যাস একযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলেও এ যুগে তাহার প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। তিনিও শুষ্ক কঠিন, নির্মমতাকে বাস্তবতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবভাগ্য সম্বন্ধে একটা নিদারুণ ব্যর্থতা ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। 'বিনোদিনী' (১৩৩৪) তাঁহার সুপরিচিত গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে অস্বাভাবিক মনোবিকারের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালের উৎকট মনোবিকলন-তত্ত্বাশ্রয়ী গল্পকাহিনীর পথ প্রস্তুত করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও কথাকার। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁহার কবিসত্তা গল্প-উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করে নাই। তাঁহার 'পাঁক' (১৯২৬) এবং 'মিছিল' (১৯৩৩) আধুনিক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে একদা গৃহীত হইয়াছিল। সাধারণ জীবন ও নীচুতলার মানুষের এরূপ নির্ভেজাল বাস্তব চিত্র এবং তাহারই সঙ্গে মানুষের প্রতি একটা উদার মনোভাব তাঁহার কথাশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। ছোটগল্পের রূপ ও রীতি মানিয়া মানব-জীবনের বিষণ্ণ ব্যর্থতাকে এমন নিবিড় করিয়া অংকন করিবার দুরূহ শক্তি খুব অল্প কথাকারের রচনায় লক্ষ্য করা যাইবে। প্রবোধকুমার সান্যাল এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-৭২) অনেক উপন্যাস পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'বনফুলে' মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক বিচিত্র কাহিনীগুলি রচনাচাতুর্যে ও

বয়নকৌশলে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইঁহাদের রচনারীতি প্রশংসার যোগ হইলেও জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধের অভাবের জন্য কোন উপন্যাসই একটা মহৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কুশলী গদ্যশিল্পী। ভ্রমণকাহিনী ও চিন্তামূলক প্রবন্ধে তাঁহার খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি দার্শনিকতার কেন্দ্র হইতে পরস্পর-ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কযুক্ত কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ছয়খানি উপন্যাস ('যার যেথা দেশ'—১৯৩২, 'অজ্ঞাতবাস'—১৯৩৩, 'কলঙ্কবতী'—১৯৩৪, 'দুঃখমোচন'—১৯৩৬, 'মর্ত্যের স্বর্গ'—১৯৪০, 'অপসরণ'—১৯৪২) একত্রে 'সত্যাসত্য' নামে পরিচিত। য়ুরোপের এপিক উপন্যাসের ধাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত দার্শনিক মন বিশাল উপন্যাস রচনা করিতে বাধা দিয়াছে। নানারূপ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মানসিক গূঢ়ৈষণা (complex), এবং বিশুদ্ধ ভাববাদী চেতনার আস্বাদন প্রভৃতি উপন্যাস-বহির্ভূত ব্যাপার গুরুতর হইয়া তাঁহার এপিক উপন্যাসগুলিকে সার্থক শিল্পে পরিণত হইতে দেয় নাই। 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০) ও 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৯) নিতান্তই সাহিত্যিক 'স্টান্ট' মাত্র। এগুলি কোনদিক দিয়াই সার্থক উপন্যাসের কোঠায় উঠিতে পারে নাই। অন্নদাশঙ্কর প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধকার হিসাবে দীর্ঘজীবী হইলেও, ইদানীং তাঁহার প্রবন্ধেরও জৌলস হ্রাস পাইয়াছে। এখনও তিনি কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিতেছেন বটে, কিন্তু সে সরস মন ও শিল্পীর দৃষ্টি হারাইয়া গিয়াছে। দিলীপকুমার রায় ইঙ্গবঙ্গ সমাজচিত্র এবং বিলাতপ্রবাসী বাঙালী চরিত্র অবলম্বনে কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া বাংলা উপন্যাসের সীমা বাড়াইয়া দিয়াছেন।

আমরা শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন ঔপন্যাসিকের কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আরও তিনজন কথাশিল্পীর কথা এখনও বলা হয় নাই, যাঁহাদিগকে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁহারা হইতেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক (প্রবোধকুমার) বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনজনের আবির্ভাব না হইলে বাংলা উপন্যাস সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবর্তিত হইত। ইঁহারা বলিষ্ঠতর প্রাণশক্তি, বিচিত্র শিল্পরীতি এবং জীবনসম্বন্ধে বৃহৎ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়া বাংলা উপন্যাসকে অনেক দূরে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০) ॥

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙালী যেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি বিভূতিভূষণের আবির্ভাবেও বাঙালী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল। সামান্য সাধারণ মানুষ বিভূতিভূষণ, বংশকৌলীন্য বা শিক্ষাদীক্ষা—কোন দিক দিয়াই আভিজাত্যের লেশমাত্র চিহ্ন নাই, বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যের আসরে প্রস্তুতি নাই; ছাপার অক্ষরে যেদিন উপন্যাস রূপ পাইল, সেই দিনই পরিপূর্ণ গোটা শিল্পরূপ ফুটিয়া উঠিল। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় যখন প্রতিমাসে (১৩৩৫—৩৬) 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইতে লাগিল (১৯২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) অথবা 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩৬-'৩৭) যখন

'অপরাজিত' (১৯৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) প্রকাশিত হইতেছিল, তখনকার কৌতূহলমুখর বাল্যস্মৃতি যাঁহার মনে আছে, তিনি বিভূতিভূষণের মূল্য বুঝিবেন। অবশ্য উপন্যাস রচনা করিবার পূর্বেও ১৩২৮-'৩১ সালের মধ্যে তাঁহার কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প বাহির হইয়াছিল। তখনই রসিকজনের দৃষ্টি গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' যেন দস্যুর মতো পাঠক-মন লুঠ করিয়া লইল। রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত হইলেন ; সাধারণ পাঠক বিভূতিভূষণ-অভিনন্দনে মাতিয়া উঠিল। গরীব স্কুল মাস্টার অকস্মাৎ যেন প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের তলে হাজির হইলেন। তারপরে তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস বাহির হইল—'দৃষ্টি-প্রদীপ' (১৩৪২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'দেবযান' (১৩৫১), 'ইচ্ছামতী' (১৩৫৬)। গল্প-সঙ্কলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মেঘমল্লার' (১৩৩৮), 'মৌরীফুল' (১৩৩৯), 'যাত্রাবদল' (১৩৪৮) ইত্যাদি। তখন শরৎচন্দ্র বাংলাদেশে প্রবল মহিমায় আসীন ; রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি, সারা ভারতের গুরুদেব। 'কল্লোল'-গোষ্ঠী যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। এরূপ পরিবেশে যশোহর জেলার এক সাধারণ মানুষ বিভূতিভূষণ চকিতের মধ্যে যেন সকলকে ম্লান করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্রের নীতি-দুর্নীতি, পতিতা-সতীর কথা দূরে পড়িয়া রহিল, 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র নিত্য নূতন শিল্পরীতি উদ্ভাবন ও তত্ত্বাবিষ্কার যেন কিছুটা ম্লান হইয়া গেল। মণীন্দ্রলাল, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যের গল্প-উপন্যাস এবং রোমান্স-আশ্রয়ী নাগরিকতা ড্রয়িংরুমে মুখ লুকাইল। হঠাৎ দেখা গেল, পল্লীবাংলার শান্ত-স্নিগ্ধ ইছামতী নদীটি আবিল নাগরিক জীবনকে শুচিস্নাত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে—যেন, আষাঢ়ুর ঘাটে ভাঙা চায়ের দোকানের পাশেই তামাকের নৌকা লাগিয়াছে। বনকলমী, ভাঁটফুল, বৈঁচিঝোপ, আশস্যাওড়ার বন নাগরিক উদ্যান-বাটিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং যন্ত্রমুখর, মনস্তাত্ত্বিক-দ্বন্দ্বে-বিষণ্ন, সমস্যা-পীড়িত, উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ জটিল মানুষের স্থলে সাধারণ সামান্য মানুষগুলি প্রীতি-নিষিক্ত আনন্দ-বেদনার পটভূমিকায় আবির্ভূত হইয়াছে।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিততে' একটা বালকের জীবনকথা অপরূপ ভূ-প্রকৃতির পরিবেশে বিকশিত হইয়াছে। হয়ত ইহাতে লেখকের ব্যক্তিগত বাল্যকথা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, অথবা ইহাতে রোমাঁ রোলাঁর *Jean Christophe*-এর গাঢ় ছাপ পড়িয়াছে। তবু ইহার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি এক হইয়া গিয়াছে। জীবনের গতিবেগ যেন স্টপ ওয়াচের মতো হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিনের নাম ধামহীন বিবর্ণ জীবনেও যে রূপকথার এত রস জমা হইয়াছিল, তাহা কি রবীন্দ্রনাথই জানিতেন, না 'পল্লীসমাজে'র শরৎচন্দ্রই খবর রাখিতেন? 'আরণ্যকে'র মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা মীস্টিক অনুভূতির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং বিশাল অরণ্য-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যের মধ্যে মানবচরিত্রগুলিও এক-একটি প্রতীকে পর্যবসিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত লেখক মীস্টিক রস হইতে অলৌকিক লোকে উপনীত হইলেন—'দেবযানে'।

হয়তো আপত্তি উঠিবে, বিভূতিভূষণ কোনদিনই ঔপন্যাসিক ছিলেন না, বাস্তব জীবনকে রোমান্স ও রূপকথার রসে ডুবাইয়া তিনি কতকগুলি অপূর্ব চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন ; উপন্যাসের ঘটনাসংঘাত, চরিত্রদ্বন্দ্ব, জীবননিষ্ঠা—এসব তাঁহার মধ্যে ততটা নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ উপন্যাসের আদর্শে তাঁহার গ্রন্থগুলি বিচার্য নহে—এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। কিন্তু উপন্যাসের আরও একটা বিশাল জগৎ আছে, যাহা চেতন-অচেতন, চেনা-অচেনার সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। বিভূতিভূষণের কবি-চেতনা আমাদিগকে তাহার মধ্যে আহ্বান করিয়া বাংলা উপন্যাসের সীমা ও অধিকার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১) ॥

কিছুকাল পূর্বেও সমস্ত মহিমা ও গৌরব লইয়া* তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। বিভূতিভূষণ অনেক আগে গত হইয়াছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। তারাশংকর অজস্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পর জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়া তারাশংকরই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিচার করিয়া তারাশংকরকেই সাম্প্রতিক ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। একদা সকলের অগোচরে 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, একখানি কবিতার পুস্তকও ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু 'কল্লোলে'র গুটি কাটিয়া উন্মুক্ত আকাশে বাহির হইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ছোটগল্পের বিচিত্র ঐশ্বর্য এবং উপন্যাসের মহাকাব্যোচিত বিশালতা তারাশংকরকে কালজয়ী করিবে। বীরভূম-বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশিয়া তিনি একটা বিস্ময়কর প্রাণশক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর একদিকে তিনি দেখিয়াছেন, সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শেষ প্রতিনিধি জমিদারতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িয়াছে ; সেখানে আসর জাঁকাইয়া বসিতেছে কলকারখানা, যন্ত্রাসুর, মিল-মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তারশংকর নূতন মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনিতেছেন। অপরদিকে তিনি দেখিতেছেন, পুরাতন জরাজীর্ণতার সঙ্গে নবীন প্রাণশক্তির দ্বন্দ্ব। বিগত জীবন তাহার ভগ্ন বিধ্বস্ত বাস্তুভিটায় কোনও প্রকারে পড়িয়া আছে, আধুনিক জীবন অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। একদিকে বিচিত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্য, আর একদিকে মৃত্যুদেবতার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। তারাশংকর বিশ শতকের মধ্যযামের স্পন্দমান বাণীটি আত্মার গভীরে উপলব্ধি করিয়াছেন, বিবর্ণ শুষ্ক মানুষগুলির মধ্যে অমেয় প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

* সম্প্রতি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর-এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা দিয়াছেন বলিয়া সর্বাধিক পরিচিত, লাভপুরের তারাশঙ্কর নিজেকে 'শ্রী'বাদ দিয়া শুধু তারাশঙ্কর রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। অবশ্য তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ দুই তারাশঙ্করের রচনার মধ্যে এমন আসমান-জমিন ফারাক যে, পাঠক সহজেই দুই লেখকের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে।

তারাশঙ্করের 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৪), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) এবং গল্পসংগ্রহ 'জলসা ঘর' (১৯৩৭), 'বেদেনী' (১৯৪০) প্রভৃতি বহুপঠিত সর্বজননন্দিত গ্রন্থ। কাহিনীর বিশালতা, চরিত্রের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য এবং মানবজীবন সম্বন্ধে একটা বিশুদ্ধ দার্শনিক বোধ তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে সমকালীন সমস্ত ঔপন্যাসিকের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার রচনায় বর্ণনাগত শিথিলতা যে নাই তাহা নহে; কোন কোন স্থলে অনাবশ্যক মন্তব্য ও দার্শনিক চিন্তার গুরুভার উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তবু বিশ শতকের মধ্যভাগের বাঙালী-জীবনের সামগ্রিক পরিচয়, তাহার অন্তর্জীবন ও আত্মার নিগূঢ় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তারাশঙ্করের উপন্যাসের সাহায্য লইতে হইবে। অন্য কোন উপন্যাসে একাধারে মানবজীবনের গভীর তাৎপর্য এবং সমাজমানসের প্রতিবিম্ব এমন চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্রের অভাবে বাংলা উপন্যাসের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া নাই ইহাই আশ্বাসের কথা।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ॥

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে শ্যামলরঙের যে দীর্ঘ মানুষটি পূর্ববঙ্গের নদীনালা পার হইয়া কলিকাতার সারস্বত সমাজে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিয়া ১৩৩৫ সালের দিকে গল্প রচনা শুরু করেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ছিল পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে। তাহার সঙ্গে মনোবিকলন তত্ত্ব ও মনোবিকার তত্ত্ব জড়াইয়া গিয়া কতকগুলি আশ্চর্য ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচিত হইয়াছে। জীবিকার তাড়নায় তিনি অজস্র লিখিয়াছেন। শেষ জীবনে দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের চাপে পড়িয়া তিনি যেন নাগরিক জীবনের ভব্যতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে তিনি যেন নিজের জীবনটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া অট্টহাস্য করিয়াছেন। শেষদিকে তিনি এলোমেলো বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া এবং উৎকট উৎকেন্দ্রিক লেখা লিখিয়া যেন অদৃশ্য বিধাতার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'শহরতলী' (১৯৪০), 'অহিংসা' (১৯৪৮) এবং গল্প-সঙ্কলনের মধ্যে 'অতসী মামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা-কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসে তারাশঙ্করের মতো আঞ্চলিকতা অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেহ-মনে বলিষ্ঠ মানুষের সুদৃঢ় চরিত্র আঁকিতে গিয়া তিনি অনেক সময়

আদিম জীবন-চেতনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "প্রাগৈতিহাসিক" গল্পটি এক হিসাবে তাঁহার জীবনাদর্শের প্রতীক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দেহের বলিষ্ঠতা এবং মনোবিকারের রুগ্ণতা আশ্চর্য কৌশলে তাঁহার রচনায় সমন্বয় লাভ করিয়াছে। দেহজীবী মানুষের ব্রীড়াহীন নিরাবৃত আত্মপ্রকাশের স্বরূপটিকে তিনি যেন তান্ত্রিকের দৃষ্টি দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তারাশঙ্করের যেমন একটা বৃহৎ ও মহৎজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রত্যয় রহিয়াছে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরূপ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন। মানুষকে তিনি দেহপিণ্ডের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানুষের মনের কথাও লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু 'লিবিডো' ভূতের হাতে আপনাকে নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়া 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র লেখক নিজের সাহিত্য-জীবনকে নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবনের রচনাগুলি তাঁহার প্রথমজীবনের লেখা-গুলিকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। ইহার অন্যতম কারণ উগ্র রাজনৈতিক মতামতের প্রতি অকারণ আকর্ষণ। মানসিক উৎকেন্দ্রিকতা তাঁহার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বোধহয় তাঁহার রচনার মূলেই প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাও ছিল; ফলে প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু (১৯০১—) প্রথমজীবনে সরস সুমিষ্ট গল্প রচনা করিয়া পরিচ্ছন্ন স্বাভাবিক জীবনরস এবং রোমান্সের পথ ধরিয়াছিলেন। পরে তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিয়া বাঙালীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র এবং বাদা অঞ্চলের জলজঙ্গলবাসী মানুষের বাস্তবাশ্রয়ী রোমান্সের গল্পগুলিকে একটা অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছেন।

'পরশুরাম', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাস্যরস ও কৌতুকরসের ধারাটিকে গল্পকাহিনী ও উপন্যাসে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। 'পরশুরামে'র অসঙ্গতিজনিত কৌতুকরস, ক্বচিৎ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা, কেদারনাথের মজলিসী রসিকতার ঢালাও কাহিনী এবং বাক্‌চাতুরীর উজ্জ্বলতা বাংলা উপন্যাস ও গল্পের স্বাদ ফিরাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু, ১৮৮০-১৯৬০) ঠিক পরশুধৃত ভার্গব না হইলেও বাঙালীর নানা সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহাস ও কৌতুকরসের সিঞ্চনে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসের মূল উৎস—সিচুয়েশন বা ঘটনা-সংস্থানের বিচিত্র কৌশল—এবং নাটকীয় সংলাপের সরসতা; ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরস গল্পগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, পরশু-রামের গল্পে সেই সরসতা আরও নিপুণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক সৃষ্টি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ই হাস্যরসকে যথার্থ সাহিত্যের উচ্চতর মার্গে স্থাপন করিয়াছেন; কৌতুকরস, চিত্তের প্রসন্নতা, বাৎসল্য-রসের সঙ্গে কৌতুকরসের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ, এবং হিউমারের সঙ্গে করুণরসকে মিশাইয়া

তিনি বাংলা ছোটগল্পে একটা সুমিষ্ট স্বাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার 'রাণু' এবং বাজেশিবপুরের গণেশ-ঘেঁৎনার দলটিকে বাঙালী অনেকদিন মনে রাখিবে। বিশুদ্ধ হিউমার সৃষ্টিতে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ বিষয়ে যে-কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য লেখকের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। তিনি কয়েকখানি বড় উপন্যাসও লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনী-গ্রন্থনের নিপুণতা, রঙ্গকৌতুকপূর্ণ সিচুয়েশন সৃষ্টির দক্ষতা এবং কৌতুকরসের প্রবাহ তাঁহার এই উপন্যাসগুলিকে বিশেষ সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে।

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্যাসগুলি দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়া পাঠকমনে একপ্রকার ম্লান মাধুরী সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ রাঢ়ের ভগ্ন বিধ্বস্ত বিষণ্ণ জীবনচরিত্রগুলি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে। রচনারীতি, আঙ্গিক প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ নূতনত্ব সঞ্চার করিতে না পারিলেও, তাঁহার অঙ্কিত নরনারীগুলি একেবারে আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সবুজ-পত্র'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মননশীল প্রাবন্ধিক-রূপে বাংলাদেশে বিশেষ সম্মানিত। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস (অন্তঃশীলা—১৯৩৫, আবর্ত—১৯৩৭ ইত্যাদি) বুদ্ধিবাদী উপন্যাসরূপে শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত। কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের তাড়নায় সুস্থ স্বাভাবিক মানবচরিত্র-গুলি কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধ ও মননশীল গদ্য-রচনার উল্লেখ করিতে হইলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী এবং মোহিতলাল মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে। অবশ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগন্তহীন ব্যাপ্তির ফলে প্রবন্ধ-সাহিত্যেও অন্য কাহারও পক্ষে পাড়ি জমানো প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্র-নাথের দ্বারা উৎসাহিত ও প্রভাবিত হইয়া বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-৯৯) 'চিত্র ও কাব্য' (১৩০১) নামক একখানি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য নানা সাময়িক পত্রিকাতেও তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ হইত। বস্তুর যথাযথ সন্নিবেশ এবং কবিমনের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ তাঁহার প্রবন্ধ-গুলিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদগন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। শব্দের সাহায্যে চিত্ররূপ নির্মাণ তাঁহার অসাধারণ লিপি-কৌশলকেই প্রমাণিত করিতেছে। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা খুব চিন্তাশীল বা গভীর না হইলেও সর্বত্রই তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধিটুকু প্রাধান্য পাইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) ॥

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী এবং গদ্যশিল্পী। তিনি তুলি দিয়া যাহা আঁকিয়াছেন সেগুলি চিত্র, আর কলম দিয়া শব্দের সাহায্যে যাহা আঁকিয়াছেন তাহা গদ্য। গদ্য ভাষার শিল্পধর্মকে অনুসরণ করিয়া তিনি পুরাতন দেশকালে বিচরণ করিয়াছেন, এবং গদ্যে কখনও সরস বাগ্‌ভঙ্গিমা, কখনও-বা রোমান্সের নীলাঞ্জনরঞ্জিত শব্দ ব্যবহার করিয়া বাণীবন্ধে রঙ ধরাইয়াছেন। 'ক্ষীরের পুতুল' ও 'শকুন্তলা' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাহির হয়। কিন্তু 'বাংলার ব্রত' (১৯০৮), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (বাংলা ১৩২২), 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৩২৩) প্রভৃতি বিচিত্র গ্রন্থগুলিতে রূপকথাই নববেশে আবির্ভূত হইয়াছে। অনেকটা সুকুমার রায়ের ধরনের অসঙ্গতি, কল্পনা, রূপকথা, কৌতুকরস, ভূগোল-ইতিহাসকে জট পাকাইয়া অদ্ভুত রসসৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা বাংলাদেশের আর কাহারও নাই। অবনীন্দ্রনাথ গুরুতর ব্যাপারকেও (যথা—'বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'—১৯৪৮, 'জোড়াসাঁকোর ধারে'—১৩৫০, 'ঘরোয়া'—১৩৪৮, 'আপনকথা' ইত্যাদি) এমন একটা সরস সহজ অথচ সৌন্দর্যপ্রিয় চিত্ররূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভট খেয়াল, রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম এবং বলেন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ-মধুর ব্যক্তিগত অনুভূতি—তিনপ্রকার প্রভাবই তাঁহার রচনা, মন ও মেজাজে পাওয়া যাইবে। গদ্যে উদ্ভটরস সৃষ্টির প্রথম কৃতিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য ; তাঁহার পরেই এই বিভাগে অবনীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ পদচারণা বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব ব্যাপার। দুঃখের বিষয় তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তি পুরা হইতে পায় না। মনে হয়, তিনি যেন দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো জীবনে বিশেষ আসক্তি বোধ করিতেন না, নিজের কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁহার তেমন মমতা ছিল না। যিনি দুই হাতে রাজার ঐশ্বর্য বিলাইতে পারিতেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলে মনটা হায় হায় করিয়া ওঠে।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু 'রূপদক্ষ' (artist) নহেন, প্রথম শ্রেণীর রূপকথাকার। রূপকথার সঙ্গে সৌন্দর্যের জগৎ ও অসঙ্গতির জগৎ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া এমন একটি উদ্ভট রসের সৃষ্টি হইয়াছে যে, বাংলা সাহিত্যের অতীতে এবং বর্তমানে ইহার সমকক্ষ রচনা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ॥

রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধসাহিত্যে যে গভীর মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা ও তীক্ষ্ণযুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে প্রবন্ধের নীরস তথ্যভারকে কৌতুকরসের লঘু আবহাওয়া হাল্‌কা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বলিলেই চলে। আচার্য ত্রিবেদী বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ; কিন্তু দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, স্মৃতি-পুরাণ, ব্যাকরণ,—এমন কোন বিষয় নাই, যাহাকে তিনি স্পর্শ করেন নাই। যাহাকে 'এন্‌সাইক্লোপীডিক'-জ্ঞান বা বিশ্বজ্ঞান বলে, আচার্যের তাহা যেন নখদর্পণে

ছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পাণ্ডিত্যের নখদন্ত ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে যেরূপ মনোহারী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ('বিজ্ঞানরহস্য') এবং রবীন্দ্রনাথ ('বিশ্বপরিচয়') ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে এতটা সার্থক হইতে পারে নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞকথা'—এ সমস্তই তাঁহার ভূয়োদর্শন, তীক্ষ্ম অদ্ভুত মনস্বিতা এবং অপূর্ব রসবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক বলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পদার্থজগতের সীমাবদ্ধতা ও দুর্জ্ঞেয়তা দূর করিবার জন্য তিনি বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং দর্শন হইতে গভীরতর তত্ত্ববিদ্যা ও অধ্যাত্মচেতনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আস্তিক্য-বাদী দর্শনের মধ্যে শান্তিলাভ করিলেন। তত্ত্বকথায় তিনি যেমন অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ ভাষা ও রচনারীতিকে কৌতুকরসোজ্জ্বল করিয়া প্রবন্ধের সীমা বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্ন মুখের স্মিতবিকশিত হাসিটির মতো ভাষা-ভঙ্গিমাও জীবন্ত, রসপরিপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত উষ্ণতায় পরম উপভোগ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি মনীষী ও বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় এই রীতিটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে মননের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে রামেন্দ্রসুন্দরকেই প্রধানতম চিন্তাবিদ্ ও ভূয়োদর্শী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূল বস্তুজগৎ ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগতের যথার্থ সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি একাধারে পাশ্চাত্ত্য বস্তুবিজ্ঞান ও ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের উপরে অসামান্য আধিপত্য স্থাপন করিয়া প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের রাখী বন্ধন করিয়া দিয়াছেন। সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে দর্শন ও বিজ্ঞানের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ॥

'সবুজপত্রে'র বিখ্যাত সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' নামের অন্তরালে অবস্থান করিলেও লোকে তাঁহাকে একবাক্যে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। মননের ক্ষেত্রে, চিন্তাশীল প্রবন্ধের ব্যাপারে, নির্ভেজাল যুক্তিমার্গের অনুসরণে এবং প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মত-পোষণে তাঁহার মতো সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় কয়জনেই-বা দিতে পারিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বর্ধিত হইলেও তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রপ্রভাবে বিশেষ রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। বরং 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথই বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় প্রমথনাথের ভাষা-রীতিকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং নিজেও সেই চলিত রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সবুজপত্র এবং তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রবল শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা জগৎ ও জীবনকে বুঝিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই চিন্তাকে যথাসম্ভব

চলিতভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীই চলিত রীতিকে এতটা প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং সাধু রীতিকে কৃত্রিম বলিয়া পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে চলিত রীতি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে এবং সাধু রীতিকে প্রায় কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী ভাষামার্গে যতটা বিদ্রোহ করিয়াছেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশি করিয়াছেন ভাব ও চিন্তার জগতে। সবুজ মলাটের নিরাভরণ 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করিয়া চৌধুরী মহাশয় ভাবাবেগে-জর্জর বাংলাদেশে একটি স্পষ্ট, তীক্ষ্ম, ঋজু মননের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল ; তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পরবর্তী কালের মননশীল সাহিত্য ও চিন্তায় অভূতপূর্ব সাড়া আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমকালে শিক্ষিত সমাজে এরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করা এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

প্রমথ চৌধুরী 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং 'পদচারণা' (১৯১৯) নামক দুখানি কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—ইহার অধিকাংশই সনেট। সনেটের চৌদ্দপংক্তি এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসের বাঁধা নিয়মটি চৌধুরী মহাশয় নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যেমন গদ্যে তেমনি পদ্যেও তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা দিয়া বাঙালীর জড় চিত্তকে জাগাইতে গিয়াছিলেন। অবশ্য যান্ত্রিক মাপে এই সমস্ত কবিতা ও সনেট নিখুঁত হইলেও কবি আবেগকে প্রায় বাতিল করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কবিতা যে পরিমাণে চমক দিয়াছে, সেই পরিমাণে সত্যকারের কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, তাঁহার 'তেল-নুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯), 'নানাচর্চা (১৯৩২) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ 'বীরবলের হালখাতা' বাংলা সাহিত্যে একখানি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে এরূপ গভীর চিন্তাশীল গ্রন্থ যে চলিত ভাষায় রচনা করা যায়, তাহা সে যুগে অনেকে কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

চলিত ভাষার প্রধান প্রচারক প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষায় লিখিলেও তাঁহার ভাষায় বহুস্থলে সাধু ভাষার চেয়েও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, বাগ্‌ভঙ্গিমায় সংলাপের ঢং থাকিলেও তাহাকে কিছুতেই প্রতিদিনের ভাষা বলা যায় না। বরং তাঁহার চলিত ভাষা অপেক্ষা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাধু ভাষা অনেক বেশি সরল ও সহজবোধ্য। তাঁহার অর্ধশতাব্দী পূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র যে চলিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা সেরূপ প্রাণবান ও বাস্তব-ঘেঁষা নহে। তাঁহার জটিল চিন্তার মতো ভাষাও কিছু বক্র,—যাহা চলিত ভাষার লক্ষণ নহে। তাঁহার রচনারীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বিমতের অবকাশ থাকিলেও বাংলার সমাজ, সাহিত্যাদর্শ ও ভাষামার্গে প্রায় বিপ্লব সূচনা করিয়া প্রমথ চৌধুরী আপনার প্রভাব সমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। প্রবীণের দল তাঁহার ভাষারীতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, ইংরেজী-ওয়ালা ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে

আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ম তির্যক অম্লাক্ত খোঁচার মুখে সকলে হটিয়া গিয়াছেন। ফরাসী গদ্যসাহিত্যের ভক্ত ও ভারতচন্দ্রের প্রতিভামুগ্ধ প্রমথ চৌধুরী এই 'প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ' জাতির মরা সংস্কার ও মোটা বুদ্ধিকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়া আত্মস্থ করিবার যে ব্রত লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্য দিয়া সার্থক হইয়াছে। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর যে সমস্ত লেখক প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন, তাঁহারা মূল প্রেরণাটি প্রমথ চৌধুরীর নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

এইবার আমরা বর্তমানকালের আর দুইজন চিন্তাবীরের পরিচয় লইয়া এবং আরও দুই-একজন প্রাবন্ধিকের নাম উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল মজুমদারের গভীর চিন্তা, ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং বাংলা গদ্যে অভূতপূর্ব অধিকার বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল'-গোষ্ঠী যে নূতন ভাবাদর্শের প্রাচুর্য আনিয়াছিলেন, মোহিতলাল কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার বিরোধী ছিলেন। প্রবীণ পাঁচকড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ, শিল্পনীতি ও জীবনতত্ত্বে লালিত; পরবর্তী যুগের মোহিতলালও প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। পাঁচকড়ির মধ্যে হিন্দুর সনাতন সমাজ-আদর্শের মার্জিত-রূপ বড়ো হইয়াছে এবং মোহিতলালের মধ্যে বাঙালীর দীর্ঘকালের সংস্কার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ফলে উভয়েই আধুনিক ও প্রগতিশীল পাঠক-সমাজে কিছু ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। উপরন্তু পাঁচকড়ির বহু উৎকৃষ্ট রচনা বহুকাল মাসিক পত্রিকার মধ্যে মুখ লুকাইয়াছিল। বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে বাংলার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বাঙালীর বৃহত্তর গ্রামীণ সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয়দানের প্রথম গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। য়ুরোপের যুদ্ধোত্তর প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে তরুণদলের অভিযানকে ভাবালুতা ও ফিরিঙ্গীসুলভ অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দী যাই-যাই করিয়াও রহিয়া গিয়াছিল। তাই গভীর ভাবুকতা, সুতীক্ষ্ম চিন্তাশীলতা এবং সাত্ত্বিক ভাষারীতির অধিকারী হইয়াও পরবর্তী কালের জোয়ারের জলে তিনি ভাসিয়া গিয়াছেন। আধুনিক কালের লেখক ও পাঠকসমাজ ভূগোল ও ইতিহাসের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বাঙালীর সংস্কার ও সাধনাকে বিশ্ব-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে পথের পথিক ছিলেন না। তাই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হইয়াও মৃত্যুর (১৯২৩) পরে তিনি ধীরে ধীরে লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

কবি মোহিতলাল মজুমদার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিক হইতে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রেও একটি বিশিষ্ট মত ও পথের প্রচারক হইয়া আবির্ভূত হন। 'ভারতী' পত্রিকা এবং 'ভারতী'-গোষ্ঠীর উৎসাহী লেখক, সমালোচক এবং কবি মোহিতলাল মজুমদার কিছুকাল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর দলেও মিশিয়াছিলেন।

'সত্যসুন্দর দাস' এই ছদ্মনামে লেখা তাঁহার অনেক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত নানা আলোচনা তাঁহাকে প্রচুর নিন্দা ও খ্যাতির অধিকারী করিয়াছে। তিনি শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড ও পেটারের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; জীবন ও শিল্প-সাহিত্য তাঁহার দৃষ্টিতে পৃথক বস্তু নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আদর্শের খাতিরে রবীন্দ্রবিরোধিতা করিতেও সংকুচিত হন নাই। কিন্তু তাহার মূলে কোন হীন স্বার্থসিদ্ধির নীচতা ছিল না। তিনি যে সাহিত্যাদর্শকে সত্য বলিয়া মানিতেন, তাহাকে জীবনের সর্ব অবস্থাতেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ঐহিক লাভ-লোকসানের সঙ্গে শিল্পজীবনের আপস করিয়া চলা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলে তাঁহাকে অনেকের কাছেই অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল। অসাধারণ মনীষার অধিকারী হইয়াও তিনি চিন্তাবিলাসী ব্যক্তিদের কাছে শুধু নিন্দাই লাভ করিয়াছেন; এবং ইহার ফলে তাঁহার ভাষা ক্ষুরধার হইয়াছে, সাহিত্য-সংক্রান্ত মতভেদ ব্যক্তিগত মনোমালিন্যে পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। এখন আবার তাঁহার পুরাতন বিপক্ষীয়েরা নিন্দা-বিদ্রূপের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মোহিতলালের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য কথা', 'শ্রীমধুসূদন', 'বাংলার নবযুগ', 'সাহিত্য বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। গভীর মর্মবোধ, বিশ্ব সাহিত্যের নিগূঢ় জ্ঞান, বাঙালীর প্রাণরহস্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপকতা মোহিতলালকে সৌখীন সমালোচক হইতে দেয় নাই, অ্যাকাডেমিক টীকাকার হইতে বাধা দিয়াছে, এবং পুঁথি-বিবরণী ও তথ্যপঞ্জীর ভারবাহীর গৌরব হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রবণতার গোঁড়ামি বাদ দিলে মোহিতলালকেই বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিচারক বলিতে হইবে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসিক সমালোচকগণ বাংলা সমালোচনার নানা বিভাগে আপনাদের চিন্তা সুমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য যে সর্বাধিক গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহার জন্য ইঁহাদের গবেষণা ও রসালোচনাই প্রধানতঃ দায়ী।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়-চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি প্রায় পনর বৎসরের মধ্যে বাঙালীর চিন্তাশীল মননের সাহিত্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নিখিলনাথ রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা সকলেই ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিভাগে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য মূলতঃ সাহিত্য এবং কিছু মৌলিক ঐতিহাসিক নিবন্ধ ছাড়া বাংলা গদ্যে গভীর গবেষণামূলক দর্শনবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই। বাঙালী পণ্ডিত-মনীষীরা অধিকাংশ স্থলে ইংরাজীতেই আপন আপন গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই বাংলা গদ্যের সর্ববিভাগে যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, ইহার ততটা বিকাশ হয় নাই, তাহা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য

সূচনা ॥

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের কালপরিমাণ ও কলাপরিমাণ লইয়া বিবাদ-বিতর্কের অন্ত নাই। কারণ সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে সমকালীন সমালোচকেরা কখনও একমত হইতে পারেন না। ঠিক কোন্ সময় হইতে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের কালনির্ণয় করা হইবে, বংশ-কৌলীন্যের কুলজী তৈয়ারি হইবে, এবং সাম্প্রতিক সাহিত্যের কলারূপ ও জীবনাদর্শের স্বরূপই বা কিরূপ, সেবিষয়ে আধুনিককালের পাঠকের সংশয় জাগা স্বাভাবিক। নবীনদল চিরকাল কিছু উদ্ধত, অবিনয়ী ও অভিনবত্বের পূজারী। তাঁহারা যে-যুগে বর্ধিত হন, যে-যুগধর্মে লালিত হন, সেই যুগের সাহিত্যকে 'প্রগতিশীল' নাম দিয়া তাহারই জয়গানে মুখর হইয়া ওঠেন এবং অনতিপুরাতন কালের সাহিত্যকে অনগ্রসর, অবক্ষয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন। যে-কয়জন প্রবীণ লেখক এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং নিজেদের পুরাতন শিল্পাদর্শের মধ্যেই বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া আর যাইতে সম্মত নহেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যের গতি ও বিকাশ যে থামিয়া যায় নাই, ক্রমেই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এই সত্য কথাটা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই সার্থক, যেখানে পরবর্তী কালের বাঙালী লেখকগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া ভিন্নপথে অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্দ্রযুগের নিঃশেষে অবসান না হইলেও সৃষ্টিশীল প্রতিভা যে অনুকরণে বা অনুসরণে তৃপ্তি পায় না, বরং নিজ নিজ প্রতিভা ও শক্তি অনুযায়ী নিজেই পথ খুঁজিতে বাহির হয়, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য হইতে সেই সত্যটুকু প্রতিভাত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য এমন বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী হইয়াছে যে, নবীন সাহিত্যিকগণ দুঃসাধ্য জানিয়াও রবীন্দ্র প্রভাবকে সর্বপ্রকারে ছাড়াইয়া উঠিয়া নূতন মত, পথ ও শিল্পাদর্শের প্রতি উন্মুখ হইয়াছেন।

সম্প্রতি সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যাহাকে প্রগতি, আধুনিকতা প্রভৃতি বলা হইতেছে, ইহার যথার্থ সূচনা কবে হইল? ভিক্টোরীয় যুগের কবি হপকিন্স ইংরাজী কাব্যের বিষয়বস্তু ও বাক্‌নির্মিতিতে সর্বপ্রথম আধুনিক মনোভাব ও চিত্রকল্প প্রয়োগ করেন। ১৮৮৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি অচিরে লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া যান। ১৯১৮ সালে রবার্ট ব্রিজেস্ যখন হপকিন্সের প্রথম কাব্য-সংকলন প্রকাশ করিলেন (*The Poems of Gerard Manley Hopkins*) তখন ইংরাজী কাব্যরসিক বুঝিতে পারিলেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের এই কবি আধুনিক ইংরাজী কবিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

য়ুরোপের জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর হইলে সেই উত্তাপ সাহিত্যকেও স্পর্শ করিল। যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্য তাই 'মডার্ণ' বা আধুনিক বলিয়া পরিচিত। এই সময়ে হুল্‌ম্‌ ও এমি লাওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে 'Imagist Group' গড়িয়া ওঠে। ১৯১৫ সালে এই দলভুক্তগণের কবিতা-সংকলন *Some Imagist Poets*-এ একপ্রকার নূতন ধরনের কবিতা স্থান পাইল। তাই ইংলণ্ডে যুদ্ধোত্তরকালীন সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য বলা হয়। আমাদের বাংলা দেশেও সাধারণভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আধুনিক বলা হয়। কারণ ইহার পূর্ববর্তী সাহিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্য নামে পরিচিত।

সেইজন্য বর্তমানকালের সাহিত্যকে আমরা 'সাম্প্রতিক সাহিত্য' নাম দিতে চাই —যদিও এই নামকরণ খানিকটা একতরফা হইয়াছে এবং বোধহয় এই নামের সাহায্যে যুগটির যথার্থ কালপরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাহা হইলেও আমরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে সাম্প্রতিক বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর হইল। তাহারও বেশ কিছু পূর্বে ১৯৩০ সালের দিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতসমাজের বেকারসমস্যা উৎকট হইয়া স্বাভাবিক জীবন ও চিন্তাধারাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাত্মাজীর অসহযোগ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন যুবসমাজকে খুব একটা আশ্বাস দিতে পারিল না।* ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রবল বিক্রমে ভারতের দ্বারপ্রান্তে হানা দিল। যুদ্ধের আগুন তুষানলের মতো জ্বলিতে লাগিল, দাবাগ্নির মতো সমস্ত পাপতাপকে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। যুদ্ধের উৎকট প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ বাঙালীর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হইল, বহু-কালাশ্রিত নীতিবোধের মূল্য দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৯৪২ সালের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, দিগন্তে জাপানী বিমান এবং পূর্বসীমান্তে জাপানী বাহিনীর শনৈঃ শনৈঃ অনুপ্রবেশের দুঃসংবাদে ইতর-ভদ্র সকলেরই মনোবল ভাঙিয়া পড়িল। তাহার উপরে আবার ইংরেজ শাসক শক্তির ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুই-জাতিতত্ত্বের স্বীকৃতি এবং দেশ-বিভাগ, মুসলমান রাষ্ট্র ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা মানুষের ভিড়, নৈতিক মানের শোচনীয় অবনতি, দেশীয় শিল্পপতিদের নিজ মূর্তি ধারণ, শ্রমজীবীদের শ্রেণীবদ্ধ হইবার চেষ্টা, ধর্মঘট ও বেকারজীবন—অপরদিকে অভিজাত সমাজের ঐশ্বর্যের সমারোহ, নিম্নতম সমাজের আশাহীন, আনন্দহীন দারিদ্র্যপীড়িত দুঃসহ জীবন, রাজনীতিতে দুর্নীতির আধিপত্য, যুবসমাজের ভগ্ন মেরুদণ্ড, স্বার্থগৃধ্নু রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব—

* রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বাদ দিলে বাঙালীর চিন্তা ও ঐতিহ্যে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে শিল্প-সৃষ্টিতেও তাঁহার বিশেষ কোন দান লক্ষ্য-গোচর হয় না, যদিও গান্ধীজীর আদর্শ-সংক্রান্ত অল্প কিছু রচনা বাংলা সাহিত্যেও মিলিবে। তবে তাহার প্রচারমূল্য থাকিলেও শিল্পমূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

এই সমস্ত সামাজিক, উৎক্রান্তি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে মূল্যাবনয়নের চোরাবালিতে নিক্ষেপ করিয়াছে। তদুপরি বাঙালীর মুখের উপরেই অন্য প্রদেশের দাক্ষিণ্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, ঘরের অর্থনৈতিক কাঠামোও ভাঙিয়া পড়িতেছে, শিক্ষিত সমাজ জীবিকার সন্ধানে উন্মত্তের মতো ধাবমান হইতেছে। এইরূপ সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাব আজ মধ্যবিত্ত বাঙালীকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে। এ যুগের এই সামাজিক প্রেতচ্ছায়াটা সাহিত্যের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। সমগ্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে মধ্যবিত্ত বাঙালী-সমাজ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে পোষণ করিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নানারূপ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এই শ্রেণীটিতে ভাঙন ধরিয়াছে। ইদানীন্তন কালের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া আমরা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যুগমানসের প্রভাব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কবিতায় নূতন ধারা ॥

আমরা ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের 'সূচনা'য় দেখিয়াছি যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা কাব্যে ক্রমেই নূতন সুর উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছিল। মোহিতলাল, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেই সুরের প্রথম প্রবর্তন করিলেন। অবশ্য তাঁহারাও রবীন্দ্রকাব্য ও ভাবাদর্শের কূল ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের যাত্রী হইতে পারেন নাই। মোহিতলালের বলিষ্ঠ দেহপ্রীতি ও অধ্যাত্মবিমুখী জীবনরস, নজরুলের ভাবে-ভাষায় বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রাণশক্তির উদ্দামতা এবং যতীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী সংশয়ী বিষণ্ণতা—এইটুকুই যা সুরের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। কিন্তু কাব্যকলা, বাক্‌নির্মিতি ও বাণীমূর্তি রচনায় তাঁহারা অল্পস্বল্প নূতনত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিলেও একটা অভিনব কাব্যপ্রকরণ ও ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রয়াস করেন নাই। কিন্তু ক্রমেই আরও একটা নূতন সুরের উচ্চরব রবীন্দ্রবিরোধিতার আকারে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'ই (১৯১৩) সর্বপ্রথম বহুকালাশ্রিত 'ট্র্যাডিশন'কে (জাতীয় সংস্কার) ছাড়িয়া যুক্তিবাদ ও আধুনিক মনোভাব প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু 'সবুজপত্র' মূলতঃ প্রবন্ধনিবন্ধের ক্ষেত্রেই মুক্তির সূচনা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্ব এবং 'পুনশ্চ' বর্গের কবিতা আধুনিক রীতি ও মনোভাব বহন করিয়া আনিল। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যধারা ছাড়িয়া নূতন কাব্যপ্রত্যয়কে বরমাল্য দিবার ক্ষীণপ্রচেষ্টা দেখা দিল কলিকাতার 'কল্লোল' (১৯২৩) এবং ঢাকার 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকায়। 'কল্লোল' পত্রিকা একদা স্বল্পতর ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই নূতন মনোভাব ও আদর্শ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল,

তাঁহাদের কেহ কেহ কিছুকাল 'কল্লোলে' যোগদান করিয়াছিলেন, রচনা দিয়া 'কল্লোল'কে আধুনিক সাহিত্যের মুখপত্র হিসাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোকুলচন্দ্র নাগ এবং দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রও কিছুকাল 'কল্লোল' সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত 'কল্লোল' প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যাঁহারা কাব্য ও উপন্যাসে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন (অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, তারাশঙ্কর, নজরুল. মোহিতলাল, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, 'যুবনাশ্ব' অর্থাৎ মণীশ ঘটক, শৈলজানন্দ প্রভৃতি), তাঁহাদের অনেকেই 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষীণ সূচনা সর্বপ্রথম 'কল্লোল' পত্রিকাতেই লক্ষ্য করা যাইবে। ইহার পর 'কালিকলম' (১৯২৬) এবং ঢাকার 'প্রগতি'র (১৯২৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রে আধুনিক বাংলা কবিতার নানা রূপরীতি লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ১৯৩০ সালের দিকে অস্ফুট নবীন কণ্ঠগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' ১৯৩০ সালে কয়েক-মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হইল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে; কিন্তু কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল ১৯২৪-২৮ সালের মধ্যে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' এই ১৯৩০ সালেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাঁহার নিজস্ব সুর ফুটিয়া ওঠে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যে। বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্য 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক' ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাও তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য বহন করিতেছে না। মোহিতলাল ও নজরুলের সুরের প্রতিধ্বনি 'ঝরাপালকে'র অনেক কবিতাতেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মৌলিক কাব্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬ সালে বাহির হয়। ১৯২৭ সাল হইতে তিনি কবিতা রচনা শুরু করিলেও ১৯৩০ সালের পূর্বে তাঁহার কবিতা স্বকীয়তা লাভ করিতে পারে নাই। অমিয় চক্রবর্তী ও সমর সেনের কবিতা আরও অনেক পরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহাকে যথার্থ আধুনিক বাংলা কবিতা বলে, ১৯৩০ সালের পূর্বে তাহার বিশেষ কোন ভাবমূর্তি বা রূপমূর্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ছাড়িয়া নূতন কিছু করিবার চেষ্টার ফলে এবং প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কবিতার প্রভাবে বাংলাদেশে সাক্ষাৎভাবে আধুনিক কবিতার আবির্ভাব হইল। এই সমস্ত আধুনিক কবিদের অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, কেহ কেহ ইংরাজীর অধ্যাপক। তাঁহারা য়ুরোপের কাব্যধারার অভিনব রূপান্তর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় সেই আদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বা সমকালে আধুনিক ইংরাজী কবিতার যথার্থ

পত্তন হয়। ১৯১২-১৭ সালের মাধ্যে টি. ই. হ্যুল্‌ম্‌ কাব্যক্ষত্রে 'Imagist Group' নামে একটি নূতন কবিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন। মার্কিন মহিলাকবি এমি লাওয়েল ও মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ডের চেষ্টায় এই দল একপ্রকার অভিনব কবিতার কথা প্রচার করিতে থাকেন। এই মতে, রোমাণ্টিক ভাবালুতা ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বস্তু-চৈতন্যের মারফতে কবি-কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। পাউণ্ড সর্বপ্রথম এই 'ইমেজিস্ট' পদ্ধতিকে কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেন। আধুনিক ইংরাজী কাব্যে তিনজন মার্কিন কবি—এমি লাওয়েল, এজরা পাউণ্ড এবং টি. এস. এলিয়ট যুগান্তরের সূচনা করেন। অবশ্য তাঁহাদের অনেক পূর্বে হপকিন্‌স্‌ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাকরীতিতে সর্বপ্রথম আধুনিক কবিতার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে 'ইমেজিস্ট' গ্রুপ ভাঙিয়া গেল বটে, কিন্তু আধুনিক ইংরাজী কবিতা ১৯৩০ সালের মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিল। মার্কিন নাগরিক টমাস স্টার্ন্‌স্‌ এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ব্রিটিশ নাগরিকতা লাভ করিবার (১৯২৭) পূর্বেই ইংরাজী কাব্যে যুগান্তর সূচনা করেন। এলিয়ট *Prufrock and other Observation (1917)*, *Ara Vos Prec (1919)*, *Poems (1920)*, *The Waste Land (1922)* প্রভৃতি কবিতা সঙ্কলনে নূতন কাব্যপ্রতীতি ও রূপকলা নির্মাণ করিলেন। এজরা লুমিস পাউণ্ড (১৮৮৫) ১৯০৯ সাল হইতে কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেও ১৯১৮ সালের পূর্বে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ১৯২০ সালে তিনি বিখ্যাত কাব্য *The Cantos* লিখিতে আরম্ভ করেন। উইস্‌টান হ্যুগ অডেন (১৯০৭—) অনেক পরে কবিতাক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রথম কাব্য *Poems* ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। স্টিফেন স্পেন্ডারের প্রথম কাব্য *Twenty Poems*-এর প্রকাশকালও এই বৎসর। ১৯২৯-৩৩ সালের মধ্যে লিখিত সিসিল ডেল্যুইসের কবিতাসঙ্কলন *Collected Poems*-ও ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। অতএব অনুমান করিতে বাধা নাই যে, আমাদের আধুনিক বাংলা কাব্যের উৎসমূলে তদানীন্তন ইংরাজী কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে।

১৯৩০ হইতে ১৯৬০ সাল—প্রায় তিরিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতা নানা বাধা-বিপত্তি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং উৎকট উৎকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে একটা নূতন কিছু করিবার প্রেরণা উপলব্ধি করেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কলিকাতার 'কল্লোল' এবং ঢাকার 'প্রগতি' পত্রে এই জাতীয় আধুনিকতার নানা পরীক্ষা চলিতেছিল। 'শনিবারের চিঠি'র (১৩৩৫ সালে মাসিকে রূপান্তরিত) প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা কবিতার শক্তি ও প্রভাবকে অস্বীকার করা গেল না। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম যুগটিকে উল্লিখিত কবিচতুষ্টয় লালন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অচিন্ত্যকুমার শেষে পুরাপুরি কথা-সাহিত্যে ঢলিয়া পড়িলেন। আর তিনজন (বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র ও অজিত দত্ত)

নূতনত্বের সূচনা করিলেও বাক্‌রীতি ও চিন্তার নব মূল্যবোধ সম্পর্কে খুব একটা বিরাট পরিবর্তনের অভ্যুদয় ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কবি অজিত দত্ত জন্মরোমাণ্টিক। 'প্রগতি'র যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক-কাল পর্যন্ত তাঁহার কাব্য-কবিতা ('কুসুমের মাস'—১৯৩০, 'পাতাল কন্যা'—১৯৩৮, 'নষ্ট চাঁদ'—১৯৪৫, 'পুনর্ণবা'—১৩৪৫, 'ছায়ার আল্পনা'—১৯৫৩) প্রধানতঃ প্রেম, সৌন্দর্য এবং আবেগধর্মী বিশুদ্ধ রোমান্সকেই বরমাল্য দিয়াছে। কাজেই 'প্রগতি'-গোষ্ঠীতে রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকৃত হইলেও অজিত দত্ত মন ও প্রকাশরীতির দিক দিয়া কোনদিনই রবীন্দ্রপ্রভাবকে পুরাপুরি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার রোমান্স মর্ত্যের 'মালতী'কে ঘেরিয়া বাস্তব-কেন্দ্রিক স্বপ্ন ও রোমান্সের সোনার সূত্র বয়ন করিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সনেট বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্বীকৃতি লাভ করিবে। তাঁহার বিশুদ্ধ কবিপ্রকৃতিটি নানা তত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞান ও দার্শনিক প্রত্যয়ের ব্যায়ামে পর্যবসিত হয় নাই বলিয়া কাব্যরসিকগণ তাঁহার কবিতা হইতে পরম উপভোগ্য প্রাণের আরাম খুঁজিয়া পাইবেন। তাঁহার রোমাণ্টিক স্বপ্ন-বিলাস সংযত বাগ্‌বন্ধনে একটি অপরূপ রূপকল্প সৃষ্টি করিয়াছে :

মালতীর ছায়াচোখে ধীরে ধীরে নিবে আসে আলো,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তথাপি মদির মদালস,
মালতির আঁখি হতে পুঞ্জ পুঞ্জ কুহুম মিলালো,
মৃত্যুর মোহন স্পর্শে তনু তার শিথিল অবশ।
জ্যোৎস্নাসিক্ত হৈমাকাশে নিবে আসে চৈত্র-মধুরস,
তথাপি এ আজিকার মধুরাত্রি না হইতে শেষ,
অধরে লভিতে হবে বিমুগ্ধের অধর পরশ,
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ,
অপরূপ মালতী সে—অধরে চুম্বন যার, বক্ষে বার অনন্ত আশ্লেষ।

কবি রোমান্স ও রূপকথা মিশাইয়া যে মায়াজাল বয়ন করিয়াছেন, সাম্প্রতিক কাব্যে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যথা :

গভীর সমুদ্রতলে প্রবালদ্বীপের সীমা ছাড়ি',
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নিচে সাপের দালান,
সাতডিঙা মধুকর যে দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্রতলে মরকত মাণিক্যের থাম।
তারো দূরে, তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়,
ঝিলমিল ফণার ছায়ায়।

কবি বুদ্ধদেব বসুই (১৯০৮-১৯৭৪) সর্বপ্রথম সচেতনভাবে সুদৃঢ় সুরে রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের বিরোধিতা করিয়া কবিতার বাঙ্‌মূর্তি ও ভাবমূর্তি আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' (১৯২৫) এখন আর পাওয়া যায় না ; কিন্তু তাঁহার 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ী' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্য তরুণ পাঠকসমাজে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ম মন্তব্য নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার সাধনমার্গ রোমান্স, প্রেম ও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নহে। তবে মাঝে মাঝে বৃহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষাও আছে। সমাজ, নীতি, ভব্যতার সঙ্কীর্ণ পরিসরের বিরুদ্ধে তিনিও বিদ্রোহ করিয়াছেন। কিন্তু জৈব প্রেমের বন্ধন-অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা এবং রোমাণ্টিক আবেগোন্মত্ততা তাঁহার বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশকে বাধা দিয়াছে। ইংলণ্ডের 'ইমেজিস্ট গ্রুপে'র মতো তিনি মনে করিয়াছিলেন, আধুনিক বাংলা কবিতার লালন ও প্রচারে তাঁহার নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। ফলে তাঁহার স্বাভাবিক মনোবিকাশ মারাত্মক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার মনেপ্রাণে রবীন্দ্রপ্রভাব গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি সেই অদৃশ্য বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা তাঁহার কবিজীবনের মস্ত একটা ট্রাজেডি। অবশ্য শেষের দিকে তিনি নিজের স্বচ্ছসুন্দর কবিচেতনাকে 'স্কুল' প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত না করিয়া ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছেন এবং নিজ কাব্যপ্রত্যয়টিকে শান্ত স্নিগ্ধ রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের মধ্যে বিকশিত হইতে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যে রূপ ও রীতির দিক হইতে বুদ্ধদেব খুব কিছু একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন নাই। ডি. এইচ. লরেন্স, বোদলেয়র প্রভৃতি কবিদের কামনাজর্জর প্রেমের আরক্তিম আলোকে তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, কাব্যপ্রকরণকে নানাভাবে পরীক্ষা করিবার ততটা অবকাশ পান নাই। পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব বসু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া শব্দকল্প ও প্রতীকদ্যোতনায় নূতন আঙ্গিক ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন কোন সাম্প্রতিক কবিতায় জীবনের স্থির বিষণ্ণ গভীর আত্মপ্রতীতি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের সুপরিচিত কবিতার কয়েক ছত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

> প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
> নির্মম নির্মাতা মম ! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।
> মনে করি মুক্ত হবো, মনে করি, রহিতে দিবো না
> মোর-তরে এ নিখিলে বন্ধনের চিহ্ন মাত্র আর।
> রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার স্রোতে,
> উপেক্ষিয়া চলে যাই সংসার-সমাজ গড়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকের
> নিষ্ঠুর আঘাত, দাসত্বের স্নেহের সন্তান
> সঙ্কোচের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
> অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র শব্দকল্প সৃষ্টিতে কিছু নূতনত্বের গৌরব দাবি করিতে পারেন। তাঁহার 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্যগুলির আঙ্গিকের দিক দিয়া না হইলেও, অন্তর্নিহিত বৃহৎ মানবতার বাণী বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বুদ্ধদেব অস্মিতার সঙ্কীর্ণতা হইতে প্রায়ই বাহির হইতে পারেন নাই, অপরদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র আপনাকে জগৎকে জীবনচেতনার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। অনেকটা হুইটম্যান-স্পেণ্ডারের আদর্শে তিনি পথচারী মানুষের সাথী হইয়াছেন, ধূলিতলে নামিয়া আসিয়া বুভুক্ষুর ভগবানকে বিশ্বরূপের খোলা হাটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই বলিষ্ঠ প্রাণাবেগ, সূর্যস্নাত ট্রপিক্যাল আকাশবিহার এবং অস্থিশুভ্র মেরুশয্যা জীবনের বৃহৎ ও মহৎ স্বরূপকেই অনাবৃত করিয়াছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র অহংকেন্দ্রিক নীরক্ত রোমান্সের পাণ্ডুরতা হইতে আধুনিক বাংলা কবিতাকে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য একথাও সত্য, তাঁহার চেতনার অগ্নিস্ফুরণের প্রায় সবটাই নাট-মহলের বাহিরের ব্যাপারে; নেপথ্যের সঙ্গে তাঁহার কারবার ততটা জমে নাই। তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ও বাহিরের ব্যাপারকে যতটা গুরুত্ব দিয়াছে, জীবনের গভীর দিকটা ইহাতে ততটা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ কাব্যনির্মিতির দিক হইতে তাঁহার মৌলিকতা কিঞ্চিৎ দুর্বল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার বিখ্যাত কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে:

হতভাগাদের-বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙ্গা জাহাজের ভিড়।—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়ালো অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে;
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়।

বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র মিত্র যাহার সূচনা করেন, তাঁহাদের সমকালে সেই আধুনিকতার সুরটি কয়েকজন কবির মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিক রূপ লাভ করিল যে, আধুনিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয়ের আর অবকাশ রহিল না। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতাকে এমন একটা অভিনব পথে প্রেরণ করিয়াছেন যে, শুধু পাশ্চাত্যের অনুকরণ নহে—তাঁহাদের কবিতায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি প্রথম জীবনে নজরুল ও মোহিতলালের অনুকরণ (যথা—'ঝরাপালক') করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৯)—মোট এই কয়খানা কাব্যগ্রন্থে তাঁহার কবিকৃতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। ইমেজিসম্, সিম্বল ও স্যুররিয়েলিজমের সঙ্গে জীবনের ব্যাখ্যাতীত বিষণ্ণতা, ইতিহাসের মধ্যে পথ খুঁজিবার বৃথা চেষ্টা—চারিদিকে আসন্ন অগ্রহায়ণের শীতার্ত বেদনা জীবনানন্দের কবিতাকে রোমাণ্টিক অনুভূতির বিচিত্র রূপরসগন্ধের প্রতীকে পর্যবসিত করিয়াছে। বিশ শতকের ব্যর্থতা, আকাঙ্ক্ষার অপঘাত এবং পলাতক জীবনের নিঃশেষে উধাও হইয়া যাওয়া জীবনানন্দের কবিচিত্তকে আশাহীন, আনন্দহীন নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় পীড়িত করিয়াছে। মনে হইতেছে, আধুনিক জীবনের সমস্ত দুঃখলাঞ্ছনা ও অতৃপ্তি কবির রোমাণ্টিক দৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বাস্তবের সীমাসংকীর্ণ দেশকাল কবির নভোচারী কল্পনার মুক্তবিহারকে বাধা দিয়াছে; তাই তাঁহাকে দূর অতীত ইতিহাসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংকুচিত দেশকাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিপ্রতীক জীবনানন্দ শুধু কাব্যবস্তুতে নহে, কাব্যনির্মিতিতেও অনন্যসাধারণ। বাক্‌রীতির অভিনবত্ব,—যাহা একদা 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান আক্রমণস্থল হইয়াছিল, তাহা বাহ্যতঃ অসঙ্গত ও উদ্ভট শব্দলীলা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু স্যুররিয়েলিজমে যেমন বস্তুপ্রত্যয় ও বস্তুপ্রতীকের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণাত্মক যোগাযোগ সর্বদা পরিদৃশ্যমান নহে, সেইরূপ জীবনানন্দের রূপকল্প, বস্তুরূপ ও চেতনার রূপ—এই তিনের সঙ্গতির যোগ সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার তাঁহার মন ও মেজাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেই তাঁহার বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং কবিমানসের সঙ্গতি বুঝা যাইবে। জীবনানন্দই আধুনিক বাংলা কবিতার বাণীমূর্তি ও রসমূর্তিকে সত্যসত্যই একটা নূতন আদর্শের অভিমুখে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইতেছে:

> দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
> হিজলের জানালার আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা
> ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
> চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
> নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
> পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) প্রথম কাব্য 'তন্বী' (১৯৩০) তাঁহার কবিমানসের দিক হইতে মৌলিক সৃষ্টি নহে। 'পরিচয়' পত্র সম্পাদনা করিতে গিয়া এবং ইংরাজী-ফরাসী কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে 'অর্কেস্ট্রা'

(১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬) এবং 'দশমী' (১৯৫৬) রচনা করিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যকে আর-একটা নূতন দিক হইতে দর্শন করিয়াছেন। তিনি যেন জীবনানন্দের বিপরীত। সুদৃঢ় পিনদ্ধ শব্দের ক্লাসিক বন্ধন এবং অপ্রচলিত অর্থে শব্দপ্রয়োগের তির্যকতা তাঁহার কবিতাকে দুর্বোধ্য অপবাদ দিয়াছে। কিন্তু শব্দঝঙ্কারে ভীত না হইয়া তাঁহার কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সুধীন্দ্রনাথের চিররোমান্টিক কবিপ্রকৃতির প্রেম ও সৌন্দর্যলোকের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব। শাব্দিক ব্যায়াম, অসঙ্গত অন্বয়ের দুরাভিসার আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার, কখনও-বা সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়কে নূতন অর্থে সম্প্রসারণ তাঁহার কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ। শব্দসম্বন্ধে এরূপ বৈয়াকরণ নিপুণতা এবং শব্দের 'স্ফোটধ্বনি'-সম্বন্ধে শব্দতাত্ত্বিকের মতো তীক্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার কবিতার আকার, আয়তন ও অবয়বকে একটা সুকঠিন মর্মস্তব্ধতা দান করিয়াছে। জীবনানন্দের কবিতায় রূপকল্পের ব্যঞ্জনা অধিক, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাস্কর্যের স্পষ্টতা বেশি। আবেগকে সংহত করিয়া, রসসিন্ধুকে বিন্দুতে পরিণত করিয়া এবং বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত বিশ্বকে হস্তামলকরূপে গ্রহণ করিয়াও তিনি জীবন সম্বন্ধে বিষণ্ণতা বোধ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বশেষ কবিতায় (১৩৬৭ সালের শারদীয়া 'বেতারজগতে' প্রকাশিত) তিনি যেন ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা আসন্ন অন্ধকারের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন। জীবনে প্রেম ও সৌন্দর্যকে কামনা করিয়াও তিনি সীমাবদ্ধ চেতনায় মাথা খুঁড়িয়াছেন। তাঁহার 'শব্দকল্পদ্রুমে'র অন্তরালে একটা বেদনানিষণ্ণ স্বপ্নাভিসারী কবিপ্রত্যয় জাগিয়া আছে,—যে কবিপ্রত্যয় জগৎ ও জীবনকে একটা সমন্বয়ী সূত্রে ধরিতে চাহে, কিন্তু অন্তর ও বাহিরের গরমিলের জন্য সেই সূত্রটার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ—আধুনিক বাংলা কাব্যের দুই দিকপাল ; একজন ভাঙনের তীরে বসিয়া ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ধ্বসিয়া পড়া দেখিয়াছেন, আর একজন চিন্তা ও মননের প্রাচীর তুলিয়া সেই ভাঙন রোধ করিতে চাহিয়াছেন। দুইজন দুইদিক হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যকে নূতন প্রাণরসে পূর্ণ করিয়াছেন। একজনের (জীবনানন্দ) বিরুদ্ধে অভিযোগ—ভাবের দুর্বোধ্যতা, আর একজনের (সুধীন্দ্রনাথ) বিরুদ্ধে অভিযোগ—ভাষাপ্রয়োগের চেষ্টাকৃত দুরূহতা। কিন্তু সজাগ মনে তাঁহাদের কবিতা আস্বাদন করিলে তাহা ততটা দুর্বোধ্য মনে হইবে না। জীবনানন্দের দুই-একটি কবিতা বাদ দিলে আর সমস্তই ইন্দ্রিয়জ চেতনা ও বুদ্ধির সঙ্গতির মধ্যে ধরা দিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষার দুর্বোধ্যতা একটা ছদ্মবেশ মাত্র। এই ছদ্মবেশটা কোনও প্রকারে সরাইয়া ফেলিলেই আমরা দুর্ধর্ষ সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেও একটি প্রেমিক সৌন্দর্যলিপ্সু কবিসত্তাকে পাইব, যাহার একদিকে নিশ্ছিদ্র বুদ্ধিবাদ, আর-একদিকে সরস হৃদয়াবেগ। সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আপন অন্তরের অন্তঃপুরেই আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার কবিতা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

নিবে গেল দীপাবলী ; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
শুদ্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী,
নম্রকণ্ঠে মরমী আহ্বান ; জাগিল বিনম্র সুরে
কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে
সমাসক্ত নাগর নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকম্পিল
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো। গাঢ় হাস্য প্রণয়ের
একান্ত প্রলাপ লজ্জা পেল সাধারণ্যে। আচম্বিতে
সচেতন প্রতিবেশিনীর পিঙ্গল কুন্তল থেকে
নামহীন রতিপরিমল পরদেশী সঙ্গীতের
মুগ্ধ সমর্থনে মোর চিত্তে সহসা জাগায়ে দিল
অতিক্রান্ত উৎসবের নিরাধার সম্মোহ আবার।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে (১৯০৯) এবং শ্রীযুক্ত সমর সেন (১৯১৮)—দুইজনেই ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ মনোবেদনার সীমা ছাড়িয়া দেশ ও সমাজ, মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি-অপমান, নাগরিক জীবনের অভিশাপ—সর্বোপরি অনাগত জীবনের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪০), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) এবং সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০) 'নানা কথা' (১৯৪২), 'তিনপুরুষ' (১৯৪৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে দুইজনের কবিপ্রত্যয় মোটামুটি বুঝা যাইবে। বিষ্ণু দে প্রথম জীবনের বৃহৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কস্‌বাদী হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরে আবার রোমান্সের জগতে স্থায়ী আসন পাতিয়াছেন। আসলে তিনিও জন্মরোমান্টিক ; মাঝখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁজে তিনি রাজনীতির চোরাবালিতে প্রায় ডুবিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা তিনি আবার হারানো সুর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার কবিতাও কম দুর্বোধ্য নহে ; কিন্তু শাব্দিক দুরূহতা বা ভাবের অস্পষ্টতা সেই দুর্বোধ্যতার একমাত্র কারণ নহে। তিনি মাঝে মাঝে কবিতার প্রচলিত রীতি ও অন্বয়ের পারিপাট্য ততটা মানিয়া চলেন নাই, অবচেতন মনের অন্তস্তলে গাহন করিয়া আপাতঅসঙ্গতির মধ্যে যথার্থ সঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সে আবিষ্কার কবিতার বাণীরূপে ধরা পড়ে নাই ; কবিতায় তাই একটি পংক্তির সঙ্গে অন্য পংক্তির বাহ্য সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সর্বোপরি কবি সঞ্চরণশীল প্রতিভার সাহায্যে বিশ্বের ইতিহাস ও পুরাণকথার মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করিয়াছেন যে, অনেক সময় পাঠক দ্রুতধাবমান কবির রূপকল্পের স্পষ্ট হদিশ পায় না। তবে সম্প্রতি তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গিমার উৎকট আতিশয্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। প্রথমযুগে রচিত তাঁহার একটি বিশিষ্ট কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমরা চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?
দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি,
হৃদয়ে আমার চড়া।

যদিও কবি আধুনিক জনসমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোলে দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে অভিলাষ করিয়াছেন, তবু জীবনানন্দের মতো তাঁহারও কবিচেতনায় একটা ছায়াধূসর প্রত্নপৃথিবী রহস্যময় হাতছানি দিয়াছে। সেই দিক দিয়া তাঁহার এই কয়ছত্র আশ্চর্য রহস্যময়তা সৃষ্টি করিয়াছে ঃ

চলো যাই, হে চূড়ালা, বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোণার্ক বন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা বঙ্গোপসাগরে
জাভাতে বলীতে মার্তাবানে ওদেশায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশকোটির প্রাণে দোলে।

কবি জনতার জীবনে জীবন যোগ করিতে চাহিলেও রোমান্সকে নিজ কবিধর্ম হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সমর সেন গোড়া হইতেই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা ভাঙাচোরা কুশ্রী কর্কশ কলহকে গদ্যের নিরাভরণ শুষ্ক বাক্‌রীতির সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিও মানুষের কল্যাণ কামনা করেন, জনতার জীবনের সঙ্গেই তাঁহার পরম মিতালি। তাই ম্লান মধ্যবিত্ত জীবন এবং অন্তঃসারশূন্য নেতৃত্বের ফাঁকা বুলির প্রতি তাঁহার অসীম অশ্রদ্ধা। তাঁহার কবিতায় বেসুরা জীবনটা ঢিলা তারের বেহালার সুরের মতো একটা কর্কশ তীক্ষ্ম বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদ জাগাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার রোমান্টিক ছত্রকে ব্যঙ্গাত্মক শুষ্ক কঠিন বাক্‌নির্মিতিতে ব্যবহার করিয়া তিনি এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা ঃ

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর, হে ধূসর শহর !
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর !
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর, হে ধূসর শহর ।

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'পারাপার' প্রভৃতি কাব্যে একদিকে যেমন বর্তমান জীবনের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেম, সৌন্দর্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবনের প্রতি তাঁহার অন্তরের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'পারাপার' কাব্যের শেষ কবিতাটি তাঁহারই অন্তর্জীবনের বাণী বহন করিতেছে :

এপারে ওপারে, বন্ধু, হয়তো ওপারে,
সব মিলে এক হওয়া মোহানায় দুই নদী মেলে,
হে মহাসমুদ্র, তুমি সব ঢেউয়ে এক ঢেউ দোলে
অবিরাম জীবনের তৃপ্তি দাও অনিঃশেষ প্রেম।
আনন্দের তরঙ্গের দুঃখঘাত তটে তটে লাগে
বুকে বুকে সংসারের এই ছোঁওয়া এই দূরে কাঁদা,
মিলনের প্রান্তে ঢাকা, নীলের কান্তার, তুমি এসো,
মিশে যাওয়া সর্ব তুমি, অকম্পিত আকম্পিত তুমি।
এসো জীবনের সেই ধুলোর প্রত্যয়ের দেখা আভা,
যার দীপ্তি এসেছিল চোখে চোখে বক্ষে বক্ষ ঘিরে।

একালের কবি হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং পরলোকগত সুকান্ত ভট্টাচার্য বলিষ্ঠ জীবনধর্ম লইয়া কবিতায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যদিও রাজনীতি ও প্রচারধর্মিতার রক্তিমা প্রবল, তবু তাঁহার শিল্পের রীতিটি চমৎকার—ইদানীং তিনি আবার কবিতার মর্মরসে অনুপ্রবেশ করিয়া জীবনরহস্যের দ্বিতীয় দিগন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। সুকান্তের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর লিপি-কুশলী কবিমানস বর্তমান ছিল। রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতার ঘটনাবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবিকিশোর সুকান্ত জন্মলব্ধ কবিপ্রকৃতির পূর্ণ ঐশ্বর্য দান করিয়া যাইতে পারেন

নাই। ইদানীং নানা পত্রপত্রিকায় অসংখ্য কবির আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা সকলকেই নব্যতন্ত্রের পথিক; নিত্যনূতন আঙ্গিক নির্মাণেই ইঁহাদের কবিপ্রতিভার প্রায় সবটা অপব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য কবির ভিড়ে ভালোমন্দ চিনিয়া লওয়াই দুষ্কর। গত এক দশকের নবীন কবিদের অসংখ্য কবিতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ গতায়ু হইলেও আশঙ্কার কারণ নাই। অবশ্য এই সমস্ত তরুণদের রচনা কতটা ধোপে টিকিবে, তাহা অবশ্য চিন্তার কথা। ঈষৎ পুরাতনপন্থী হইয়াও সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইয়াছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতা রূপ ও রীতির দিক দিয়া নূতন পথে যাত্রা করিলেও অতি সম্প্রতি ইহার বেগ কিছু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ গতায়ু, বিষ্ণু দে চিররোমান্টিক পাখায় ভর করিয়াছেন, অমিয় চক্রবর্তী কিছু স্তব্ধগতি, বুদ্ধদেব কাব্য রচনায় পূর্বের মতো উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মৌলিকতার দিক হইতে এখন শূন্যভাণ্ডার। অবশ্য তাই বলিয়া নবীন কবির দল চুপ করিয়া বসিয়া নাই; নিত্যই রাশি রাশি কবিতা লেখা হইতেছে, ছাপা হইতেছে এবং পড়াও হইতেছে। কিন্তু কাহারও মধ্যে বড়ো একটা নূতন আবির্ভাবের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাইতেছে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লওয়া ভাল। ১৯৩০ হইতে ১৯৭০ সাল—দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রচুর আধুনিক কবিতা রচিত হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত মুষ্টিমেয় কাব্যরসিকের সঙ্গেই ইহার যোগাযোগ; সমগ্র জাতিমানসের সঙ্গে ইহার কতটুকু যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যকে ছাড়িয়া ইংরাজী বা ফরাসী কবিতার ধাঁচে বাংলা কবিতা লিখিলে তাহার সঙ্গে সমগ্র দেশের যোগ না থাকাই সম্ভব। এরূপ সাহিত্য ড্রইং রুমের দোদুল্যমান অর্কিডে পরিণত হয়, তারপর তাহার স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। ইদানীং আবার দৈনিক, সাপ্তাহিক—এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবিতা ("কবিতা ঘণ্টিকী") প্রকাশিত হইতেছে এবং মহাকালের সম্মার্জনীস্পর্শে যথাস্থানে মহাপ্রয়াণ করিতেছে। বাঙালী চিরকালই হুজুগে মাতিতে মজবুত। আধুনিক কবিতা লইয়া সেইরূপ হুজুগের হাওয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাংলা কবিতার কতটুকু জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে, কতটুকু-বা কবি ও তাঁহার শিষ্যদের ব্যক্তিগত 'রসচর্বণা'য় পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।*

নাটক ও নাট্যাভিনয় ॥

যুদ্ধোত্তর কালে নাটকের গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস পাইলেও বিষয়বৈচিত্র্য, অভিনয়-নৈপুণ্য এবং অভিনব নাট্যকলার চমৎকারিত্ব আধুনিক দর্শকের মনোরঞ্জন করিতেছে।

* অনেক দিন পূর্বে এ-কথা লিখিয়াছিলাম। আজ অর্ধ শতাব্দীর পরে (১৯৩০-১৯৮০) বাংলা কাব্য-কবিতা একটি স্থায়ী ট্র্যাডিশনে পরিণত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অবশ্য পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এখনও পুরাতন নাটক, পুরাতন আদর্শের নূতন নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ, সমাজসমস্যার আবেগাপ্লুত বর্ণনা—এই সব লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের নানা কলাকৌশল, আলোকসম্পাত, খাঁটি বাস্তব সাজসজ্জা ইত্যাদি ব্যাপার য়ুরোপের অবিকল অনুকরণে নবরূপ লাভ করিতেছে। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের যে খুব একটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে! কেহ কেহ মনে করেন যে, চলচ্চিত্রের অতিপ্রাধান্যের জন্য নাটকের উৎকর্ষের হানি হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র চলচ্চিত্রের ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং অভিনয়কলা ও নূতন নাটক পাশ্চাত্ত্যে উচ্চতর রসপরিবেশনে অধিকতর সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে অক্ষম নাট্যপরিচালক ও অর্থলোলুপ কর্তৃপক্ষ সিনেমার উপর বরাত দিয়া নিজেদের ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ভালো নাটক বাদ দিয়া, প্রতিভাবান নাট্যকারকে অবহেলা করিয়া শুধু জনচিত্তরঞ্জনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোকসম্পাত, বাস্তব ধরনের হুবহু 'সেট' নির্মাণ, যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চেই রেলস্টেশন, ট্রেন, খনির দৃশ্য, কারখানার অভ্যন্তর, জাহাজ, সিনেমার স্টুডিওকক্ষের আয়োজন করা হইতেছে। কিন্তু সবই শূন্যগর্ভ ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে। বহু রজনী ব্যাপিয়া অভিনয় হইলেও তৃতীয় শ্রেণীর নাটক ক্ষণিক জনপ্রিয়তার পর বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে; যান্ত্রিক কারিকুরি দীর্ঘকাল দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। অবশ্য 'গিরিশ নাট্যপরিষদ', 'বহুরূপী'-সম্প্রদায়, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, 'রূপকার', ভারতীয় গণনাট্যসংঘ, বঙ্গীয় শেকস্‌পীয়র পরিষদ, 'শৌভনিক', নান্দীকার, থিয়েটার সেন্টার প্রভৃতি প্রগতিশীল ও অভিজাত নাট্যসম্প্রদায় পেশাদারী নাটমঞ্চের কবল হইতে নাটক ও অভিনয়কে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মৌলিক নাটকের দিক হইতে ইঁহারাও খুব একটা সুরাহা করিতে পারিতেছেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে এবং তাহার পরে বাংলাদেশের উপর দিয়া যে ভাঙনের স্রোত বাহিয়া গিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দুর্ঘটনা এত ব্যাপক আকারে দেখা দেয় নাই। ফলে সাম্প্রতিক নাট্যকারগণ সমাজ-জীবনের নানা সমস্যা লইয়া নূতন বলিষ্ঠ সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন'—১৯৪৪), দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ('অন্তরাল', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা ইত্যাদি), তুলসী লাহিড়ী ('ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'পথিক' ইত্যাদি), সলিল সেন ('নতুন ইহুদী')—ইঁহারা বর্তমান সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম, দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি মর্মন্তুদ ব্যাপারকে নাটকে রূপায়িত করিয়া আবেগ-তরল করুণরসের স্থলে সমাজের আঘাতে মানুষের নিদারুণ ব্যর্থতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সম্প্রতি ধনঞ্জয় বৈরাগী কয়েকখানি নাটকে এই দুঃখহত জীবনকেই নানা দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজপরিপ্রেক্ষিত, বাস্তব জীবনচিত্র, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমার সাহায্যে আধুনিক মানুষের জীবনদ্বন্দ্ব

এবং নৈরাশ্যের মধ্য হইতে নূতন আশালোকে যাত্রা—এই বিষয় লইয়া ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। নানা সমস্যার বাস্তব রূপকে ইঁহারা আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিলেও এখনও এমন একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই যাহা সমগ্র জাতির প্রাণপ্রতীক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সমস্যার বাস্তবতা ইঁহাদিগকে এমন আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, নাটক যে সর্বোপরি বহুকালস্থায়ী শিল্পরূপ, তাহা তাঁহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই যখন যে সমস্যা সমাজে প্রবল হইতেছে, তখন তাঁহারা সেই সমস্যাকে নাটকের আকারে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতেছেন। উৎকৃষ্ট অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের কলাকৌশলের গুণে কোন কোন নাটক বেশ কিছুকাল নাটমঞ্চ জমাইয়া রাখিতেছে; কিন্তু তারপরেই জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতেছে। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মঞ্চসফল নাটক লোকচক্ষুর বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। গল্‌সওয়ার্দি ইংলণ্ডের নানা সমস্যা লইয়া নাটক লিখিয়াছেন; কিন্তু সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার নাটকের একটা বৃহৎ সার্বজনীন আবেদন আছে—যাহা শুধু একটা সীমাবদ্ধ কালকে ঘেরিয়া গড়িয়া উঠে না। এই বৃহৎ আবেদন বর্তমান কালের বাংলা নাটকগুলিতে শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। তাই নাটমঞ্চের যত কলাকৌশল বাড়িতেছে, ততই নাটক ও নাট্যসাহিত্যের অবনতি হইতেছে। উপরন্তু অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটক কলিকাতার নাটমঞ্চের উপযোগী করিয়া রচিত হয়; কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে এই সমস্ত নাট্যাভিনয় রীতিমত দুরূহ হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা হয় পরিবর্তিত হইয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়ে, আর না-হয় সরাসরি পরিত্যক্ত হয়। এখনও পল্লী অঞ্চলে 'জনা', 'কর্ণার্জুন', 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মিশর-কুমারী', 'আলিবাবা' মহাসমারোহে অভিনীত হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক নাটক সেই অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। শুধু বিষয়বস্তুর দুরূহতার জন্য নহে, দিন দিন বাংলা নাটকের মঞ্চনির্দেশ যেরূপ জটিল ও যান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে গ্রামাঞ্চলে ঐ সমস্ত নাটকাভিনয় সম্ভব নহে। অভিনয়কলাকে সরল, লঘু ও বাহুল্যবর্জিত না করিলে কলিকাতায় নাট্যাভিনয় খুব জমিয়া উঠিলেও কলিকাতার বাহিরে যে বিরাট দেশ পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে এই ধরনের নাটক সহজে অভিনীত হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।* সম্প্রতি তরুণ নাট্যকারগণ (উৎপল দত্ত, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, বাদল সরকার, বার্ণিক রায়, রমেন লাহিড়ী, সুশীল মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ গুহ-নিয়োগী, রতন ঘোষ), কেহ সামাজিক দুর্গতিকে কেন্দ্র করিয়া, কেহ স্লোগান-সর্বস্ব রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া, কেহ-বা অবচেতনার সাংকেতিকতার

* সম্প্রতি নানা যাত্রার দল শহর ও গ্রামে 'থিয়েট্রিকাল' যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া মধ্যম শ্রেণীর জনরুচিকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই ধরনের ব্যবসায়ী-বুদ্ধি-তাড়িত অনুষ্ঠান সত্যকারের অভিনয়ের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর শিল্পরুচিকে বিপথে লইয়া যাইবার মূল দায়িত্ব হইতে যাত্রার দলকে কিছুতেই অব্যাহতি দেওয়া যায় না।

সাহায্যে জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য কিছুকাল অতিক্রান্ত না হইলে ইহার যথার্থ মূল্য স্থির করা যাইবে না।

কথাসাহিত্যে আধুনিকতা ॥

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র নব দিগন্ত আবিষ্কার করিলেও আরও কয়েকটি অভিনব বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হইবে। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' মুষ্টিমেয় রস-বিলাসীর মধ্যে প্রচারিত ছিল বলিয়া অর্থনৈতিক কারণে ইহার আয়ুষ্কাল ক্ষীণতর হইয়া আসিল। 'পরিচয়' যখন নবপর্যায়ে মাসিক আকারে বাহির হইল, তখনও কিছুকাল ইহার সাংস্কৃতিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিখ্যাত পত্র বিশেষ ধরনের দর্শন ও মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের পরিচালনাধীনে যখন নব কলেবরে বাহির হইল, তখন ইহার পুরাতন রূপ মুছিয়া গিয়াছে। গোত্রান্তর হইবার ফলে ইহার মনের চেহারা বিলকুল বদলাইয়া গেল। মার্ক্সীয় দর্শনকে পুরোধা করিয়া যাঁহারা 'পরিচয়'-গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদী হালদার মহাশয় দ্বান্দ্বিক দর্শনের নিরিখে জীবন ও সংস্কৃতির মূল রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন ('সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ')। এখানে তাঁহার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মতামত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু তাঁহার 'একদা' (১৩৪৬) উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের বলিষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রচারধর্মের বাহুল্যের জন্য তাঁহার কোন কোন উপন্যাস একটা বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকায় যতটা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, কিছু কালাতিক্রমণের পর ইহাদের আর সেরূপ জৌলস থাকে না। 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর অনেকেই অত্যন্ত শক্তিমান লেখক; ইদানীন্তন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বাঙালীর জীবনচিত্র, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি নানা সমস্যাকে ইঁহারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাস কত দিন টিকিয়া থাকিবে, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ শুধু সমস্যার গুরুত্বই সাহিত্যকে দীর্ঘজীবী করে না।

এই প্রসঙ্গে সদ্য লোকান্তরিত সুবোধ ঘোষের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ছোটগল্প ও উপন্যাসে আশ্চর্য কারুকলা ও জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি এমনভাবে ফুটাইয়াছেন যে, নবীন-প্রবীণ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়িবে। বোধহয় ছোটগল্পেই তাঁহার প্রতিভা অধিকতর সার্থক হইয়াছে।

অধুনা একদিকে যেমন সাম্প্রতিক বাংলার ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত জীবনের ব্যর্থতা উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে পুরাতন ও অনতিপুরাতন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসের বৃহৎ কলেবর গঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'বেগম মেরী বিশ্বাস',

রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীলভুঁইয়া', প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা,' শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার', 'অমাবস্যার গান', প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'জব চার্ণকের বিবি' নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিকায়* দৈনন্দিন জীবনের জটিল চিত্র এই উপন্যাসগুলিকে এমন একটা বিশালতা দিয়াছে, যাহা হয়তো অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রে এত অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না। এই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদ-সঞ্চার' (দুই খণ্ড) পাঠক সমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর এক শ্রেণীর উপন্যাসের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজিকার বাংলা উপন্যাসের সীমা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু মণীন্দ্রলাল-বুদ্ধদেবের ড্রয়িংরুম-রোমান্স্ নহে, বা 'যুবনাশ্বে'র 'পটলডাঙার পাঁচালী'তে বর্ণিত কলিকাতার বাস্তব জীবনের কলিপত্ত কাহিনীও নহে; কলিকাতার বাহিরে যে বৃহৎ দেশ ও সমাজ পড়িয়া আছে, তাহার বাস্তবানুগ বর্ণনা, চরিত্র ও কাহিনী বাংলা উপন্যাসের স্বাদ ফিরাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী', 'সিন্ধুপারের পাখী', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলাদেশ ও বাংলার বাহিরের যে বিরাট পটভূমিকা ব্যবহৃত হইয়াছে, উপন্যাসের গঠনে তাহা বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। বিভূতি-ভূষণের রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে যথাসম্ভব বাস্তবাভিমুখী করিয়া ইঁহারা উপন্যাসের সীমাকে অনেকটা সম্প্রসারিত করিয়াছেন। আরও কয়েকজন তরুণ ঔপন্যাসিক মনোলোকের গভীর গহ্বরে সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়া মানবজীবনের বিচিত্র ভাবানুষঙ্গ ও কূটৈষণা (complex), মনোবিকার, আচরণ ইত্যাদিকে আরও একটা গভীর দিক হইতে দেখার চেষ্টা করিতেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষ ঘোষ—ইঁহারা ফ্রয়েডীয় ও উত্তর-ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানকে মনোজীবন বিশ্লেষণে নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের দুঃসাহসকে রুচিবাগীশের দল নিন্দা করিয়া থাকেন। অসামাজিক, অবক্তব্য, রুচিবিরোধী জীবনের নিষিদ্ধ প্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া তরুণ ঔপন্যাসিকের দল ব্যাপ্তিকে বাদ দিয়া গভীরতার অতলে আত্মগোপনপ্রয়াসী। তাঁহাদের এই অভিনব প্রচেষ্টা কত দূর স্থায়ী হইবে, তাহা এত শীঘ্র বুঝা যাইবে না। তবে একটা কথা প্রণিধানযোগ্য—ইঁহাদের ছোটগল্পগুলি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যতটা সার্থক হইয়াছে, উপন্যাসে ততটা সার্থক হইতে পারে নাই।

সম্প্রতি 'অবধূত' এই ছদ্মনাম লইয়া এক লেখক খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' প্রায় রাতারাতি লেখককে খ্যাতির তোরণ-

* সম্প্রতি কেহ কেহ বৈচিত্র্য সৃষ্টির ইচ্ছায় ইতিহাসের পটভূমিকায় অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভা: স্বল্পতার জন্য এই প্রচেষ্টা আদৌ সার্থক হইতে পারিতেছে না।

-বারে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুৎসিত বর্ণনা আর ঘৃণ্য জুগুপ্সার ভেজাল দিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস লিখিতেছেন, এক শ্রেণীর পাঠকসমাজে তাহার প্রচার থাকিলেও রসিক পাঠকগোষ্ঠী ক্রমেই এই সমস্ত সাহিত্যিক 'স্টাণ্ট' হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন। অবধূত জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সে অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে রুচি-বিরোধী কদর্য হইলেও তাঁহার রচনার মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষী মাদকতা আছে, যাহা নিষিদ্ধ বস্তুর মতো প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই রসের মাতলামি কাটিয়া গেলে অবধূতের ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া যায়। জীবন সম্বন্ধে তিনি খানিকটা সংশয়ী ও নাস্তিক্যবাদী, খানিকটা উদাসীন। তাহার সঙ্গে আছে ক্লেদাক্ত জীবন ও নিষিদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ। তাই ক্ষণিকের জন্য আসর জমাইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি সমরেশ বসুর তিনখানি উপন্যাস ('বিবর', 'প্রজাপতি' এবং 'পাতক') লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন উঠিয়াছে। লেখক বিনা প্রয়োজনে, শিল্পকে নষ্ট করিয়া এই সমস্ত রচনায় অনাবশ্যক অশ্লীলতার আমদানি করিয়াছেন—এইরূপ অভিযোগ উঠিয়াছে। এ বিষয়ে মতামত দিবার এখনও সময় হয় নাই। তবে শ্রীযুক্ত বসু যে একজন শক্তিশালী ভাষ্যকার তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

সাম্প্রতিক ছোটগল্পেও নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। একদিকে নিম্নতলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং আর একদিকে মানবজীবনের গভীর রহস্যতলে অবতরণ করিয়া আধুনিক গল্পলেখকগণ বিস্ময়কর রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন ছোটগল্পের আকার, আয়তন ও রচনাকৌশল লইয়াও নানা পরীক্ষা চলিতেছে। ইতিপূর্বে বাংলা ছোটগল্পে কাহিনী, চরিত্র, নাটকীয়তা, লিরিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ছোটগল্প ক্রমে ক্রমে সংকেতধর্মী ও স্যুররিয়ালিস্টিক (পরাবাস্তব) হইয়া উঠিতেছে এবং চেতনমনের সংগে বহির্জগতের কারবার ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। আধুনিক গল্পলেখকগণ মনে করেন, ছোটগল্পের কাহিনী-প্রাধান্য খর্ব হইবার দিন আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত বিমল কর এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষ ঘোষ এই নূতন রীতিটিকে নানাদিক হইতে দেখিবার এবং দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ বাংলাদেশের ছোটগল্প বিশ্বের ছোটগল্প-আন্দোলনের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কয়েকজন নবীন লেখক প্রতীক-সংকেতের সাহায্যে ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা চমকপ্রদ অভিনবত্ব আনিতে অভিপ্রয়াসী। ইঁহাদের মধ্যে ঈষৎ বয়োজ্যেষ্ঠ কমল মজুমদার (সম্প্রতি লোকান্তরিত) এবং তরুণ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, সুনীল গংগোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, সুশীল রায়, মতি নন্দী প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে কথাসাহিত্যের রূপ, রীতি ও ভাববস্তু লইয়া যে সমস্ত অভিনব গবেষণা চলিতেছে, ইঁহারা বহুলাংশে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। অবশ্য ইঁহাদের কাহারও কাহারও জীবনভঙ্গিমার দুর্জ্ঞেয়তা, প্রতীকীকরণের সূক্ষ্মতা,

জীবনের প্রতি অপরিণামী নৈরাশ্য, নিষিদ্ধ কামনার প্রতি লোলুপ আসক্তি এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে কতদূর সার্থক হইবে, বাংলার জাতিমানসের সংস্কার তাহাকে কতটা গ্রহণ করিবে—এখনও সে বিষয়ে কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসে নাই। সে যাহা হউক, ভারতের ছোটগল্পের মধ্যে বাংলা ছোটগল্পই প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত সাধারণ ধরনের গল্পলেখকও মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য গল্প লিখিতেছেন যে, বিস্মিত হইতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং পশ্চিমী ছোটগল্পের সমতুল্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধনিবন্ধ ॥

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ ও চিন্তামূলক রচনার প্রাচুর্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও নূতন তথ্যের দ্বারা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। অনেকে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে অনেক মৌলিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতেছেন এবং বাংলা ভাষাতেই সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোক-সাহিত্য', রাধাগোবিন্দ নাথের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ইতিহাস', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' প্রভৃতি গ্রন্থ এ যুগের বিশিষ্ট সম্পদ। অবশ্য ইঁহাদের অনেকের গ্রন্থের সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই হইয়াছিল। ইদানীং বাংলা সাহিত্যের অনেক গবেষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া চিন্তাশীল রচনার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য এই ধরনের গবেষণাগ্রন্থ তথ্যভারে বোঝাই হইয়া এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে যে, সাহিত্যের গবেষণা একটা ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ ও সংস্কৃতির বিচার করিয়াছেন—যেমন, বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি'। বহু পরিশ্রম ও নিপুণ গ্রন্থনকৌশল সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের বিশাল গ্রন্থটি সাংবাদিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কোন কোন আধুনিক সমালোচক সমালোচনা-সাহিত্যকেও আধুনিক বিশ্বের সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে একাসনে স্থাপন করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, যেমন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে। ইঁহারা অ্যাকাডেমিক পন্থা ত্যাগ করিয়া রসবোধ ও গভীর চিন্তাপ্রণালীর পক্ষ হইতে সাহিত্য-বিচার করিয়াছেন। ইদানীং অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় প্রগতিশীল মত প্রচার করিয়া পুরাতন মূল্যবোধকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত গোঁড়ামি এবং দেশীয় ঐতিহ্যের

প্রতি অশ্রদ্ধার জন্য তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং য়ুরোপীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান বাংলা নিবন্ধসাহিত্যে যথার্থ ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছে না। সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান, ইতিহাস* ও দর্শন লইয়া হাল্কা চালে এবং পাঠ্যবহিরূপে কিছু কিছু লেখা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার গুণগত ঐশ্বর্য ও পরিমাণগত প্রাচুর্য উভয়ই অতি ক্ষীণ। এই প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। চিন্তাজগতে স্বেচ্ছাবিহারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী এতদিন ইংরাজী ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দেশ-বিদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে এখন তিনি বাংলা ভাষায় অত্যন্ত তীব্র, স্পষ্ট ও বিতর্কসঙ্কুল ব্যাপারের অবতারণা করিয়া সাহিত্যসমাজে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আবু সৈয়দ আইয়ুবের সাহিত্যবিষয়ক রচনাও মননশীল মনস্বিতায় পূর্ণ, তাহা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

সর্বশেষে গদ্যরচনা সম্পর্কে আর একটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইদানীং 'রম্যরচনা' নামক একপ্রকার লঘুধরনের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছে। একদা বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে (১৯৩৫) ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সার্থক নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশে গদ্যাত্মক রচনা একটা বিচিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। যে-কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টিল, অ্যাডিসন, গোল্ডস্মিথ এবং উনবিংশ শতাব্দীর চার্লস্ ল্যাম্ব্ অপূর্ব ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই আদর্শকে যথেষ্ট তরল করিয়া বাঙালি লেখকগণ চিন্তাভীরু পাঠকের রুচিকর করিয়া তুলিতেছেন। 'যাযাবর', 'রঞ্জন', মুজতবা আলি, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল রায়, 'রূপদর্শী'—ইঁহারা নানাধরনের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, লঘুচটুল বৈঠকী গল্পকাহিনী লিখিয়া পাঠক-সমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ জীবিকা অবলম্বনে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গল্পাশ্রয়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর ('কত অজানারে', 'চৌরঙ্গী'), জরাসন্ধ ('লৌহকপাট', 'তামসী'), আনন্দকিশোর মুনশী ('ডাক্তারের ডায়েরী')' সুকন্যা ('খড়ির লিখন'), ধীরাজ ভট্টাচার্য ('যখন পুলিশ ছিলাম', 'যখন নায়ক ছিলাম—') ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপজীবিকার বর্ণহীন ঘটনাকে ব্যক্তিচিত্তের রসে ডুবাইয়া অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে 'জরাসন্ধ' ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে নিছক গল্প জমাইবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শঙ্করের 'কত অজানারে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের লেখক আদালতের বিবর্ণ নথিপত্রে স্পন্দমান

* তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং 'সুকন্যা' ইতিহাসকে রমণীয় কাহিনীর আকারে পরিবেশন করিয়া একপ্রকার নূতন ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তপনমোহনের 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'পলাশীর পর বক্সার' এবং সুকন্যার 'নূরজাহান', 'ক্লিয়োপেট্রো', 'কুমারী রাণী এলিজাবেথ' ও 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলেও রচনার গুণে উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'ঝাঁসীর রাণী' সুষ্ঠু ঐতিহাসিক গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানবজীবনের সন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাকে স্নেহ-বেদনার রমণীয়তার মধ্যে অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা অতিশয় দুরূহ, এমন কি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার চেয়েও দুরূহ। জীবন সম্বন্ধে উদার, গভীর ও ব্যাপক ধারণা না থাকিলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একেবারেই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, এবং বক্তব্যবিষয় বাষ্পীভূত হইয়া উবিয়া যায়। কখনও-বা লঘুচিত্ত পাঠকদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে হয় বলিয়া উক্ত রচনাকারগণ বক্তব্যের সুরকে অত্যন্ত নামাইয়া আনেন। ইহার আর একটা ত্রুটি, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অতিপ্রাধান্যের ফলে চিন্তার শিথিলতা ও বক্তব্যের অগভীর তরলতা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তার পরে কোন গভীর চিন্তামূলক রচনা জমিতে চায় না। পাঠকের মনটাও সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া টপ্‌পা-ঠুংরী চালে হালকা রসে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, কোন গুরুগম্ভীর ব্যাপারে পুরাপুরি বুদ্ধিকে নিয়োগ করিতে পারে না। সম্প্রতি তথাকথিত 'রম্যরচনা'র বাড়াবাড়ির ফলে বাঙালীর চিন্তার জগতে কিছু শিথিতা ও দুর্বলতা দেখা গিয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক রম্যরচনায় মাতিয়া উঠিলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 'রম্যরচনা' ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের খেয়ালখুশির ফলে বাংলার চিন্তাশীল সাহিত্যে সংকট দেখা দিয়াছে।*

সাম্প্রতিক সাহিত্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে একথা না মানিয়া উপায় নাই যে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো বহুব্যাপক একক-প্রতিভার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যেও একনায়কত্বের অবসান হইয়া আসিতেছে। একজন-বঙ্কিম, একজন-রবীন্দ্রনাথের স্থলে মাঝারি ধরনের অসংখ্য লেখকের আবির্ভাব এই যুগের গণতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজে সম্ভব হইয়াছে। ঈষৎ পুরাতন যুগে বৃহৎ বনস্পতি ফল দিয়া, ছায়া দিয়া, আশ্রয় দিয়া বহু সারস্বত বিহঙ্গকে লালন পালন করিয়াছে। এখন সে বনস্পতির মূলোৎপাটিত হইয়াছে: ছোট ছোট লতাগুল্মের শাখায় শাখায় অসংখ্য বিহঙ্গের কূজন শুরু হইয়াছে। এ যুগে স্বল্পসংখ্যক একক প্রতিভার দিন গিয়াছে, বহু সংখ্যক মাঝারি প্রতিভা সাহিত্যপ্রাঙ্গণে ভিড় করিতেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়া মাঝারি প্রতিভার বাহুল্যে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি কতদূর লাভবান হইবে, তাহা কাল বিচার করিবে।

---

* এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "যাঁরা কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস কিছুই লিখিতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য, সংহতি রক্ষা ক'রে কোন বিষয়ে এক দণ্ড চিন্তা করতে, বা পরম্পর দুটো বাক্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবগুণে অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধৃত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না 'রম্যরচনা' শব্দটির সৃষ্টি হ'তো।"—'কবিতা' ২৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

পরিশিষ্ট

ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কালপঞ্জী

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—বিংশ শতাব্দী মধ্যভাগ

১৭৪৩	পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা গদ্যের অনুশীলন ; মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও প্রণীত (১) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩), (২) *Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez* (১৭৪৩) লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত দোম আন্তোনিও (বাঙালী খৃষ্টান) প্রণীত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' মুদ্রিত হয় নাই, ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে রচিত।
১৭৫৭, ২৩শে জুন	পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৬৫	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ।
১৭৭৪ (১৭৭২) ...	রামমোহন রায়ের জন্ম।
১৭৭৮	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হলহেডের *The Grammar of the Bengal Language* প্রকাশ।
১৭৮৪	উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত—প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষার প্রথম সংযোগ।
১৭৯৩	লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) প্রবর্তন ; উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমন।
১৭৯৫	রুশীয় পর্যটক হেরেসিম লেবেডেফ কর্তৃক কলিকাতায় দুইখানি বাংলা (অনুদিত) নাটকের অভিনয় প্রযোজনা।
১৮০০	শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা ; বাইবেলের কিয়দংশের ('মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' অর্থাৎ St. Matthew's Gospel) অনুবাদ ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮০১	ডেভিড হেয়ারের আগমন ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরীর বাংলা ও সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান রূপে যোগদান ; শ্রীরামপুর মিশন হইতে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ('ধর্ম-পুস্তক') ; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ—বাঙালী রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ।
১৮০৮	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' প্রকাশিত—ভারতীয়ের রচিত প্রথম আধুনিক ধরনের ইতিহাস।

১৮১২ … … কবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম।

১৮১৪-১৫ … … রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা ; ১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান-প্রধান গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৮১৭ … … হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।

১৮১৮ … … কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা ; 'দিগ্দর্শন' (মাসিক), 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক), 'বাঙ্গাল গেজিটি' প্রকাশ।

১৮২০ … … ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২১ … … রামমোহন কর্তৃক ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন ; 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮২২ … … 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা' (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) প্রকাশ ; 'কলিরাজার যাত্রা' ও 'নল-দময়ন্তী' যাত্রাভিনয়।

১৮২৩ … … রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গৌড়ী সমাজের প্রতিষ্ঠা ; ইংরাজ সরকার কর্তৃক জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপন।

১৮২৪ … … সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত ; মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম।

১৮২৮ … … রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত।

১৮২৯ … … বেণ্টিংক্ কর্তৃক আইনের দ্বারা সহমরণ প্রথা নিরোধ ; নীলরতন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' প্রকাশ ; ১৮১৫-২৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে রামমোহনের 'বেদান্ত-গ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'প্রবর্তক-নিবর্তক-সম্বাদ' প্রভৃতি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'দূতীবিলাস' (১২৮৫) এবং 'নর্বাবি বিলাস' (১৮৩১ ?) প্রকাশ।

১৮৩০ … … রামমোহনের বিলাত যাত্রা ; রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা 'ধর্মসভা' স্থাপিত।

১৮৩১ … … ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ; 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' মুদ্রণ।

১৮৩২ … … উইলসনের সম্পাদনায় বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান-সেবধি'র প্রকাশ।

১৮৩৩ … … ব্রিস্টল নগরে রামমোহনের 'জীবনাবসান, শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাটীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়।

১৮৩৫ … … বেণ্টিংকের আদেশে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরাজী ভাষা স্বীকৃত ; 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশ।

১৮৩৬ … … শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব।

১৮৩৮ … … বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

১৮৩৯ … … 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত—ভারতের প্রথম দৈনিক পত্র ; জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন।

১৮৪২ … … বিলাত হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভারতপ্রেমিক টমসনের কলিকাতায় আগমন।

১৮৪৩ … … টমসনের উপদেশে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন ; অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৪৭ … … বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত।

১৮৫০ … … রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ সুধাংশু' পত্রিকা প্রকাশিত।

১৮৫১ … … বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ; 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত) পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৫২ … … জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটক (পাশ্চাত্য আদর্শে লেখা প্রথম নাটক), হ্যানা মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (প্রথম উপন্যাসধর্মী আখ্যান) প্রকাশ।

১৮৫৩ … … বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', তারাচরণ শিকদারের পৌরাণিক নাটক 'ভদ্রার্জুন' ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' (শেক্সপীয়রের 'Merchant of Venice'-এর ভাবানুবাদ) প্রকাশ।

১৮৫৪ … … রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে সহজ ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ ; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' মুদ্রণ।

১৮৫৬ … … বিধবা বিবাহ আইন পাস, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (প্রথম সার্থক ট্রাজেডি) প্রকাশ।

১৮৫৭ … … সিপাহী বিদ্রোহ ; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' মুদ্রিত।

১৮৫৮ … … দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ), 'আলালের ঘরের দুলাল'

প্রকাশ ; সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভিক্টোরিয়ার ভারতশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ।

১৮৫৯ ... ... নীল হাঙ্গামার প্রসার ; মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মুদ্রণ ; কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনাবসান।

১৮৬০ ... ... মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', দুইখানি প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' প্রকাশ।

১৮৬১ ... ... মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রকাশ ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৬২ ... ... মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা সংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশ।

১৮৬৩ ... ... স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্ম।

১৮৬৫ .. ... বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ।

১৮৬৭ ... ... দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রকাশ ; হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন।

১৮৭১ ... ... কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশ।

১৮৭২ ... ... বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ; ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৩ ... ... মধুসূদনের মৃত্যু ; বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন—দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রথম সার্থক চেষ্টা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৭৪ ... ... ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ ; রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল', অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (আখ্যান কাব্য), রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' প্রকাশ।

১৮৭৫ ... ... হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১ম), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশ ; বালক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতা পাঠ।

১৮৭৬ ... ... নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণকল্পে Dramatic Performance Control Act বিধিবদ্ধ ; নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশ।

১৮৭৭ ... ... 'ভারতী পত্রিকা' প্রকাশ।

১৮৭৯	... ...	বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রকাশ।
১৮৮০	... ...	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্য প্রকাশ।
১৮৮১	... ...	নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ)-শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ; 'বঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ।
১৮৮২	... ...	'সঞ্জীবনী' (সাপ্তাহিক), রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশ।
১৮৮৩	... ...	'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৮৪	... ...	অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৮৫	... ...	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৬	... ...	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণ ; নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী মহাকাব্য' ('রৈবতক'—১৮৮৭, 'কুরুক্ষেত্র'—১৮৯৩, 'প্রভাস'—১৮৯৬), রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ।
১৮৮৭	... ...	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যসংগ্রহ 'অশ্রুকণা' প্রকাশ।
১৮৮৮	... ...	গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব, গিরিশচন্দ্রের 'বিল্ব-মঙ্গল' প্রকাশ।
১৮৮৯	... ...	বিহারীলালের 'সাধের আসন', কামিনী রায়ের 'আলোছায়া', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' প্রকাশ।
১৮৯০	... ...	সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় 'সাহিত্য' মাসিক পত্রের আবির্ভাব।
১৮৯১	... ...	বিদ্যাসাগরের তিরোধান ; হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার প্রকাশ।
১৮৯২	... ...	রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশ।
১৮৯৩	... ...	স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা, শিকাগো শহরে ধর্ম-মহাসম্মেলনে বক্তৃতা ; মানকুমারী বসুর 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' প্রকাশ।
১৮৯৪	... ...	বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের জীবনাবসান ; গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক প্রকাশ।
১৮৯৫	... ...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার' প্রহসন প্রকাশ।
১৮৯৬	... ...	রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটক প্রকাশ।
১৮৯৭	... ...	স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তন ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' প্রকাশ।
১৯০৩	... ...	রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চোখেরবালি' প্রকাশ। শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'মন্দির' প্রকাশ।
১৯০৪	... ...	সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' ; রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' ; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।

১৯০৫ … … কার্জনের বঙ্গবিভাগ এবং বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন ; কবি রজনীকান্ত সেনের 'কল্যাণী', শ্রী'ম' রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'।

১৯০৬ … … সত্যেন্দ্রনাথের 'বেণু ও বীণা'।

১৯০৭ … … সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর বিরোধ ; রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

১৯০৯ … … কার্জনের ইউনিভার্সিটি আইন।

১৯১০ … … রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'।

১৯১১ … … সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে মহাচীনের নবজাগরণ ; কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'বনতুলসী', 'উজানী', অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ', 'কাব্যপরিক্রমা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়'।

১৯১৩ … … গীতাঞ্জলির অনুবাদ *Song Offerings*-এর জন্য রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ ; প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ', চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর সঙ্গীত'।

১৯১৪ … … প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ ; 'সবুজপত্র', 'নারায়ণ', 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ।

১৯১৪-১৬ … … ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ; যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্ব ; আমেরিকায় গদর পার্টি গঠন ও জার্মানীর সঙ্গে যোগ স্থাপন।

১৯১৫ … … লোকমান্য তিলক কর্তৃক ন্যাশনাল লীগ, অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক হোমরুল লীগ স্থাপন ; গান্ধীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ', কালিদাস রায়ের 'ব্রজবেণু' ; শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী' ; জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা ও 'ভারতী' গোষ্ঠীর আবির্ভাব ; ইংরেজ শাসনের চণ্ডনীতি, বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ১৬০০ জন যুবক গ্রেপ্তার।

১৯১৬ … … রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'ফাল্গুনী', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়', 'রক্তকরবী' ; প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারি কথা', শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' প্রকাশ।

১৯১৭ … … চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরগাছা' বীরবলের 'হালখাতা',

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', (১ম পর্ব), রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব।

১৯১৮ ... ... নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী'; মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ, রৌলট কমিটির সিডিশন রিপোর্ট প্রকাশ।

১৯১৯ ... ... চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্কতিলক'; জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড; রবীন্দ্রনাথের 'স্যর' উপাধি বর্জন; মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার, ভারতসংস্কার আইনরূপে বিধিবদ্ধ।

১৯২০ ... ... নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি', অনুরূপা দেবীর 'মা', নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন।

১৯২১ ... ... অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত, বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন নতুন দলের নেতা, সুভাষচন্দ্র তাঁহার সহায়ক, খিলাফৎ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবতুর্কীর উত্থান; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' প্রকাশ; যুবরাজের ভারতে আগমনের ফলে সর্বত্র হরতাল পালিত, বাংলা সরকার কর্তৃক কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবকদের বেআইনী ঘোষণা।

১৯২২ ... ... নজরুলের 'ধূমকেতু' ও 'অগ্নিবীণা', রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', মোহিতলালের 'স্বপনপসারী', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'পাপের ছাপ', উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

১৯২৩ ... ... সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা', মাসিক 'বসুমতী'তে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠী' গল্প প্রকাশিত, 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ; চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল গঠন এবং *Forward* পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২৪ ... ... সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা', পরশুরামের 'গড্ডলিকা' প্রকাশ।

১৯২৫ ... ... রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', গোকুল নাগের 'পথিক'।

১৯২৬ ... ... মুসলিম লীগের গঠন, লীগের পৃথক সম্মেলন, এপ্রিল-মে মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা, 'কালিকলম' পত্রিকার প্রকাশ, বাংলার বাহিরে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'উত্তরা' মাসিকপত্রের প্রকাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ'।

১৯২৭ ... ... 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক আকারে প্রকাশ, 'প্রগতি' পত্রিকার (ঢাকা) প্রকাশ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমরা কি ও কে', মোহিতলালের 'বিস্মরণী', পরশুরামের 'কজ্জলী'।

১৯২৮ ... ... কলিকাতা কংগ্রেসে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের ভাবী সংবিধানের খসড়া গৃহীত; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা'র প্রকাশ, শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদন', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা',

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'টুটাফুটা'।

১৯২৯ … … বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া', 'শেষের কবিতা', যদুনাথ সরকারের 'শিবাজী, জগদীশ গুপ্তের 'অসাধু সিদ্ধার্থ', জসিম উদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ'।

১৯৩০ … … গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, দান্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ, সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি, মন্মথ রায়ের 'কারাগার', শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', 'বন্দীর বন্দনা', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী', প্রবোধ সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী', অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা', যতীন্দ্রনাথের 'মরু-মায়া'।

১৯৩১ … … গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকার, গোলটেবিল বৈঠক নিষ্ফল, হিজলীর বন্দিশালায় রাজবন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, গড়ের মাঠের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ধিক্কার জ্ঞাপন, অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুঞ্জ', অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', করুণানিধানের 'শতনরী', ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা', অন্নদাশঙ্করের 'পথে-প্রবাসে', শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'।

১৯৩২ … … বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ', রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত', বিনয় সরকারের 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'-এর সূচনা।

১৯৩৩ … … শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর', রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র (১ম খন্ড) প্রথম প্রকাশ।

১৯৩৪ … … ম্যাকডোনাল্ডের ভাগবাঁটোয়ারা নীতির প্রতিবাদে গান্ধীজীর অনশন ও পুনা-প্যাক্ট।

১৯৩৫ … … ভারতের নূতন সংবিধান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী', ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা', দিলীপ রায়ের 'দোলা', সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা', প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল'।

১৯৩৬ … … জাপান-জার্মানি-ইতালীর কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', জীবনানন্দ দাসের 'ধূসর পান্ডুলিপি', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মহাভারতী'।

১৯৩৭ ... ... ১৯৩৫-এর সংবিধান অনুযায়ী কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন, রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর', সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা', বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী', সরোজ রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন', মোহিতলালের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথমভাগ'।

১৯৩৮ ... ... হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত, বুনিয়াদী শিক্ষার খসড়া প্রস্তুত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত', অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার।'

১৯৩৯ ... ... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা, সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ, তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', বলাইচাঁদ মুখো-পাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদন'।

১৯৪০ ... ... ৬-১৩ এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ ; ফরোয়ার্ড ব্লক কর্তৃক দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সম্রাট', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড) ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ; গোপাল হালদারের 'একদা', ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি. ডবলিউ. ডি.'।

১৯৪১ ... ... রবীন্দ্রনাথের 'শেষলেখা', 'সভ্যতার সংকট' অভিভাষণ দান, 'শতাব্দীর সূর্য' মহাকবির মহাপ্রয়াণ, অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' ; অন্নদাশঙ্করের 'জীবনশিল্পী'।

১৯৪২ ... ... ক্রীপ্‌স্‌ মিশন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, গান্ধীজী প্রমুখ দেশনেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়', সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কাব্য', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত'।

১৯৪৩ ... ... বাংলায় দুর্ভিক্ষ, সরকারের নঞর্থক মনোভাবের জন্য শ্যামা-প্রসাদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা অপসারিত ; মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভা গঠিত, ভারতের বড়লাট

লর্ড ওয়াভেল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ ও মার্কস্‌বাদ্', ওয়াজেদ আলির 'ভবিষ্যতের বাঙালী'।

১৯৪৪ ... ... জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', অন্নদাশঙ্করের 'বিনুর বই', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক', বনফুলের 'জঙ্গম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'।

১৯৪৫ ... ... সিমলাবৈঠক ব্যর্থ, নেতাজীর আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মণিপুরে অনুপ্রবেশ, কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর, কিন্তু উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ; অজিত দত্তের 'নষ্ট চাঁদ', অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।

১৯৪৭ ... ... ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন; মুসলিম লীগের ভারত-বিভাগ দাবীর কাছে কংগ্রেসের নতি স্বীকার; ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ, ভারত ও পাকিস্তানের আবির্ভাব, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', বিষ্ণু দে-র 'সন্দীপের চর', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'।

১৯৪৮ ... ... প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ', যতীন্দ্রনাথের 'ত্রিযামা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'।

১৯৪৯ ... ... সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র', বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'।

১৯৫০ ... ... বিষ্ণু দে-র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট'।

১৯৫১ ... ... ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত, অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগ', তারাশঙ্করের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'।

১৯৫২ ... ... ভারতে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রথম সাধারণ নির্বাচন, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের জয়লাভ ও মন্ত্রিসভা গঠন। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'।

১৯৫৩ ... ... শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে'; তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতন', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দেহ-মন', 'দূরভাষিণী'।

১৯৫৪ ... ... হরপ্রসাদ মিত্রের 'তিমিরাভিসার', জরাসন্ধের 'লৌহকপাট'।

১৯৫৫ ... ... নেহরুর গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সূচনা; বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা, নেহরুর সোভিয়েট সফর এবং ভারত-চীন মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন, আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের নীতি গ্রহণ, বুদ্ধদেব বসুর 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর', অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা বদল', অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'।

১৯৫৬ ... ... প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'দশমী', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', বিমল করের 'দেওয়াল', গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর', আশাপূর্ণা দেবীর 'শশীবাবুর সংসার'।

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলতে সাধারণতঃ এই দেড়শ' বছরকেই বোঝায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ধরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ার্ধে তারই পরিস্ফুট প্রকাশ। তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। কিন্তু এখানেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শেষ নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাম্প্রতিক লেখকগণও নতুন পথ প্রস্তুত করে চলেছেন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত** বাঙালী-মানসের এই পরমাশ্চর্য বিকাশের সঙ্গে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী পাঠককে দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করবে। সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় আলোচিত এই গ্রন্থ থেকে শুধু ছাত্রসমাজই নয়, সাধারণ পাঠকও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি চিত্তগ্রাহী পরিচয় পাবেন।